রূপক সাহা

প্রেম যেন এক...

গ্যারাজ থেকে মোটরবাইকটা বের করার সময় সায়নের মনে পড়ল, এই রে, দুপুরে মা একবার ফোন করতে বলেছিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, প্রায় দেড়টা বাজে। আজ সকালের ট্রেনেই মা হাসনাবাদ গেছে। বিজয়া দশমীর দিন দাদান আর দিদাইকে প্রণাম করতে প্রতিবারই যায়। বসিরহাট স্টেশনে মাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সায়ন। ট্রেনে ওঠার আগে মা বলে গেছে, 'বেলা বারোটা-সাড়ে বারোটায় আমায় একবার ফোন করবি। তখন জানাবি, ভাসানের সময় তুই কাদের নৌকোয় থাকবি। ভুলিস না যেন। তোর জন্য তো কোথাও গিয়ে আমার শান্তিতে থাকার জো নেই। দেখিস, সে বারের মতো কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িস না।'

মায়ের কথাগুলো শুনে তখন মনে মনে হেসেছিল সায়ন। ভালো ছেলের মতো ঘাড় নেড়েছিল। আজ দুর্গা ঠাকুরের ভাসান। ও জানে, ও কী করবে। কাদের নৌকোয় উঠবে। মাকে বলার দরকার কী? গতকাল টাকি শহরের সব ঠাকুরের বিসর্জন হয়ে গেছে। বেস্পতিবার ছিল বলে ওদের বসিরহাটে গতকাল ভাসান হয়নি। আজ হবে। বড় বড় নৌকো করে সব ঠাকুর ইছামতী নদীর ওপর ঘোরানো হবে বেলা দু'টো আড়াইটে থেকে। তার পর সূর্যাস্ত হলে বিসর্জন। সে এক দেখার মতো ব্যাপার। নদীর ওপর কয়েকশো নৌকো। ভাসান দেখার জন্য নদীর তীরে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে। কলকাতার টিভি চ্যানেলের লোকজনও আসবে।

আজ সকালেই সায়ন গিয়েছিল পলাশদার বাড়ি। এখানকার কেবল টিভি ইউসিএনের হর্তাকর্তা। পলাশদা বলেছে, এ বার ভাসানে নাকি খুব জাঁকজমক হবে। টাকির লোকেরা কলকাতা থেকে সিনেমার আর্টিস্টদের নিয়ে এসেছিল। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' বলে একটা ছবি চলছে, তার নায়ক-নায়িকাকে। বসিরহাটে পলাশদারা নাকি নিয়ে আসছে আরও নামকরা দুই আর্টিস্টকে। সেই দু'জনের নাম অবশ্য বলতে চায়নি। শেষ মুহূর্তে চমকে দেবে। তাঁদের যাতে সবাই দেখতে পারে, সে জন্য শ্মশানঘাটের কাছে বিরাট একটা প্যান্ডেলও হয়েছে।

মায়ের কথা মনে পড়তেই বাইক দাঁড় করিয়ে, পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে সায়ন হাসনাবাদে ফোন করল। ও প্রান্তে ধরল দাদান, জিজ্ঞেস করল, 'পুজোটা কেমন কাটালে এবার দাদুভাই?'

সায়ন বলল, 'ভালোই, মিগ প্লেনে ফ্লাই করার মতো।'

শুনে হা হা করে হাসতে লাগল দাদান। ওর ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তবু এখনও প্রাণখোলা হাসতে পারে দাদান। আর্মির টপ অফিসার ছিল। চাকরি জীবনে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কলকাতায় থাকবে বলে দাদান লেক গার্ডেন্সে ফ্ল্যাট কিনেছিল। কিন্তু ওখানে থাকতে পারেনি। রিটায়ার করার পর দেশের বাড়িতে গিয়ে থিতু হয়েছে। আর কলকাতার ফ্ল্যাটটা লিখে দিয়েছে সায়নের নামে। সায়ন এখন লেক গার্ডেন্সেই থাকে। দাদান কথা বলে মজার মজার। আর্মির লোকেদের ভাষায়। আগে সায়ন ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারত না। এখন পারে।

হাসি থামিয়ে ওর কথার রেশ টেনে দাদান বলল, 'কোথাও সেফ ল্যান্ডিং হল? আমাদের সময় তো এই পুজোর সময়টা খুব ভাইটাল ছিল। বিশেষ করে, ভাসানের দিনটা। ওটাই ছিল আমাদের ভ্যালেনটাইনস ডে। তোমার দিদাইকে তো ওই দিনই আমি টার্গেট করেছিলাম। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে।'

হা হা হা করে দাদান হাসছে। সায়ন বলে, 'না দাদান, সেফ ল্যান্ডিং হয়নি। এখানে খুব রাফ ওয়েদার। রানওয়ে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু নামার ভরসা পাচ্ছি না। আকাশে চক্কর মারছি।'

'চেষ্টা করে যাও দাদুভাই। হাল ছেড়ো না। এই বুড়ো উইং কমান্ডারের সাহায্য যদি দরকার হয়, বলতে দ্বিধা কোরো না। আর কথা বলা যাবে না দাদুভাই। তোমার মা জননী রিসিভার ধরে টানাটানি করছে। এই নাও, কথা বলো।'

ও প্রান্তে মা ধমকের সুরে বলল, 'হ্যারে, তোকে কখন ফোন করতে বলেছিলাম?'

সায়ন বলল, 'ভুলে গিয়েছিলাম মা।'

'ভুলে তো যাবিই। এখন তোর চোখ ফুটেছে। নিত্যনতুন সব বন্ধু জুটেছে। আর ক'দিন পর মাকে হয়তো চিনতেই পারবি না। হ্যারে, খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক করেছিস তো? কুন্তীকে আমি সব বলে এসেছিলাম। ঠিকঠাক বেড়ে দিয়েছিল তো?'

ওদের বাড়িতে কুন্তীমাসি সকাল বিকেল দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। বছর দশেক এই কাজটা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছে। কিন্তু আজ মা বেরিয়ে যাওয়ার পর, কুন্তীমাসি অবশ্য উধাও হয়ে গেছে। নদীতে ভাসান দেখতে যাবে বরের সঙ্গে। সে কথা তো আর মাকে বলা যায় না। বললে, মা ভয়ানক চটে যাবে। তাই সায়ন বলল, 'একদম ঠিকঠাক মা। তুমি চিন্তা কোরো না। আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে মাসি এক্ষুনি বেরিয়ে গেল।'

'যাক, নিশ্চিন্তি। হ্যারে, ভাসানে তুই কাদের নৌকোয় যাবি?'

'মিলনি সঙ্ঘের নৌকোয় মা। পল্টুদাদের সঙ্গে। ওদের পুজো নাকি এবার ফার্স্ট

হয়েছে।'

'তোর আর কবে আক্কেল হবে সানু? ফের ওদের নৌকোয় উঠবি? কতকগুলো গুন্ডা বদমাশদের সঙ্গে? দুপুর বেলাতেই মদ খেয়ে ওরা নৌকোয় উঠবে। মাতলামি করবে। মনে নেই, সেবার কী হয়েছিল? খেয়াঘাটে মারপিট করল ওরা, আর পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তোদের মতো কিছু ভদ্দরলোকের ছেলেকে। তোর দাদান না-থাকলে সে বার কী হত, মনে আছে?'

'কিচ্ছু হবে না মা। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।'

ও প্রান্তে মায়ের গলা চড়তে শুরু করল, 'এই শোন, তোকে ক্লাবের নৌকোয় উঠতে হবে না। আমি মানা করছি। তুই বরং অনুদের বাড়ি চলে যা। তোর বরদামেসো নৌকো ভাড়া করেছেন। কমলামাসিকে বলবি আমি তোকে ওদের নৌকোয় নিতে বলেছি। আমি ওদের ফোন করে দিচ্ছি।'

প্রস্তাবটা মন্দ না। মায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কমলামাসি। তার মেয়ে অনুমিতা ওরই বয়সি। ছোটবেলায় ওদের সঙ্গে সায়ন অনেকবার ভাসান দেখেছে। তখন মা আর বাবাও সঙ্গে যেত। খুব হই-হুল্লোড় হত। বসিরহাটের ভাসানে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার মানুষ নৌকোয় ওঠে লজেন্স, চকোলেট আর টফি নিয়ে। ভাসানের সময় নৌকোগুলি যখন ইছামতী নদীর ওপরে ঘুরে বেড়ায়, তখন এই নৌকো থেকে লোকে অন্য নৌকোয় লজেন্স চকোলেট ছুড়ে মারে। এতেই যত মজা। বাবাও কয়েক প্যাকেট লজেন্স নিয়ে নৌকোয় উঠত। বরদা মেসো নিয়ে যেত আপেলের ঝুড়ি। সেই লজেন্স আর আপেল সায়নরা ছুড়ত অন্য নৌকো লক্ষ্য করে। আপেলের লোভে ওদের নৌকোর চারপাশে ঘোরাঘুরি করত অনেক নৌকো। সে একটা দিন গেছে বটে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা ভাসানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বরদা মেসোর উৎসাহও অনেক কমে গেছে। অনু...মানে অনুমিতা এখন চাকরি করে মেট্রো রেলে। থাকে ওর মামার বাড়ি গল্ফ গ্রিনে। সায়নের সঙ্গে ও প্রায়ই আড্ডা মারতে আসে লেক গার্ডেন্সে।

ও প্রান্ত থেকে মা বলল, 'কী রে চুপ করে আছিস কেন? যা বললাম, শুনছিস? দিব্যি রইল কিন্তু।'

সায়ন বলল, 'হ্যাঁ মা। কমলামাসির ওখানেই যাচ্ছি। ছাড়ি তা হলে?'

'ছাড়বি কী রে? দাদান আর দিদাইকে বিজয়ার প্রণাম জানাবি না? কী হাঁদা রে তুই? তোকে ফোনটা করতে বললাম কেন, সেটাই তো বুঝতে পারিসনি।'

'ইস, ভুল হয়ে গেছে। সায়ন তাড়াতাড়ি বলল, 'দাও ওদের।'

'শোন বাবা, বাড়ির দরজায় ঠিকঠাক তালা দিয়ে বেরোস কিন্তু। ইদানীং খুব চুরি হচ্ছে। মেয়েদেরও বিশ্বেস নেই। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন গোপালবাবুদের বাড়িতে একটা মেয়ে চোর ধরা পড়েছিল।'

দাদান আর দিদাইয়ের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে মোবাইল ফোনটা পকেটে রাখল

সায়ন। তারপর ফের বাড়ির ভেতরে ঢুকে জানলা দরজা সব বন্ধ আছে কী না, দেখে বেরিয়ে এল। মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মিনিট পনেরো চলে গেল। এখন সেই জেলখানার মোড়ে কমলা মাসিদের বাড়ি যেতে হবে। ওখানে যেতে মিনিট দশেক তো লাগবেই। এর মধ্যে ওরা নৌকোয় উঠে পড়বে কী না, কে জানে? মনে হয় না। ফ্যামিলির লোকজন নিয়ে যে সব নৌকো বেরোয়, সেগুলো আড়াইটা তিনটের আগে খেয়াঘাট থেকে ছাড়ে না। অনুকে একটা ফোন করে দিলে ভালো হত। পঞ্চমীর দিন ও আর অনু একই সঙ্গে কলকাতা থেকে বসিরহাটে এসেছে। নৌকোয় ওর সঙ্গে ভালো আড্ডা মারা যাবে। কথাটা মনে হতেই সায়ন স্টার্টারে চাপ দিল।

বসিরহাটে সায়নদের বাড়িটা খুব ভালো জায়গায়। একেবারে দেবযানী সিনেমা হল-এর গায়ে। সারাটা দিন ওই চত্বরটা গমগম করে। হাতের কাছে দোকানপাট। কুড়ি পঁচিশ গজের মধ্যেই টাকি রোড। পিচের রাস্তা। সোজা চলে গেছে টাকি পর্যন্ত। বাস চলাচলও করে। সব থেকে বড় কথা, রেল লাইনও খুব দূরে না। ট্রেনে করে কলকাতা থেকে আসার সময় বসিরহাট স্টেশনে নামার ঠিক আগেই প্রতিবারই সায়ন ওদের বাড়িটা দেখতে পায়। গাছগাছালির ছায়াঘেরা ওদের সুন্দর বাড়িটা। বাবা শখ করে তৈরি করেছিল। ব্যবসা করে বাবা প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল। সায়নের জন্য অনেক সম্পত্তি রেখে গেছে। চার বছর আগে দাদান ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জন্য জোর করে কলকাতায় পাঠায়, তখন কমলামাসিকে ও একবার বলতে শুনেছিল, 'সানুকে এতদূরে পাঠাচ্ছেন কেন কাকা? ওর বাপ যা রেখে গেছে, তিন পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে খেতে পারবে। আপনি আভার কথা ভাবছেন না। ছেলেকে ছেড়ে ও কী করে থাকবে বলুন তো?'

আভা মানে মা। তখন ছলছল চোখে তাকিয়ে দাদান একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিল কমলামাসির কথা। বলেছিল, 'তোমাদের মায়ের বাঁধনগুলো একটু আলগা করো তো মা। তোমাদের মতো মায়েদের জন্যই বাঙালি ছেলেগুলো বেরুতেই চায় না। বাইরে না বেরোলে চোখ ফুটবে না মা।'

দাদান সেদিন ঠিকই বলেছিল। সত্যি, কলকাতায় পড়তে না গেলে সায়ন অনেক কিছু জানতে পারত না। চারটে বছর ওখানে কাটিয়ে ওর আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে ও দুটো চাকরি পেয়ে গেছে। একটা সুরাটে, অন্যটা সল্ট লেকে। মা চাইছে, ও সল্ট লেকের চাকরিটা নিক। কিন্তু কোম্পানির নাম দেখে দাদান বলেছে, 'সোজা গুজরাটে চলে যাও। কারও কথা শুনবে না দাদুভাই। তবে হ্যাঁ, তার আগে তোমার মা জননী যদি তার কোনও ইচ্ছা পূরণ করতে বলেন, সেটা করে যেতে পারো।'

মায়ের ইচ্ছাপূরণ মানে ... বিয়ে। কিন্তু সে ব্যাপারে সায়ন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। নিজের পায়ে ভালো মতো না-দাঁড়ানো পর্যন্ত ও বিয়ে করতে চায় না। অষ্টমী পুজোর দিন দাদান আর দিদাই বসিরহাটে এসেছিল। তখন কথায় কথায় দাদান জানতে চায়, 'তোমার টার্গেটে কেউ থাকলে আমায় বলতে পারো।' কী বলবে সায়ন? ক্লাস টেনে

পড়ার সময় থেকেই এই বসিরহাটেরই একজনকে ওর খুব পছন্দ। মায়ের একজন গুরুভাই আছেন...অরূপ চৌধুরি। তার মেয়ে তিতাস। সবাই বলে, বসিরহাটের এক নম্বর সুন্দরী। যেমন লেখাপড়ায়, তেমন নাচে-গানে। ওর এই পছন্দের কথাটা দু'একজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ জানে না। মা আন্দাজ করেছে, তবে পরিষ্কারভাবে কোনও দিন জানতে চায়নি। আগে প্রায়ই তিতাস ওদের বাড়িতে আসত। ওর সঙ্গে গল্প করত। কিন্তু সায়ন কখনও ওর মনের কথা খুলে বলতে পারেনি।

এ বার বিয়ের কথা ওঠায়, তিতাস সম্পর্কে রোসিকে খোঁজ নিতে বলেছিল সায়ন। অন্য কারও সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে কী না, সেটা জানার জন্য। রোসি ওর ছোটোবেলার বন্ধু। ভালো নাম রসিকলাল। বিরাশি সালে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সময় ওর জন্ম। ইতালির পাওলো রোসি সে বার অনেক গোল করেছিল। সেই জন্য ফুটবল কোচ ওর এক মামা ঘ্যাসদা, ওর নাম রাখে রোসি। ভালো ফুটবল খেলত। কলকাতায়ও খেলতে গিয়েছিল। এখন ওর বাবার ব্যবসায় বসে গেছে। রোসি কিন্তু তিতাস সম্পর্কে এ বার তেমন উচ্ছ্বাস দেখাল না। উলটে বলল, 'এই মেয়েকে বিয়ে করলে তুই পাগল হয়ে যাবি রে সানু। মেয়েটা একসেন্ট্রিক টাইপের।'

কলকাতায় থাকার জন্যই অনেক দিন তিতাসকে দেখেনি সায়ন। আজ ভাসানের সময় দূর থেকে ওকে দেখানোর কথা ছিল রোসির। সেই কারণেই সায়ন মিলনি সংঘের নৌকোয় উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু মা দিব্যি দিয়েছে। ওই নৌকোয় ওঠা যাবে না। এস এন মজুমদার রোড দিয়ে বাইক চালাতে চালাতে সায়ন ভাবল, আজ যদি কোনও কারণে তিতাসের সঙ্গে দেখা না হয়, কাল হবেই। বিজয়া করার জন্য তিতাস নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে আসবে। ইচ্ছে করলে, সায়ন অবশ্য তিতাসদের বাড়িতেও যেতে পারে। কিন্তু মাকে না জানিয়ে ও যেতে চায় না। তার আগে তন্ময়সমীরণকে জিজ্ঞেস করেও তিতাস সম্পর্কে সবকিছু জেনে নেওয়া যায়। সাহিত্য সংঘের পিছনেই তন্ময়সমীরণের বাড়ি। বসিরহাটে যত ফাংশান হয়, তার সব ক'টার অ্যাঙ্কর এই তন্ময়সমীরণ নন্দী। তিতাসের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা খুব ভালো। সাহিত্য সংঘের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আড়চোখে সায়ন একবার তন্ময়সমীরণের বাড়ির দিকে তাকাল। দেখল, ওর বউ ঝুমা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় ভাসান দেখতে বেরোচ্ছে।

জেলখানার রাস্তায় বেশ যানজট। দেখে বাইক ঘুরিয়ে নিল সায়ন। হাই স্কুলের পাশ দিয়ে ব্রিজের দিকে যাওয়ার জন্য। কমলামাসির বাড়ির সামনে এসে ও দেখল, বরদামেসো রাস্তায় দাঁড়িয়ে। অন্যদের জন্য বোধহয় অপেক্ষা করছে। মেসোকে বিজয়ার প্রণাম করতেই পিছন থেকে কমলামাসি বলল, 'তোর জন্য সেই থেকে আমরা ওয়েট করছি। চল, অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে। এ পার থেকে নৌকোয় উঠতে পারবি না।'

বাইকটা মেসোর বাড়ির উঠোনে রেখে বরদামেসোর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল সায়ন। কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। রাস্তার দু পাশে মেলা বসে গেছে। ঢাকের

বাদ্যি, বাঁশির আওয়াজ আর লোকজনের চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার যোগাড়। মাথার ওপর গনগনে রোদ। দরদর করে ঘামতে ঘামতে সায়ন ভাবল, না এলেই ভালো হত। বেলা দুটো থেকে কেবল টিভিতে ভাসান দেখানোর কথা। বাড়িতে ডিভানে শুয়ে শুয়ে আরাম করে পুরো ভাসানটাই টিভিতে দেখা যেত। তা হলে অবশ্য তিতাসকে দেখার সুযোগ ও পেত না। এখন রোদে কষ্ট পেলে কী আর করা যাবে। মিনিট দশেক হাঁটার পর শেষ পর্যন্ত ওরা নৌকোয় উঠে বসল। মাত্তর ছ'সাত জনের জন্য এত বড় নৌকো ভাড়া করার কোনও দরকার ছিল না। নদীর ওপর ঘণ্টা চারেক ঘোরাবে। হাজার খানেক টাকা নিশ্চয় নিয়েছে।

নৌকো মাঝ দরিয়ায় পৌঁছোতেই, ফুরফুরে বাতাসে মনটা ঝরঝরে হয়ে গেল সায়নের। গত চার বছর ও ভাসান দেখার সুযোগ পায়নি। পুজোর পরেই সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে হত। তাই লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে ও আর কাঞ্চন মন খারাপ করে বসে থাকত। কলকাতায় কাঞ্চনই ওর একমাত্র বন্ধু। বাংলাদেশের ছেলে। কলকাতায় পড়তে এসেছে। ওরা একই ক্লাসের ছাত্র। কলকাতায় কাঞ্চনের থাকার জায়গা নেই। মাকে তখন কাঞ্চনের কথা বলেছিল সায়ন। শুনে মা বলেছিল, 'তা হলে এক কাজ কর। লেক গার্ডেন্সে একা থাকতে তোর ভালো লাগবে না। ওকে ডেকে নে। তোরা দু'জন একসঙ্গে থাক।' সেই থেকে ও আর কাঞ্চন একসঙ্গে আছে। এ বার ভাসানে ওকে আনতে চেয়েছিল সায়ন। কিন্তু কোন্নগরে ওর এক মাসি থাকে। সেই মাসিকে নিয়ে কাঞ্চন বাংলাদেশে ছুটি কাটাতে গেছে। কালীপুজোর দিন ফিরে আসবে।

নৌকোয় কমলামাসির মেয়ে অনু ঠিক ওর সামনে বসে। ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল সায়ন। অনুকে বোধহয় বসিরহাটের সব লোক চেনে। আশপাশের নৌকো থেকে ক্রমাগত লজেন্স উড়ে আসছে ওর উদ্দেশে। সে সব লুফে অনুও পালটা ছুড়ে মারছে অন্য নৌকোয়। একটু বেশিই খুশি খুশি লাগছে যেন ওকে। এই লজেন্স ছোড়াছুড়ি মারফতই, ওর অনেক বন্ধু প্রেমে পড়েছে। সে সব কথা মনে পড়তেই সায়ন মুচকি হাসল।

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে ইছামতীতে। এ দৃশ্যটা অবশ্য নতুন নয় সায়নের কাছে। ছোটবেলা থেকেই ও দেখে আসছে।

নৌকো শ্মশানঘাটের কাছে পৌঁছোতেই সায়নের চোখে পড়ল, বিরাট প্যান্ডেল ঘিরে মারাত্মক ভিড়। তখনই তন্ময়সমীরণের গলা ও শুনতে পেল, 'আজ আমাদের এখানে হাজির আছেন, বাংলার প্রখ্যাত চিত্রতারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা করতালি দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। আমাদের পরম সৌভাগ্য, এমন দুই সেলিব্রিটিকে আমরা হাজির করতে পেরেছি...'

ঠিক তখনই পাশ দিয়ে যাওয়া জোড়া বাংলাদেশি নৌকোর দিকে তাকিয়ে অনু হঠাৎ বলল, 'সানুদা, ওই মেয়েটাকে দেখো। ওই যে সাদা সালোয়ার কামিজ পরা। কী সুন্দর দেখতে, না?' নৌকোর দিকে তাকিয়ে, মেয়েটাকে দেখেই অবাক হয়ে গেল সায়ন। কাঁচা

হলুদের মতো গায়ের রং। একেবারে দুর্গা প্রতিমার মতো। নৌকো আলো করে বসে রয়েছে। চোখাচোখি হতে মেয়েটা মুখ নিচু করল। বসিরহাটের মেয়ে নাকি? নিশ্চিত হওয়ার জন্য সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'কে রে অনু?'

'ডেফিনিটলি বাংলাদেশের মেয়ে। বোধহয় ও পারের ঘলঘলিয়া থেকে এসেছে। কেন, মেয়েটাকে তোমার পছন্দ নাকি? বলব, তোমার আভামাসিকে?' কথাগুলো বলেই অনু হি হি করে হাসতে লাগল।

pathagar.net

ডাইনিং টেবিলে বসে তাপস আর লালির সঙ্গে জোর আড্ডা মারছিল সায়ন। বাড়িতে মা নেই। এমন মওকা সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই দু'জনকে বাড়িতে ডেকে এনেছে সায়ন। আজ ভাসানের পর কমলামাসির বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ রাস্তায় তাপসকে দেখতে পায় সায়ন। ওর পাশে তখন দাঁড়িয়ে লালি। কপালে লাল গোল টিপ, ঠিক আগেকার মতো। সিঁথিতে সিঁদুর। মুখশ্রীটাই বদলে গেছে লালির। খুব ভালো লাগছে ওকে দেখতে। দু'জনে মিলে ওরা তখন মেলার দোকানে কাঠের একটা আলনা কেনার জন্য দরাদরি করছিল। তার মানে নতুন সংসার পেতেছে। সায়ন জানত না, তাপসের সঙ্গে লালির বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা যখন প্রেম করত, তখন অনেকদিন ওদের সঙ্গ দিয়েছে সায়ন। তখন শুনেছিল, বিয়ের ব্যাপারে লালির বাড়িতে খুব আপত্তি ছিল। পঞ্চমীর দিন কলকাতা থেকে বসিরহাট আসার পর পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই সায়নের দেখা হয়েছে। একমাত্র তাপস ছাড়া।

ওর কাছে গিয়ে বাইকের হর্ন দিতেই বিরক্তিভরা মুখে তাকিয়েছিল তাপস। তার পর ওকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে, 'ক্যাপ্টেন, তুই! কবে এসেছিস? আমাকে খবর দিসনি কেন?'

লালি হাসিমুখে বলেছিল, 'সানুদা আপনি! কাদের নৌকোয় ছিলেন?'

সায়ন বলেছিল, 'কার প্রশ্নের জবাব আগে দেব বুঝতে পারছি না।'

লালি সোৎসাহে বলে উঠেছিল, 'চলুন, আমার বাড়িতে চলুন। ওখানে বসে জবাবটা দেবেন। সিদ্ধির ভালো শরবত বানিয়েছি। খাবেন চলুন।'

'না, তার চেয়ে বরং তোরা আমার বাড়িতে আয়। বাড়ি একেবারে ফাঁকা। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। সেই আগেকার মতো। রোসিকেও আসতে বলেছি। এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেও গেছে।'

লালি প্রথম দিকে একটু আপত্তি করেছিল। পরে রাজি হয়ে যায়। ভাসানের রাতে সিদ্ধি আর ভাঙের শরবত খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে বসিরহাটে। লালি নিজের হাতে বানানো

সিদ্ধির শরবত এনেছে বাড়ি থেকে। এনেই ফ্রিজে রেখে দিয়েছে। সেই শরবত অবশ্য এখনও চেখে দেখা হয়নি। রোসির জন্য ওরা তিনজন অপেক্ষা করছে। এই আধঘণ্টা আগেও ফোন করে রোসি বলল, দু'মিনিটের মধ্যে আসছে। এখনও পাত্তা নেই। তাপস অধৈর্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। রাগের মাথায় একবার বলেও ফেলল, 'শালা আসবে কী করে? দ্যাখ গে, হয়তো এখন রুশাতির বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছে।'

'কে রুশাতি?' লালি হাসতে হাসতে বলল, 'নৃপেন ডাক্তারের ছোট মেয়ে। রোসি এলে ওকে চেপে ধরবেন সানুদা। প্রেম কদ্দূর এগিয়েছে, আপনাকে ও বলে দেবে।'

রোসির মতো ছেলে যে প্রেম করতে পারে, সায়নের কাছে সেটা খবর। বন্ধুরা যখন মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করত, তখন মুখ বেঁকিয়ে বসে থাকত রোসি। বলত, 'প্রেম-ট্রেম সব ফালতু। বাবার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করলে অনেক লাভ। বিয়ের সময় ভাও পাওয়া যায়। আমি বাবা ও সব ছাড়তে রাজি না।' সেই ছেলে প্রেম করছে! পুজোর সময় প্যান্ডেলে দু'বার দেখা হল রোসির সঙ্গে। একদিন অনেকটা সময় বাড়িতে এসে আড্ডাও মারল। তিতাসকে নিয়ে এত কথাবার্তা হল। আশ্চর্য, রুশাতির কথা ও একবারও বলেনি। সায়ন ঠিক করে নিল, রোসি এলে ওকে প্রচুর সিদ্ধির শরবত খাওয়াবে। তার পর ওর পেট থেকে সব কথা বের করে নেবে।

লালির কথা শেষ হতে না হতেই ডোর বেলের শব্দ। যাক, রোসি এল তা হলে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়ন দেখল, রাত প্রায় ন'টা। বসিরহাটে এই সময়টা নিঃঝুম রাত। আসতে এত রাত করল কেন রোসি। মনে মনে চটল সায়ন। ডোর বেলের শব্দটা আসছে পিছনের গেট থেকে। অর্থাৎ সিনেমা হল-এর দিক থেকে। তাপস গেট খোলার জন্য ওই দিকেই যাচ্ছিল। ওকে ইশারায় মানা করল সায়ন। জানলা খুলে আগে দেখে নেওয়া যাক, কে এসেছে? মশার ভয়ে নীচের ঘরের জানলাগুলো সারাদিনই বন্ধ রাখে মা। ছিটকিনি খুলে পাল্লা দুটো সরিয়ে দিতেই সায়ন দেখল, রোসি নয়, দু'জন পুলিশ!

ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা?'

'সরি স্যার, এত রাতে ডিস্টার্ব করছি। আমরা একটা ইয়ং মেয়ের খোঁজ করছি। আশপাশে কোনও ইয়ং মেয়েকে কি আপনাদের চোখে পড়েছে?'

সায়ন বলল, 'ইয়ং মেয়ে? না। কেন বলুন তো?'

'আরে মেয়েটা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। রাতের শো-এর আগে নাকি মেয়েটাকে দেবযানী হল-এর আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। আমাদের ধারণা, হল-এর কাছাকাছি কোনও বাড়িতে ও শেলটার নিয়েছে।'

সায়ন বলল, 'না মশাই, আমার বাড়িতে অন্তত নেয়নি।'

'আপনার বাড়িটা হল-এর নিয়ারেস্ট। সেই কারণেই আপনাকে নক্ করলাম। বাই দ্য বাই, আপনার বাড়িতে আর কে আছেন?'

'আমার এক বন্ধু ও তার স্ত্রী।'

'প্লিজ, তাদের কি একবার আসতে বলবেন?'

ডাইনিং রুম থেকে উঠে এল তাপস আর লালি। জানলার কাছে ওরা এসে দাঁড়াতেই পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক তাপসকে বললেন, 'আপনি তো বদরতলায় থাকেন, তাই না? আপনাকে চিনি। এ বাড়িতে স্যার কখন এসেছেন?'

'সাতটা সাড়ে সাতটা হবে।'

'ঢোকার সময় এ চত্বরে কোনও মেয়েকে কি চোখে পড়েছিল? মানে কোনও অচেনা মেয়ে?'

'না আমরা কেউই দেখিনি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। যদি কোনও বাংলাদেশি মেয়ে চোখে পড়ে, প্লিজ থানায় ইনফর্ম করবেন। মেয়েটা চিটাগাংয়ের এক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফ্যামিলির। কাল টাকিতে ভাসান ছিল। জানেনেই তো, ভাসানের দিন বর্ডার বলে কিছু থাকে না। ও পারের শ্রীপুর, ভাটশালা, ঘলঘলিয়া থেকে নৌকো ঠাকুর নিয়ে এ পারে আসে। এখানকার নৌকো ও পারে চলে যায়। ওই রকমই একটা বাংলাদেশি নৌকোয় মেয়েটা এ পারে এসেছে। তারপর নিখোঁজ। সঙ্গে পাশপোর্ট ভিসা কিছু নেই। বাংলাদেশ থেকে সরকারি লেভেলে রিকোয়েস্ট এসেছে, মেয়েটাকে যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। এস পি সাহেবের অর্ডার। আমাদের ধারণা, মেয়েটা আজ সকালে টাকি থেকে বসিরহাটে এসেছে। এখনও এই অঞ্চল ছেড়ে যায়নি। বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে যদি কলকাতায় চলে যায়, তা হলে ওকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।'

বাংলাদেশ থেকে বেআইনি ভাবে রোজই লোকজন যাতায়াত করে। রাতের অন্ধকারে গরু পাচার হয়। সেই সঙ্গে মেয়ে চোরাচালানও। সাতক্ষীরা অঞ্চলের গরিব পরিবারের মেয়েরা, দালাল মারফত চালান হয়ে আসে এ পারের বেশ্যাপাড়ায়। বসিরহাটের এক শ্রেণির দালাল এ ভাবে প্রচুর টাকা রোজগার করে। ভালো কামাই করে এ পারের বিএসএফ, ও পারে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জওয়ানরাও। হিস্যা নিয়ে কোনও গণ্ডগোল হলে দু'চারটে লাশও পড়ে। নতুন কিছু নয়। সায়নরা ছোটবেলা থেকেই এ সব দেখছে। পুলিশ দু'টোর সঙ্গে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সায়ন তাই বলে, 'ঠিক আছে, মেয়েটা যদি চোখে পড়ে, তা হলে খবর দেব আপনাদের।' কথাগুলো বলেই জানলা বন্ধ করে ও ডাইনিং টেবিলে বসে বলল, 'ভালো আড্ডা হচ্ছিল, পুলিশ ভেস্তে দিয়ে গেল।'

চোখ টিপে তাপস বলল, 'ক্যাপ্টেন, মাসিমা নেই, আজ একটু মাল খাওয়া যায় না।'

শুনে লালি চোখ পাকাল, 'এই একদম না! সানুদা, আমি কিন্তু উঠে যাব।'

সায়ন মজা পেল ওর কথায়। বলল, 'উঠে যাবে, কোথায়? বাড়ি ফেরার জন্য আজ তো রাস্তায় ভ্যান রিকশাও পাবে না। আর যদি পাও-ও, তা হলে দেখবে সে ব্যাটা মাল খেয়ে চুর হয়ে আছে। আরে, ভাসানের দিন একটু আধটু খেলে দোষ হয় না।'

'একদম না,' রাগ রাগ মুখ করে লালি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাপসকে বলল, 'তুমি কিন্তু বিয়ের আগে আমার গা ছুঁয়ে প্রমিস করেছিলে।'

তাপস বলল, 'ধুস শালা। বিয়ে করে জীবনটা হাল্লাক হয়ে গেল। নিজের ইচ্ছেয় কিছু করার জো নেই। ক্যাপ্টেন, তুই আর যা-ই করিস, বিয়ে করিস না।'

পুরোনো একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সায়ন হাসল। লালি জিজ্ঞেস করল, 'হাসলেন কেন?'

'এমনিই। ছয় সাত বছর আগে ... এই ভাসানের দিনেরই একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাপসের প্রেম ওই দিনই ডানা মেলেছিল কী না। তুমি জানো কী না জানি না, সেদিন তুমি যে নৌকোটায় বসেছিলে, তাতে আরও তিন চারজন মেয়ে ছিল। তোমাদের নৌকোটা আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাপস আমাকে বলেছিল, 'আমি একটা লজেন্স ছুড়ব। যে মেয়েটার গায়ে লজেন্স লাগবে, আমি তার সঙ্গেই প্রেম করব। বলেই লজেন্সটা ও ছুড়েছিল। গিয়ে লাগল তোমার গায়ে। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলে, 'কী অসভ্য ছেলে রে বাবা।' ভেবেছিলে, আমি ছুড়েছি। তাপস অবশ্য সেদিনই তোমাদের দন্ডিরহাটে গিয়ে তোমার হোয়ার অ্যাবাউটস জেনে এসেছিল। ওর এত উৎসাহ।'

লালি হাসতে হাসতে বলল, 'কই, তাপস তো এ সব কথা আমায় আগে বলেনি?'

'বলবে কোন লজ্জায়। তোমার খবর নিতে গিয়ে সেদিন তো মার খেতে খেতে বেঁচে গেছিল।'

'তাই নাকি? কেন সানুদা?'

'আরে আমতলায় গিয়ে যার কাছে তোমার কথা জানতে চেয়েছিল, সে তোমার বড়দা। আমিও সেদিন সঙ্গে ছিলাম। তোমার দাদাকে তখন আমরা চিনতাম না। আমরা কী রিস্ক নিয়েছিলাম, ভাবো।'

তাপস ব্যাজার মুখে বলল, 'ক্যাপ্টেন, তুই... এ কথা বলছিস! আমরা না সাহসী সংঘের মেম্বার ছিলাম। কোনও শালাকে তখন আমরা ভয় করতাম?'

লালি বলল, 'সাহসী না ছাই। বাবার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তো কেঁপে গেছিলে।'

'সে তো তখন ক্যাপ্টেন সঙ্গে ছিল না বলে। যাক সে কথা, মাল তো তুমি খেতে দেবে না। বরং সিদ্ধির শরবতটা এখন সার্ভ করো। রোসির জন্য আমি আর ওয়েট করতে পারছি না।'

'দেখছেন সানুদা, কথার ছিরি। আমাকে সার্ভ করতে বলছে। আমি যেন হোটেলের বেয়ারা।'

'আহা, চটছ কেন লালি? কিছু কথা আছে, ইংরেজিতে বললে ভালো শোনায়। আসলে তোমাকে চটানোর জন্য ও মাল খাওয়ার কথা তুলল। জীবনে ও একবারই মাল খেয়েছিল। সেদিন বাবার হাতে জুতোপেটা খাওয়ার পর, আমি যদ্দূর জানি, আর খায়নি। কী রে

pathagar.net

তাপস, মনে আছে?'

তাপস হাসতে হাসতে বলে, 'মনে আবার থাকবে না, কী যে বলিস।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল লালি। ফ্রিজ থেকে শরবত বের করে গ্লাসে ঢালার ফাঁকে বলল, 'কী হয়েছিল সানুদা, বলুন তো।'

ওর দিকে তাকিয়ে সায়ন বলল, 'সে একেবারে হাইট! জানো লালি, সেবার ভাসান চলার সময় নৌকোয় ক্লাবের পন্টুদা আমাদের সবাইকে জোর করে মাল খাইয়েছিল। আমি এক চুমুক চেখে বাকিটা ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাপস তখন সদ্য তোমার প্রেমে পড়েছে। চিত্তে প্রচুর সুখ। অল্প সময়ের মধ্যে তিন পেগ টেনে একেবারে আউট। ঘাটে ওঠার পর হঠাৎ ওর খেয়াল হল, কাজটা ভালো করেনি। বার বার বলতে লাগল, 'লালি জানতে পারলে আমাকে খারাপ ছেলে ভাববে। ওর বাড়িতে আমায় নিয়ে চল। আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইব।' আমরা যত বলি, লালি জানতে পারবে না, ও ততই বলে, 'না না লালির নেটওয়ার্ক তোরা জানিস না। ও জানবেই।' বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমরা দু'তিনজন তো ওকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম। তার পর কী হয়েছিল ওর মুখেই ডিটেলে শোনো।'

শরবতের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে লালি হাসতে হাসতে বলল, 'কী হয়েছিল গো?'

তাপস বলল, 'কী আবার হবে? পাশের বাড়ির প্রদ্যোত মেসো দেখে ফেলেছিল। বন্ধুরা আমাকে ধরাধরি করে বাড়িতে আনছে। মেসো সে কথা বাবাকে বলে দিয়েছিল। হা হা হা... সেদিন বাবার হাতে জুতো পেটা খেয়েছিলাম।'

লালি খুব হাসছে। বলল, 'প্রদ্যোত মেসো ঠিক করেছিল।'

তাপস বলল, 'না ঠিক করেনি। মেসো নিজেও মাল খেত। আমি নিজের চোখে ওঁকে মাল কিনতে দেখেছি। কালুদার ঠেক থেকে। আরে বাবা, আমাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন।'

সিদ্ধির শরবতটা খেতে খুব ভালো লাগছিল সায়নের। অনেকদিন পরে খেল বলে বোধহয়। একটা সময় মাও ভাসানের দিন শরবত বানিয়ে রাখত। সকাল থেকে সিদ্ধি, বাদাম পেস্তা বাটতে বসত কুন্তীমাসি। সিদ্ধির গন্ধে ম ম করত বাড়িটা সারাদিন। বাবা আইসক্রিম কল থেকে বরফের চাঁই নিয়ে আসত। সিদ্ধির শরবত ঠান্ডা করে রাখা হত। সন্ধেবেলা ইছামতী থেকে ফেরার পর বাড়িতে প্রচুর লোকজন আসত। মা সবাইকে খাওয়াত সেই শরবত। বাবা মারা যাওয়ার পর সে সব বন্ধ হয়ে গেছে।

কথা বলার ফাঁকে শরবত খাওয়া চলতে লাগল। গল্প করার সময় সায়ন লক্ষ করল, তাপসের গলা জড়িয়ে আসছে। মাঝে মাঝে উলটো-পালটা কথা বলছে রোসির নামে। শুনে লালি বিরক্ত হচ্ছে। হঠাৎ ও বলল, 'এইবার বিয়ে করুন সানুদা। চার পাঁচটা দিন কবজি ডুবিয়ে খাওয়া যাক।'

সঙ্গে সঙ্গে তাপস বলল, 'ক্যাপ্টেন কাকে বিয়ে করবে বলো তো লালি। ক্যাপ্টেনের যোগ্য মেয়ে বসিরহাটে আছে নাকি? একজনই ছিল। কিন্তু তার রূপের এমনই দেমাক,

মাটিতে পা পড়ে না।'

'কার কথা বলছ তুমি?'

'কে আবার, তুমি তাকে চেনো। তোমার ক্লাসেই পড়ত, তিতাস। ক্যাপ্টেন তো ছোটবেলা থেকেই তাকেই পছন্দ করে রেখেছে।'

'সত্যি নাকি সানুদা। দারুণ হবে কিন্তু। বলুন, ঘটকালি করব নাকি?'

সায়ন উত্তর দেওয়ার আগেই তাপস মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'আই বেগ টু ডিফার, লালি। কথাটা কিন্তু তুমি ঠিক বলোনি। তিতাসের চেয়েও সুন্দরী বসিরহাটে আছে। ইয়েস, আছে। আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তোমার রূপ যা খুলে গেছে, তিতাস তোমার ধারে কাছে আসতে পারবে না।'

শুনে লালি মারাত্মক চটে গেল। 'বোকার মতো কথা বোলো না তো। তিন গ্লাস শরবত খেয়েই নেশা হয়ে গেছে। এইসব উলটো-পালটা কথা বলেই সে দিন তুমি রোসিদার সঙ্গে ঝগড়া করেছ।'

কে কার কথা শোনে। তাপস জড়ানো গলায় বলতেই লাগল, 'সরি লালি, তোমার কথা মানতে পারলাম না। ইউ আর দ্য মোস্ট বিউটিফুল লেডি ইন বসিরহাট। মোস্ট বিউটিফুল।'

মিনিট পাঁচেক পর তাপসকে প্রায় তাড়িয়েই নিয়ে গেল লালি। দরজা বন্ধ করার পর হঠাৎ সায়নের মনে পড়ল, এই রে ভাসান থেকে ফেরার পর মা কলাপাতায় দশবার দুর্গানাম লিখতে বলেছিল। সেটা লেখা হয়নি। দাদানের বাড়ি থেকে ফিরে মা যদি কাল সেটা দেখতে চায়, কী হবে? কলাপাতা আর খাগের কলম মা রেখে গেছে দোতলায় ওর ঘরে। কলাপাতা আর খাগের কলম নেওয়ার জন্য সায়ন দোতলায় উঠে লাইট জ্বালাতেই চমকে উঠল। ওর খাটের পিছনে কে যেন লুকিয়ে। চোর নাকি? দরজার খিলটা খুলে হাতে নিল সায়ন। তার পর কড়া গলায় বলল, 'এই বেরিয়ে আয়। না এলে মার খেয়ে মরে যাবি।'

খাটের কোণ থেকে ভয়ে ভয়ে উঠে এল একটা মেয়ে। মাই গুডনেস, এ তো নৌকোয় দেখা সেই বাংলাদেশি মেয়েটা।

pathagar.net

মহা মুশকিলে পড়েছে সায়ন। মেয়েটিকে নিয়ে। সাদা চোখে মেয়েদের বয়স বোঝা কঠিন। তবুও সায়নের ধারণা, মেয়েটা ওরই বয়সি। দু'এক বছর কম হলেও হতে পারে। ফরসা টকটকে গায়ের রং। খানিকটা মঙ্গোলিয়ান টাইপের মুখ। পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের মতো। তবে চোখ সরু নয়, চোখ দু'টো খুব সুন্দর। পরনে সালোয়ার কামিজ নেই। তার বদলে ময়লা শাড়ি। দু'তিন দিন বোধহয় স্নান-টান করেনি। ফলে পুরো চেহারায় কেমন যেন একটু রুক্ষ ভাব। প্রথম প্রশ্নটা সায়ন করেছিল, 'তুমি কে? তুমি কি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছ?'

মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যার উত্তর হ্যাঁ বা না দুই-ই হতে পারে।

'তোমাকে পুলিশ খুঁজছে, তুমি কি জানো?'

মেয়েটা সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রশ্নটা বুঝল কী না, সায়ন বুঝতে পারল না।

'এখানে লুকিয়েছ কেন? এক্ষুনি চলে যাও।'

কথাটা বলেই সায়ন আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখাল। তা-ও কোনও উত্তর নেই। মেয়েটা শুনল বলে মনে হল না। বোবা নাকি? কী সমস্যা রে বাবা। রাত প্রায় এগারোটা। মা থাকলেও না হয় একটা কথা ছিল। ফাঁকা বাড়িতে ও আর একজন যুবতী মেয়ে। কেউ দেখে ফেললে তো বদনাম হয়ে যাবে। এ ছাড়া, মাঝ রাতে ওই দুটো পুলিশ যদি ঘুরে আসে, বাড়ি সার্চ করতে চায়, এবং মেয়েটাকে পেয়ে যায়, তা হলে তো ওকেও থানায় তুলে নিয়ে যাবে। মায়ের কাছে সায়ন তা হলে আর মুখ দেখাতে পারবে না। ইস, লালি আর তাপস থাকার সময়ও যদি মেয়েটাকে চোখে পড়ত, ওদের কাছ থেকে বুদ্ধি নেওয়া যেত। ওরা দু'জনে অন্তত সাফাই দিতে পারত, সায়নের কোনও দোষ নেই।

মেয়েটা এতক্ষণ বিছানার ওপর বসে ছিল। হঠাৎ শুয়ে পড়ল। এ কী, মাথায় দেওয়ার

জন্য বালিশও টানছে। আরে, ঘুমোনোর মতলব করছে নাকি। বেশ লম্বা। বিছানা ছাড়িয়ে পা দুটো খানিকটা ঝুলে পড়েছে। ওর বিছানায় অপরিচিত একটা মেয়ে! সায়ন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এ রকম একটা ঘটনা ওর সামনে ঘটছে। 'এই ... এই ঘুমোচ্ছ কেন' বলে কয়েকবার ওকে জাগানোর চেষ্টা করল সায়ন। কিন্তু তাতে কাজ হল না। ডাকাডাকি সত্ত্বেও মেয়েটার মধ্যে কোনও তাপ উত্তাপ নেই। হঠাৎই ওর মনে হল, মেয়েটাকে ও চলে যেতে বলছে বটে, কিন্তু এত রাতে ও যাবেই বা কোথায়? বাইরে বেরোলে, এখন বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে যাবে। রাতের দিকে টাকি রোডে যাদের দেখা যায়, তারা আর যাই হোক, সুবিধের লোক না। লাখ লাখ টাকার জিনিস স্মাগল করে। হয়তো কোনও ট্র্যাকে মেয়েটাকে তুলে নেবে। তার পর রেপ করে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যাবে রাস্তায়।

মাকে ফোন করবে কী না, চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নীচ থেকে ফের ডোর বেলের শব্দ। এ বার সামনের দরজা থেকে। শব্দটা শুনে বুক কেঁপে উঠল সায়নের। পুলিশ নাকি? ছি ছি, পুলিশ হলে কী করবে? ও কি সত্যি কথাটাই বলবে? ঘরের আলো নিভিয়ে সায়ন দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল। দরজা খুলে অবশ্য দেখল রোসি। ওকে দেখে রোসি বাইকের আলোটা নেভাল। বুকের ভেতর থেকে পাথরটা নেমে গেল সায়নের। যাক, পরামর্শ দেওয়ার মতো একজনকে পাওয়া গেল। সায়ন বলল, 'এত রাতে, আসার সময় হল তোর? কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?'

উত্তর না দিয়ে, ভেতরে ঢুকে রোসি বলল, 'তাপস আর ওর বিশ্বসুন্দরী বউটা গেছে, না আছে?'

'এই মিনিট পাঁচেক আগে ওরা গেল। কেন রে?'

'তাপসটা আজকাল বহুত ভাট বকে। ও থাকলে আমি সেখানে যাই না। চল ওপরে চল। তোর ঘরে গিয়ে বসি। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। তোর জন্য অনেক খবর আছে।'

ওপরে যাওয়ার কথায় আঁতকে উঠল সায়ন। বলল, 'না না। ওপরটা বড্ড অগোছালো। বরং আমরা নীচে ড্রয়িং রুমেই বসি।'

শুনে রোসি অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, ' সে কী রে? অ্যাদ্দিন তো তোর ওপরের ঘরেই আড্ডা মেরেছি। বেশ, তোর যেমন ইচ্ছে।'

কলকাতায় রাত বারোটার আগে সায়ন ঘুমোয় না। আজ এমনিতেই ওর ঘুম চটকে গেছে। ওপরে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে শুয়ে রয়েছে। বেআইনিভাবে এ দেশে ঢুকেছে। এটা জেনেও মেয়েটাকে শেলটার দিয়েছে। যা মোটেই ওর উচিত হয় নি। সায়ন একবার ভাবল, মেয়েটার কথা রোসিকে বলবে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। না, এখন ওকে কিছু জানানো ঠিক হবে না। রাতটা কাটুক। সকালবেলায় মেয়েটাকে ও চলে যেতে বলবে। বেচারি হয়তো পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ঘণ্টা কয়েক অন্তত ও ঘুমিয়ে নিক। সবথেকে ভালো হয়, মেয়েটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলে। ওর সেটাই করা উচিত। সায়ন ঠিক করল, সকালে মেয়েটাকে অবশ্যই থানায় পৌঁছে

দেবে।

রোসি যে সঙ্গে একটা ব্যাগ নিয়ে ঢুকেছে, সায়ন আগে তা লক্ষ করেনি। টেবিলের ওপর সেটা রেখে রোসি বলল, 'মা তোর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। চল, দু'জনে মিলে এখুনি খেয়ে নিই। না হলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। দাঁড়া, কিচেন থেকে আমি দু'টো ডিশ নিয়ে আসছি।'

কথাগুলো বলেই রোসি কিচেনের দিকে চলে গেল। কিচেনের বাঁ পাশেই দোতলা ওঠার সিঁড়ি। ড্রয়িং রুম থেকে সায়ন লক্ষ রাখতে লাগল, হুট করে যেন রোসি ওপরে উঠে না যায়। মেয়েটা নিশ্চয়ই এখন ঘুমিয়ে, ওপরতলাটা পুরো অন্ধকার। রোসির টের পাওয়ার কথা নয়, ওপরে তৃতীয় একজন আছে। কিচেন থেকে ডিশ নিয়ে রোসি এ দিকে আসছে। হঠাৎ ও সিঁড়ির নীচে দাঁড়াল। তার পর ফিসফিস করে বলল, 'সানু, এ দিকে আয় তো। ওপরের বাথরুমে জল পড়ার শব্দ পাচ্ছিস? কেউ চান করছে নাকি?'

শুনে এক লাফে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায় সায়ন। বলল, 'তোর মাথা খারাপ? এত রাতে কে বাথরুমে চান করবে? তাপস ওপরে টয়লেট করতে গেছিল। বোধহয় জলের কল খুলে রেখে গেছে। তুই খাবারটা সাজা। আমি ততক্ষণে কল বন্ধ করে আসছি।'

'তাই বল। এটা ওর মতো ইডিয়েটের পক্ষেই সম্ভব।'

দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে সায়ন দেখল, টয়লেট থেকে মেয়েটা মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছে। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তার পর ধীর পায়ে ফের শোওয়ার ঘরে চলে গেল। যেন নিজের বাড়ি। ওকে চুপ করে থাকতে বলবে মনে করেও, সায়ন কোনও কথা বলল না। বলে লাভ নেই। মেয়েটা স্বাভাবিক নয়। এই শুয়ে পড়েছিল। এই আবার এত রাতে চান করছে। পুলিশ বলছিল, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। নিশ্চয় কোনও না কোনও কারণ আছে। বাড়ির লোকেরা কি ওকে মারধর করত? জোর করে বিয়ে দিচ্ছিল? না কি পরীক্ষায় ফেল করেছিল ও? কে জানে? নীচে নেমে সায়ন দেখল, ডিশে লুচি আর আলুর দম সাজিয়ে রোসি বসে রয়েছে। ওকে দেখে বলল, 'ভাসানের দিন আমাদের বাড়িতে আমিষ হয় না। নে বোস, খেতে খেতে কথা বলা যাক।'

প্রথম গ্রাসটা মুখে দিয়ে সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'তাপসের ওপর তুই এত রেগে আছিস কেন রে? তোদের মধ্যে তো খুব বন্ধুত্ব ছিল।'

'ওর কথা জিজ্ঞেস করিস না ভাই। আস্ত ইডিয়েট। এত ভালো একটা কেরিয়ার করতে পারত। প্রেম-ট্রেম করে সব জলাঞ্জলি দিল।'

বুঝতে না পেরে সায়ন জানতে চাইল, 'কী রকম?'

'আরে ডবলিউবিসিএস পরীক্ষায় পাস করেছিল। জানিস, ইন্টারভিউতে কল পেল। ভালো একটা সরকারি চাকরি বাঁধা। সেই ইন্টারভিউ তাপস দিতে গেল না। কী না ... চাকরিটা পেলে বসিরহাট ছাড়তে হবে। সরকারি চাকরি, অন্য কোথাও পোস্টিং দেবে। তা হলে ওর জীবন থেকে লালি হারিয়ে যাবে। তখন দুই বাড়িতেই আপত্তি। সে সব না

মেনে হুট করে, ওরা রেজিস্ট্রি বিয়েটা করে ফেলল। আমি অনেক বারণ করেছিলাম রে। শুনল না। তাপস বলল, নিজের চরকায় তেল দে। তাপসের বাবা এখন আর ওর মুখ দেখে না। এখন ওরা ভাড়া বাড়িতে থাকে। তাপস স্কুলে একটা চাকরি জুটিয়েছে। বাড়িতে কোচিং ক্লাস খুলেছে। এইভাবেই চালাচ্ছে।'

'কবে ঘটেছে এ সব?'

'এই তো মাস ছয়েক আগে। অত তাড়াহুড়ো করার কী দরকার ছিল বল? তুইও তো তিতাসের প্রেমে পড়েছিস সেই ক্লাস টেনে পড়ার সময়। সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। তুই তো পাগলামি করিসনি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ফিরে এলি। এইবার বিয়ে থা করবি। সব কিছুর তো একটা প্রয়োজন বা সময় বলে কথা আছে।'

'রোসি...রুশাতির সঙ্গে তোর সম্পর্কটা কদ্দূর এগিয়েছে রে? তুই কি ওকে বিয়ে করবি?'

'মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। কিছু দিনের মধ্যেই টাকি রোডটা আট লেন-এর হওয়ার কথা। ওটা হয়ে গেলেই বিয়েটা সেরে ফেলব ভাবছি।'

'টাকি রোড আট লেন-এর হওয়ার সঙ্গে তোর বিয়ের সম্পর্কটা কী?'

'দ্যাখ ভাই, টাকি রোডটা চওড়া হলে, হাসনাবাদ দিয়ে বিজনেস রিলেশনটা ডাইরেক্ট অনেক বেড়ে যাবে বাংলাদেশের সঙ্গে। তখন এক্সপোর্টের ব্যবসায় নামব। তা ছাড়া তখন কয়েকটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ফ্রাঞ্চাইসি নেওয়ার কথাও ভাবছি। সেই সময় আমার একজন ভালো পার্টনার দরকার। যাকে স্পোকেন ইংলিশে খুব চোস্ত হতে হবে। পয়সা দিয়ে এ রকম লোক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে কতটা বিশ্বস্ত হবে, আমার সন্দেহ আছে। রুশাতি ছাড়া বসিরহাটে এ রকম আর কোনো মেয়ে পেলাম না রে। ও পড়াশুনো করেছে ইংলিশ মিডিয়ামে। ইংলিশে এম এ কমপ্লিট করেছে। দেখতে হয়তো ও খুব ভালো না। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ওর সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম খোলাখুলি কথা হল, সেদিন আমি ক্লিয়ারলি ওকে বলে দিয়েছিলাম, নৌকো করে বাজিতপুরের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে প্রেম করার সময় আমার হাতে নেই। আমার লাইফ পার্টনার যদি হতে চাও, তা হলে বিজনেস পার্টনারও হতে হবে।'

'ও তখন কি বলল?'

'বলল, আমি রাজি। আমাকে শুধু শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ো। বারাসতে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শেখানোর একটা সেন্টার হয়েছে। সেখানে রুশাতিকে ভর্তি করে দিয়েছি। কম্পিউটারের একটা কোর্সও শিখছে। বিজনেস ভলিউম বেড়ে গেলে তখন আমাদের কম্পিউটার হ্যান্ডেল করতে হবে। নেটে সারা বিজনেস ওয়ার্ল্ডের খবর রাখতে হবে। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সেই সময় সেই কাজটা করবে রুশাতি। দ্যাখ ভাই, বিয়েটা আমার কাছে শুধু একটা ইমোশনাল বা রোমান্টিক রিলেশনশিপ নয়। এর সঙ্গে প্রফেশনাল রিলেশনশিপ পাঞ্চ করাও দরকার। না হলে লাইফ স্টাইলটা অন্য মাত্রায় নিয়ে

যাওয়া যাবে না।'

সায়নের মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে এ সব শুনে। ও বলল, 'তুই এ সব শিখলি কোথায় রে?'

'গুজরাতি বিজনেসম্যানদের কাছ থেকে। ওদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে জানিস। ওদের ফ্যামিলিতে কেউ বসে খায় না। দেখবি হাজব্যান্ড যখন লাঞ্চ খেতে গেছে, তখন ওয়াইফ দোকানে এসে বসেছে। কর্মচারীদের খাটাচ্ছে। আমাদের বাড়ির বউদের মতো খাওয়ার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ওরা হাজব্যান্ডকে পাখার হাওয়া দেয় না। জানিস, রুশাতির সঙ্গে সপ্তাহে মাত্র একদিনই আমার দেখা হয়। অথবা কোনও ছুটিছাটায়। যেমন, আমাদের মধ্যে দেখা হয়েছিল সেই বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। আজ দেখা হল প্রায় একমাস পর। এমনকী, পুজোর দিনগুলোতেও রুশাতিকে বাইরে বেরুতে দিই নি। বাড়িতে ওকে বই নিয়ে বসে থাকতে বলেছি। কালীপুজোর পরই ওর কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। তার পর ওর নামেই একটা কোম্পানি খুলব — রুশাতি এন্টারপ্রাইসজেস।'

'রুশাতির বাড়ির লোকজন কোনও আপত্তি করেনি?'

'প্রথম প্রথম ওর মা করেছিল। তার পর আমার সিরিয়াসনেস দেখে আর কোনও কথা বলেনি। আসলে কী জানিস, জীবনে প্ল্যান করে এগোতে হয়। আর সেটা কনজুগাল লাইফ শুরু করার আগে থেকে। দিনকাল যা আসছে, তাতে আর একজনের রোজগারে চলবে না। সেটা আমার বাড়িতেও আমি বুঝিয়েছি। রুশাতিকে বলেছি, তোমায় বিয়ে করব বটে, কিন্তু দশ বছরের আগে মা হতে চেয়ো না। এই দশটা বছর আমরা চুটিয়ে ব্যবসা করব। ও তাতেও রাজি। ওর লেখাপড়া কদ্দূর এগোল, নিয়মিত তার খোঁজ নিই। আজ ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এই কারণেই আসতে আমার দেরি হয়ে গেল।'

'একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব?'

'হ্যাঁ, বল না। তুই এত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন?'

'রুশাতিকে কখনও চুমু-টুমু খেয়েছিস?'

'ধুর, এটা কোনও প্রশ্ন হল? ওকে শুধু চুমুই খাইনি, আমাদের মধ্যে ফিজিক্যাল রিলেশনও আছে। ও দিক থেকেও রুশাতিকে আমি তৈরি করে নিচ্ছি। যাক সে কথা, এ বার তোর কথা বল।'

'তিতাস সম্পর্কে কি তুই খোঁজ খবর নিয়েছিস?'

'নিয়েছি। তুই তো জানিস, ওর সম্পর্কে আমার একটা রিজার্ভেশন ছিল। একটা নেগেটিভ ধারণা ছিল। কিন্তু এখন খোঁজ নিয়ে জানলাম, বাইরে থেকে মেয়েটাকে যা মনে হয়, আসলে তা নয়। ও একটা দারুণ কেরিয়ার পারস্যু করছে। শুনে তুই খুব খুশি হবি।'

মুখের গ্রাস আটকে যাচ্ছিল, তবুও সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'কী কেরিয়ার রে?'

'মডেলিং আর অ্যাকটিং কেরিয়ার। মেয়েটার এলেম আছে মাইরি। কলকাতায় গিয়ে

মডেলিং আর অ্যাকটিং কোর্স করে এসেছে। দু'তিনটে অ্যাড ফিল্মও করেছে। আজ বিকেলে খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হল। তোর কথাও জিজ্ঞেস করছিল। দেখলাম তোর সম্পর্কে বেশ খবর রাখে। বলল, আজই নাকি তোকে নৌকোয় দেখেছে। মুশকিল হচ্ছে, তোকে ও পছন্দ করে বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ওর নেই। কথাবার্তায় সেটা বুঝলাম।'

'ও কী চায় বল তো?'

'সেটা আমায় বলবে কেন বল। তুই ওর সঙ্গে কথা বলে নে না। একদিন কলকাতায় নিয়ে যা। ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে বসে, ওর সঙ্গে কথা বল। শোন যা করবি, স্টাইলে করবি। তাপসের মতো করিস না। আমি তো খোলাখুলি কথা বলার জন্য রুশাতিকে নিয়ে গেছিলাম পার্ক স্ট্রিটের মার্কোপোলোতে। হাজারখানেক টাকা খরচা হয়েছিল সেদিন। তা হোক, রুশাতি পরে সেটা পুষিয়ে দেবে।'

'তিতাসের সঙ্গে তোর আর কী কথা হল রে?'

'ও একটা খুব ভালো খবর দিল, জানিস। গেল সপ্তাহে প্রসেনজিৎ নাকি বসিরহাটে এসেছিল, কী একটা ফিল্মের শুটিং উপলক্ষ্যে। তিতাস সার্কিট হাউসে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে। ওকে দেখে প্রসেনজিৎ নাকি খুব উৎসাহ দিয়েছে। বলেছে, টালিগঞ্জে গেলে তুমি হিরোইন হতে পারবে। সেই পোটেন্সিয়ালিটি তোমার মধ্যে আছে। দেখতে তো তিতাস খুব ভালো। তার ওপর নাচ গান সব জানে। ওর হতে পারে। আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে ভাই। তিতাসকে যদি লাইফ পার্টনার করিস, তা হলে ওকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিস। কে বলতে পারে, একদিন ও ঋতুপর্ণাকে ছাড়িয়ে যাবে না? আর যদি তা হয়, তা হলে আমার বিজনেসের কাজে আসবে। আমার কোম্পানির বিজ্ঞাপনে ওকে ইউজ করতে পারব।'

'তিতাস আমার কথা কিছু বলেনি?'

'তোর চাকরি-বাকরির কথা জানতে চাইল। সল্ট লেকের কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিস শুনে একটু উৎসাহ দেখাচ্ছিল। কিন্তু যে-ই শুনল, তুই সুরাটের চাকরিটা নিচ্ছিস, তখনই কেমন যেন মিইয়ে গেল। তুই ভাই যা করবি, এখনই ঠিক করে ফেল। এই মেয়ে কিন্তু বসিরহাটে বসে, রাতের বেলায় তোর মায়ের পায়ে তেল মালিশ করার মেয়ে না।'

'ওর বাড়ির লোকের কী ইচ্ছে, কিছু বলল?'

'সে কথাও হল। ওর মা-বাবার খুব ইচ্ছে, এই ডিসেম্বরেই তোর গলায় ওকে ঝুলিয়ে দেবে। তোর মায়ের সঙ্গে সেই রকম কথাবার্তাই নাকি হয়ে আছে। মাসিমা নাকি আগামী সপ্তাহেই আশীর্বাদটা সেরে রাখতে চায়। তোর বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করতেই মাসিমা হাসনাবাদে গেছে।'

রোসির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রাত বারোটা বেজে গেল। দেওয়াল ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার সময়ই উঠে দাঁড়িয়ে রোসি বলল, 'এত চিন্তা করার কিছু নেই। এখন তো এখানে

আছিস। দরকার পড়লে ডাকিস। দু'জনে মিলে আলোচনা করা যাবে।'

মোটরবাইকে শব্দ তুলে রোসি চলে যাওয়ার পর ডাইনিং টেবিলে চুপ করে বসে রোসির কথা ভাবতে লাগল সায়ন। কে ঠিক, তাপস না রোসি? ও ঠিক বুঝতে পারল না। এ তো পাগলামি। লালিকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে নিজের কেরিয়ার জলাঞ্জলি দিল তাপস। আর নিজের কেরিয়ার গড়ার জন্য রুশাতিকে কাজে লাগাচ্ছে রোসি। ভালোবাসার ডেফিনেশনটা তা হলে আসলে কী? চেয়ারে বসে থাকার সময়ই সায়ন ঠিক করল, পাগলামি ও করবে না। যা স্বাভাবিক, তিতাসকে পাওয়ার জন্য, ও তাই করবে। তিতাসকে ও পছন্দ করে। তিতাসকে নিয়েই ও স্বপ্ন দেখেছে। বিয়ে যদি কাউকে করে, তো সে তিতাসকেই।

এঁটো ডিশগুলো টেবিল থেকে উঠিয়ে, বেসিনের ওপর রাখল সায়ন। কাল সকালে কুন্তীমাসি আসবে, তখন মাজবে। কিচেন থেকে বেরোনোর সময় হঠাৎই ওর চোখে পড়ল, মেয়েটা ওপর থেকে নেমে আসছে। এতক্ষণ এর কথা মনে ছিল না। চান করার পর মেয়েটার চেহারাই যেন বদলে গেছে। পরনে সালোয়ার কামিজ। মাথায় ভিজে চুল। একেবারে কোমর পর্যন্ত। মুখটা খুব পবিত্র বলে মনে হল সায়নের। মেয়েটা ফরফর করে কী যেন বলল। সায়ন কিছুই বুঝতে পারল না। তবে এটা নিশ্চিন্ত হল, মেয়েটা আর যাই হোক অন্তত বোবা নয়। ও এমন কোনও ভাষায় কথা বলছে, যা সায়ন জানে না।

ঈঙ্গিত করে ও জানতে চাইল, 'কী বলছ?' মেয়েটা মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বোঝাল, খেতে চাইছে। যাক বাবা, মেয়েটার সঙ্গে তা হলে, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ চালানো যাবে। রোসির আনা লুচি আলুর দম অনেকটা পড়ে ছিল। ডিশে করে, সায়ন তা এগিয়ে দিল। মেয়েটা খাওয়ার পর নিশ্চয়ই জল খেতে চাইবে। এটা ভেবে ফ্রিজ খুলে জলের বোতল আনতে গিয়ে সায়ন যখন ডাইনিং টেবিলের দিকে যাচ্ছে তখনই হঠাৎ ও কান্নার শব্দ শুনতে পেল। দেখল, খাবার টেবিলে মুখ গুঁজে মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সে দিকে তাকিয়ে সায়নের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। হয়তো দীর্ঘ সময় ওর পেটে কিছু পড়েনি। হয়তো খেতে বসে বাড়ির লোকজনের কথা ওর মনে পড়ে গেছে। সেই কারণে কাঁদছে। খানিকটা সময় পর চোখ মুছে মেয়েটা খেতে শুরু করল। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সায়নের মনে হল, মেয়েটা খুব সাধারণ পরিবারের না। আর পাঁচটা মেয়ের মতো হলে এখানকার পুলিশ ওকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে উঠত না। রোজই তো কত মেয়ে ওপার থেকে এখানে এসে হারিয়ে যায়। কই, পুলিশ তো তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না? নিশ্চয়ই কোনও একটা কারণে মেয়েটা এ দেশে এসেছে। সেটা বলতেও চাইছে। কিন্তু ভাষা সমস্যার জন্য বোঝাতে পারছে না। মেয়েটাকে ওর যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত। সায়ন ঠিক করে নিল, মেয়েটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত হবে না।

সক্কাল বেলায় মায়ের ফোন, 'হ্যাঁরে সানু, তিতাসের খবর কিছু জানিস?'

বুঝতে না পেরে সায়ন বলল, 'কোন তিতাস মা?'

মা রেগে গিয়ে বলল, 'কোন তিতাস, তুই জানিস না? বসিরহাটে কটা তিতাস আছে? হাঁদা কোথাকার। কেন অরূপবাবু তোকে ফোন করেনি?'

'না তো? কী ব্যাপারে?'

'তাই বল। তুই তা হলে কিছুই জানিস না কী হয়েছে?'

'কার কী হয়েছে মা?'

'তিতাস যে কাল বাড়ি থেকে চলে গেছে, কেউ তোকে বলেনি?'

'না কেউ বলেনি।'

'রোসির সঙ্গে তোর দেখা হয়নি?'

'হ্যাঁ, পরশু অনেক রাত্তির পর্যন্ত ও আমাদের বাড়িতে ছিল।'

'আরে, ও-ই তো আসল কালপ্রিট। কাল সকালে আমতলায় গিয়ে রোসি নাকি তিতাসকে খুব করে উৎসাহ দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি পারো, কলকাতায় চলে যাও। এখানে পড়ে থাকলে তোমার কিস্যু হবে না। ব্যস, মেয়ের মাথা ঘুরে গেছে। কাল বিকেলেই মেয়ে বাড়ি থেকে হাওয়া। তোর বন্ধুগুলো কী রে? কত বার বলেছি, ওদের সঙ্গে মিশিস না। তুই আমার কোনও কথা শুনিস না।'

কাল তিতাসদের বাড়িতে রোসি গিয়েছিল শুনে সায়ন একটু অবাকই হল। কাল সারাটা দিন ও নিজে বাড়ি থেকে এক পাও বেরোতে পারেনি। বাংলাদেশের মেয়েটাকে নিয়ে ও এমন ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, মাকে ফোন করার টাইমও পায়নি। কুন্তীমাসির চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ওকেও লুকোচুরি খেলতে হয়েছে। মা সে সব কথা জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একবার তো ধরা পড়তে পড়তে ও বেঁচে গেছে। পরশু রাতে কান্নাকাটি করার সময় মেয়েটা যে চুলের ক্লিপ খুলে রেখেছিল টেবিলের ওপর, কে

জানত? সেটা কুন্তীমাসির চোখে পড়ে যায়। কার ক্লিপ, সেটা বিশ্বাস করানোর জন্য সায়নকে অনেক অনেক মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। ভাগ্যিস, লালির কথা মনে পড়েছিল।

'কী রে, চুপ করে আছিস কেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না?'

নিজেকে সামলে সায়ন বলে, 'পাচ্ছি, বলো।'

'বলো মানে? খবরটা শোনার পরও তুই হাত গুটিয়ে বসে থাকবি? তুই ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলি কী করে রে? আজই কলকাতায় চলে যা। মেয়েটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আন।'

'কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আমি তো কোথাও যেতে পারব না মা। ঝামেলা আছে।'

'কেন, কী এমন রাজকার্যে তুই ব্যস্ত বাড়িতে?'

'কলকাতা কি ছোট্ট জায়গা মা? তিতাস কোথায় গেছে, জানব কী করে?'

'আগে একবার আমতলায় যা। অরূপবাবুর সঙ্গে কথা বলে আয়। তা হলেই আন্দাজ পাবি। ওঁর এক ভায়রাভাই থাকেন টালিগঞ্জের দিকে। মনে হয়, তিতাস সেই মাসির কাছে গিয়েই উঠেছে। অরূপবাবুর কাছে তার ঠিকানাটা তুই চেয়ে নিবি। আর শোন, আমার আলমারির লকারে হাজার পনেরো টাকা আছে। সেই টাকা তুই সঙ্গে নিস। বলা যায় না, কাজে লাগতে পারে।'

'ওদের বাড়ির কেউ গেলে ভালো হত না মা?'

'কে আর আছে? কাল থেকে অরূপবাবু অসুস্থ। তোর বিভামাসি ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করছে। ওদের তো আর কোনও সন্তান নেই। তোকেই ওরা ছেলের মতো ভালোবাসে। তোর বয়সি কোনও ছেলে ওদের থাকলে তোকে রিকোয়েস্টই করত না। এখন তুই যাবি কী না বল। না হলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ...'

'কুন্তী ধারে কাছে আছে নাকি? দেখতো, একবার কথা বলি।'

'না মা, সে কাজ করে চলে গেছে। তুমি ফিরছ কবে?'

'কাল বিকেলের আগে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তোর দাদান আর দিদাই-ও আমার সঙ্গে যাবে। শোন, তুই আজ দুপুরেই কলকাতায় চলে যা। কালকের মধ্যে যে করেই হোক, তিতাসকে নিয়ে আসবি। আমার খুব ইচ্ছে, ওকে বউ করে আনি। অরূপবাবু আর বিভার সঙ্গে কথা হয়েই আছে। দু'চারদিনের মধ্যেই তিতাসকে আমরা আশীর্বাদ করতে যাব।'

'ও রাজি আছে কী না, সেটা জানার চেষ্টা করেছ?'

'তার মানে? রাজি না হওয়ার কী আছে? পাত্তর হিসেবে তুই কি ফ্যালনা নাকি?'

'না মা, তবুও ওকে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত।'

'তুই থাম তো। যদি তোর ইচ্ছে হয়, কলকাতায় ওকে জিজ্ঞেস করে নিবি। মেয়েছেলের অত গুমোর কিসের রে? মা-বাবা যার সঙ্গে চায়, তাকেই বিয়ে করতে হবে।'

সে দিন আর নেই। কথাটা বলতে গিয়েও আটকে গেল সায়ন। বাংলাদেশি মেয়েটা

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো কোনও দরকার আছে। না হলে নীচে নেমে আসত না। হঠাৎ ফরফর করে যদি কিছু বলতে শুরু করে, তা হলে ফোনে মা শুনে ফেলবে। আর মা হল মেয়ে ফেলুদা। সামান্য একটা সূত্র পেলেই, ঠিক বের করে ফেলবে, বাড়িতে বাড়তি একজন আছে। তাড়াতাড়ি ফোনটা ছেড়ে দেওয়া দরকার। 'ঠিক আছে মা' বলে ও যখন ফোনটা ছাড়তে যাচ্ছে, তখনই মা বলল, 'শোন, ট্রেনের জন্য ওয়েট করিস না। বাসে করেই তুই কলকাতায় যা। বাসে চাপার আগে আমায় একবার ফোন করবি। কী রে হাঁদা, কথাটা কানে গেল তো?'

'হ্যাঁ মা।' বলে সায়ন রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে মেয়েটার দিকে তাকাল।

প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা মেয়েটা এ বাড়িতে। প্রথম দিকে ওকে নিয়ে যে উৎকণ্ঠা ছিল সায়নের, এখন তা নেই। আকারে ইঙ্গিতে ও এখন মেয়েটার ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা বুঝতে পারছে। পরশু রাতে খেতে বসে মেয়েটা যখন কান্নাকাটি করছিল, তখনই সায়নের মন থেকে বিরক্তিটা উবে যায়। রাতে ওকে আর ডিস্টার্ব করেনি। কাল সকালে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল সায়ন। মেয়েটার একটা কথাও বুঝতে পারেনি। সকালে নীচের ঘরে বসে টিভি দেখছিল ও। চ্যানেল সার্ফ করার সময় হঠাৎ বিটিভি চ্যানেলে ওর চোখ আটকে যায়। বিটিভি মানে বাংলাদেশ টিভি। বর্ডার খুব কাছে বলে, বাংলাদেশের দু'তিনটি চ্যানেল বসিরহাট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বিটিভি-তে খুব ভালো ভালো নাটক হয়। এখানে থাকার সময়, আগে সেই সব নাটক দেখত সায়ন। এখন আর সুযোগ হয় না। হঠাৎই সেই বিটিভির পর্দায় মেয়েটার মুখ। নীচে লেখা রোশনি চৌধুরি। চট্টগ্রামের সাংবাদিক আবীর চৌধুরির একমাত্র কন্যা। শেষবার সাতক্ষীরা মহকুমা থেকে নিখোঁজ। কেউ সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত স্থানে খবর দেবেন। সুপারিটেনডেন্ট অব পুলিশ, আয়েষা ভবন, খুলনা। ওহ, মেয়েটার নাম তা হলে রোশনি? চট্টগ্রামের মেয়ে। এই কারণেই মেয়েটার কথা ও একবর্ণ বুঝতে পারছে না। চট্টগ্রামের ভাষা যে একেবারে অন্য ধরনের।

গত দেড় দিন ঘর করে সায়ন বুঝতে পেরেছে রোশনি মেয়েটা একেবারে অন্যরকম। খুব শান্তশিষ্ট টাইপের। মেয়েটা কী ভাষায় কথা বলছে, সায়ন বুঝতে পারছে না। তবে ও এটুকু বুঝেছে, মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু ও কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, অনেক চেষ্টা করেও সায়ন সেটা জানতে পারেনি। তাই জানতে পারেনি, ওর পরিবারে কে কে আছেন। বা এর পর ওর গন্তব্য কোথায়? এতক্ষণে কিছুটা জানতে পারল। রোশনি ছোট্ট একটা কিট ব্যাগ সঙ্গে এনেছে।

কাল সকালে ও যখন চান করতে ঢুকেছিল, তখন ওই ব্যাগটা সার্চ করেছিল সায়ন। মেয়েদের সাজার সরঞ্জাম, একটা বোরখা সহ কয়েকটা পোশাক, একটা গোঁফ আর দাড়ি, দু'তিনটে অডিয়ো ক্যাসেট আর ওয়াকম্যান ছাড়া সায়ন ব্যাগে আর কিছু পায়নি। ক্যাসেটের কভারে রোশনিরই ছবি। মেয়েটা তা হলে নিশ্চয়ই ভালো গান গায়।

রোশনি মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে?'

'আমার একটা উপকার করবে?' (চ)

'কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি একজন লোকের খোঁজ করার জন্য এ দেশে এসেছি। তুমি কি তার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?' (চ)

কথাগুলো বুঝতে না পেরে সায়ন নেতিবাচক ঘাড় নাড়ল। দেখে রোশনি খুব হতাশ হল। তারপর হঠাৎ ব্লাউজের ফাঁক থেকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে, ফরফর করে ও যেন কী বলল। কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে সায়ন দেখল, একজনের নাম আর ঠিকানা লেখা। রঞ্জন তালুকদার। ক্যালকাটা নাইট ক্লাব, ৮২ এফ শেকসপিয়র সরণি, কলকাতা। চিরকুট থেকে মুখ তুলে সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'এই রঞ্জন তালুকদার লোকটা কে?'

উত্তরে মুখ নিচু করে রোশনি কী বলল, সায়নের বোধগম্য হল না। লোকটি কি ওর আত্মীয়? কলকাতায় থাকে? এরই সঙ্গে কি রোশনি দেখা করতে এসেছে? এই সব প্রশ্ন মাথায় ঘোরাফেরা করার সময়ই সায়ন দেখল, বিড়বিড় করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে রোশনি দোতলায় উঠে যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে ওর খুব খারাপ লাগল। ইস, রোশনির কথাগুলো যদি ও বুঝতে পারত।

মা বাসে করে কলকাতায় যেতে বলেছে। বসিরহাট থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে। এর মধ্যেই ওকে চান খাওয়া-দাওয়া করে নিতে হবে। লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে পৌঁছাতে পৌঁছোতে বেলা আড়াইটা-তিনটে বেজে যাবে। তার পর আর টালিগঞ্জে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ দিকে রোশনির কী হবে? ওকে চলে যেতে বললেও যাবে না। আর যাবেই বা কোথায়? ওকে কি তাপস আর লাম্পির কাছে রেখে যাওয়া যায়? ওরা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। রোশনিকে ওরা আড়াল করে রাখতে পারবে। কিন্তু তাতে কি কোনও সুরাহা হবে? গত দেড় দিনে সায়ন এটুকু বুঝতে পেরেছে, রোশনি একটা সমস্যা নিয়ে এ দেশে এসেছে। সেই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ও নিজের দেশে ফিরবে না। সমস্যা হচ্ছে, ওর সমস্যাটা যে কী, তা সায়ন বুঝতে পারছে না। সেটা না জানানো পর্যন্ত মেয়েটাও মনে হয়, ওকে ছাড়বে না।

মুশকিল হল, রোশনি মেয়েটা এত সাদাসিধে, খারাপ ব্যবহার করে ওকে তাড়িয়ে দিতেও সায়নের মন চাইছে না। বার দুয়েক কড়া ব্যবহার করে দেখেছে ও। কিন্তু কড়া কথা বললেই রোশনি কেঁদে ফেলে। মেয়েটা যে খুব বুদ্ধিমতী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার প্রমাণও একাধিকবার সায়ন পেয়েছে। কাল বিকালে কুন্তীমাসি কাজ করতে এসে হুট করে ওপরে উঠে গিয়েছিল। সায়ন দম বন্ধ করে নীচে বসেছিল, এই বোধহয় রোশনি চোখে পড়ে যাবে। একটু পরে, ও ওপরে উঠে দেখে, কুন্তীমাসি ঘরদোর ঝাঁট দিচ্ছে। রোশনির কোনও চিহ্ন নেই। ঘর পরিষ্কার করে, বিছানায় মশারি টাঙিয়ে একটা সময়

মাসি নীচে নেমে গেল। টিভি দেখার ভান করে ওপরে বসে ছিল তখন সায়ন। দেখল, পা টিপে টিপে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে রোশনি। দৃশ্যটা দেখে ও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। তার মানে, কথা বুঝতে না পারলেও, সায়নের সমস্যাটা রোশনি বুঝতে পেরেছে। তাই চায়নি, কুন্তীমাসির চোখে পড়ে যাক। যে মেয়ে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও দেশ থেকে চলে আসতে পারে, অথবা এই ক'দিন এ দেশে থেকে যেতে পারে, তার মাথায় ঘিলু বলে তো পদার্থ থাকবেই।

টেবিলের ওপর মোবাইল ফোনটা বাজছে। হাত বাড়িয়ে সেটটা তুলে সুইচ অন করতেই সায়ন গলা পেল তাপসের। 'ক্যাপ্টেন, মাসিমা ফিরেছে হাসনাবাদ থেকে?'

সায়ন বলল, 'না ফেরেনি। কেন রে?'

'লালি বলছিল, তোকে আজ খাওয়াবে। কী একটা নতুন রেসিপি পেয়েছে টিভির কোন প্রোগ্রাম থেকে। রান্না করে তোকে না খাওয়ালে নাকি ওর শান্তি হবে না।'

'না রে, আজ হবে না। এক্ষুনি আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।'

'কেন? চাকরিতে তুই জয়েন করেছিস নাকি?'

'না, না। তিতাস বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিয়ে আসতে হবে। মায়ের আদেশ।

'খবরটা শুনলাম। কলকাতায় যাচ্ছিস যা, কোনও লাভ হবে না। গন কেস। তুই বরং অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাব। ওর সম্পর্কে যা শুনলাম, তাতে তোর কোনও আশা নেই।'

'কী শুনেছিস রে?'

'সে তো বলিউড টার্গেট করে কলকাতায় গেছে। কাল দুপুরে লালি তিতাসকে ফোন করেছিল। বলল, কলকাতায় আছে। ওর সঙ্গে নাকি কোন এক প্রোডিউসারের কথা-টথা হয়েছে। সে মুম্বাই নিয়ে যাবে। আর মুম্বাই গেলে ওর কী অবস্থা হবে, বুঝতেই পারছিস। এই জন্যই আমি বলি, মেয়েদের লাই দিতে নেই। এই মেয়েটাকে ওর বাপ মা এত তোল্লাই দিয়েছে, যে এখন তো তার ফলভোগ করতেই হবে।'

'তিতাস এখন ঠিক কোথায় আছে, জানিস? লালিকে কি কিছু বলেছে?'

'না, বলেনি। তবে লালি যখন ফোনে কথা বলে, তখন তিতাস ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে। প্রসেনজিতের শুটিং চলছে। সেই শুটিং ও রোজ দেখতে যাচ্ছে। স্টুডিয়োতে গেলে, মনে হয়, তুই ওকে পেয়ে যাবি। কলকাতায় যাচ্ছিস যখন, তখন আজকেই ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিস। মুম্বই চলে গেলে ওকে আর ধরতে পারবি না।'

ফোনে রোশনির কথা তাপসকে বলা উচিত হবে কী না, সায়ন তা ঠিক করতে পারল না। ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করার আছে। তুই কি এখন আসতে পারবি?'

'তোর বাড়িতে? না রে। আমায় এখন থানায় যেতে হবে।'

'কেন, চুরি-টুরি হয়েছে নাকি?'

'না রে, সেই ভাসানের দিনকার হুজ্জোত। আরে, বাংলাদেশের সেই মেয়েটার কথা তোর মনে আছে? যার খোঁজে পুলিশ তোর বাড়িতে গিয়েছিল? পুলিশ এখনও তাকে খুঁজে পায়নি। এখন পাগলা হয়ে গেছে ওই মেয়েটাকে ধরার জন্য। মেয়েটা নাকি ভাসানের দিন আমাদের ক্লাবের নৌকোয় উঠেছিল। কে দেখেছে কে জানে? আমাদের ক্লাবের দুটো নৌকোয় সেদিন যারা ছিল, তাদের প্রত্যেককে পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছে। ইনটারোগেট করছে। ভয় দেখাচ্ছে, কারও বাড়িতে ধরা পড়লে তার জিনা হারাম করে দেবে। ক্লাবের ছেলেরা বলেছে, নৌকোয় কোনও মেয়ে ওঠেনি। পাতলা গোঁফওয়ালা ফরসা মতো একটা ছেলে উঠেছিল। কেউ হয়তো তাকেই মেয়ে বলে চালিয়ে দিয়েছে। কী মুশকিল বল তো?'

শুনে অস্বস্তি বোধ করল সায়ন। নিজেকে ধন্যবাদ দিল এই ভেবে যে, রোশনির ব্যাপারে আগেভাগে তাপসকে কিছু না বলে, ও ভালোই করেছে। বললে, হিতে বিপরীত হয়ে যেত। এই পরিস্থিতিতে রোশনিকে এ বাড়িতে রেখে যাওয়াটাও মারাত্মক ঝুঁকির। যদি কারও চোখে পড়ে যায়, আর পুলিশ জানতে পারে, দেড়দিন ধরে রোশনি ওদের বাড়িতে শেলটার নিয়েছে, তা হলে হাতকড়ি পড়ে যাবে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে তাপস বলল, 'যা তুই কলকাতা থেকে ঘুরে আয়। দ্যাখ চেষ্টা করে, তিতাসকে ফিরিয়ে আনতে পারিস কি না। তোর কাছে কি তিতাসের ফোন নাম্বারটা আছে? না থাকলে লালির কাছ থেকে চেয়ে দিচ্ছি। পরে তোর কাজে লাগবে। দাঁড়া, নাম্বারটা তোকে মেসেজ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু পরেই পেয়ে যাবি।'

ফোনটা কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল সায়ন। তার পর মনস্থির করে ওপরে উঠে রোশনিকে ও আকারে ইঙ্গিতে বোঝাল, আমি কোলকাতা যাব? তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

শুনে রোশনির মুখটা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘাড় নেড়ে ও কিট ব্যাগটা নিয়ে এসে জামা কাপড় গুছিয়ে নিতে লাগল। ওর দিকে তাকিয়ে সায়নের মনে হল, বাসে করে কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্তটাই ঠিক। বাসে পুলিশের চেকিং হয় না বললেই চলে। সেই কারণে রোশনির ধরা পড়ার সম্ভাবনা, ট্রেনের তুলনায় অনেক কম।

প্রায় চারদিন হয়ে গেল রোশনি ইন্ডিয়ায়। এখনও ও রঞ্জনের কাছে পৌঁছোতে পারল না। পৌঁছোবে কী করে? ইন্ডিয়ার পুলিশ যে ওর পিছনে লেগে রয়েছে। বসিরহাটে পা দেওয়ার পর থেকেই ও সেটা বুঝতে পেরেছে। সিনেমা হলের সামনে ও যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখনই একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করেছিল, বসিরহাটে ও কোথায় থাকে। ভয় পেয়ে রোশনি তখন সিনেমা হল-এর ভেতর ঢুকে পড়েছিল। তখন সন্ধেবেলার শো চলছে। হল-এ খুব বেশি ভিড় নেই। লোকটা ভেতরে গিয়ে খুঁজবে ধরে নিয়ে, ও তখন মেয়েদের টয়লেটে ঢুকে পড়ে। তার পর পোশাক বদলে, গোঁফ লাগিয়ে হল থেকে বেরিয়ে আসে।

ভাগ্যিস, সেই সময় হল-এর লাগোয়া এ বাড়ির দরজাটা খোলা ছিল। একটু আগে রোশনি ওরই বয়সি দুটো ছেলে আর একটা মেয়েকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল। বাড়ির ভেতর ঢুকে রোশনি দেখতে পায়, ছেলেমেয়েগুলো নীচের ঘরে আড্ডায় মশগুল। তখন পা টিপে টিপে ও দোতলায় উঠে আসে। সেই সময় ওর বুকটা টিপটিপ করছিল। মাসির বাড়ি থেকে পালানোর সময়ও এমনটা করেনি।

একটু পরে দোতলার জানলা থেকেই রোশনি দেখতে পায়, ডোর বেল টিপে দু'টো পুলিশ ওর খোঁজ করছে। তখনই ও বুঝতে পেরেছিল, চট্টগ্রামে ওর বাবা হাত গুটিয়ে বসে নেই। ওর বাবা মানে ... এত দিন ও যাকে বাবা বলে ডেকে এসেছে, সেই আবীর চৌধুরি। হয়তো বাবা ঘলঘলিয়ায় মাসির বাড়িতেই চলে এসেছে। বাবা বাংলাদেশের নামকরা সাংবাদিক। কলকাতাতেও ওর প্রচুর জানাশোনা। মায়ের মুখে রোশনি শুনেছে, দুর্গাপুজোর আগে বাবা যখন মাকে নিয়ে কলকাতায় বাজার করতে আসত, তখন নাকি লোকজনের এত দাওয়াত পেত যে, একদিনও মা হোটেলে খাওয়ার সুযোগ পেত না। রোশনি নিশ্চিত, বাবার যা ক্ষমতা, ইন্ডিয়ার পুলিশকে ইতিমধ্যে ওর কথা জানিয়েছে। না হলে এখানে পুলিশ ওর জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে এমন খোঁজ করত না।

পরশু রাতে দোতলায় উঠে, সায়ন বলে ছেলেটা যখন ওকে আবিষ্কার করে, তখন রোশনি খুব ভয় পেয়ে গেছিল। এই বোধহয় পুলিশের হাতে ওকে তুলে দেবে। ছেলেটা কী জিজ্ঞেস করছিল, ও তা অল্প অল্প বুঝতে পারছিল। কিন্তু এমন ভান করেছিল, যেন বুঝতে পারেনি। প্রথমে ঠিক করেছিল বোবার অভিনয় করবে। যাতে সহানুভূতি আদায় করতে পারে। কিন্তু কথা বলার সময় সায়নের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রোশনির মনে হয়েছিল, ছেলেটার মধ্যে দয়া মায়া আছে। এত রাতে অন্তত বাড়ি থেকে ওকে বের করে দেবে না। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর সারাটা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। ও আড় ভেঙে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

একটু অবাক হয়েই ছেলেটা তখন নীচে নেমে যায়। ঘণ্টাখানেক নীচে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। রোশনি তখন বুঝতে পারে, বাড়িতে ছেলেটা একা। আর কেউ নেই। নিশ্চিত হয়ে ও স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢোকে। এরপরই মারাত্মক খিদেয় ওর পেট জ্বলতে থাকে। ওপরে আর থাকতে না পেরে ও পা টিপে টিপে নীচে নেমে আসে। তখনই ছেলেটা ওকে খাবারের থালা এগিয়ে দেয়। ডাইনিং টেবিলে বসে রোশনি তখন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। এই সময় খাবারের থালা এগিয়ে দেওয়ার কথা রঞ্জনের। অথচ প্রতিশ্রুতি দিয়েও টাকিতে ও এল না।

আজ সকালবেলায় সোফায় বসে রোশনি রঞ্জনের কথাই ভাবছিল। ডাইনিং স্পেসে সায়ন ফোনে কার সঙ্গে যেন তখন কথা বলছে। ফোনটা ছেড়ে এ ঘরে ঢুকে সায়ন ইঙ্গিতে বোঝাল, ও কলকাতা যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে রোশনি ওর সঙ্গে যেতে পারে। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে দাঁড়ায়। এই সুযোগটা ছাড়া যায় না। ঘুলঘলিয়া থেকে মাসতুতো ভাই দীনেশের একটা ট্রাউজার আর শার্ট নিয়ে এসেছিল। সেগুলো পরে, গোঁফ লাগিয়ে ও তৈরি হয়ে নিল। এই ছদ্মবেশটা ওর দরকার। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যাতে ওকে কেউ মেয়ে বলে ভাবতে না পারে। রঞ্জন বলেছিল, টাকি থেকে কলকাতা খুব বেশি দূরে নয়। ট্রেনে করে গেলে এক বেলার মধ্যেই ঘুরে আসা যাবে। তার মানে, আজ সন্ধের মধ্যেই ও রঞ্জনের কাছে পৌঁছে যাবে। কলকাতা নাকি অনেক বড় শহর। একবার ওখানে পৌঁছোতে পারলে, কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।

সায়নের বাড়ি থেকে রেল স্টেশন খুব দূরে নয়। রোশনি সেটা জানে। দু'দিন আগেই বসিরহাট স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতেই ও দেবযানী হলের কাছে এসেছিল। বাইরে বেরিয়ে ওরা দেখল, হলের কাছে একটা ভ্যান রিকশা দাঁড়িয়ে। সায়ন তাতে উঠে বসল। বসার সময় সায়নের সঙ্গে ওর গা ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। তখনই রোশনির সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। কেন এমন হল? ঘলঘলিয়াতেও গেল বছর রঞ্জন যেদিন বাঘা যতীন পার্কে বসে ওর হাতটা ধরেছিল, সেদিনও রোশনি সারা শরীরে একটা কাঁপুনি অনুভব করেছিল। সায়ন কিন্তু এ সব খেয়ালই করল না। হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার হাতটা তুমি ধরে থাকো। আর কিট ব্যাগটা আমাকে দাও। হঠাৎ ঝাঁকুনি লেগে

পড়ে যেতে পারে।'

কিন্তু সায়ন তো জানে না, রাঙামাটিতেও ভ্যান রিকশা চড়ার অভ্যেস ওর ছিল। কিট ব্যাগটা সায়নকে না দিয়ে রোশনি নিজের কাছে রেখে দিল। মাথার ওপর গনগনে রোদ। তবুও ভালো লাগছিল রোশনির। প্রায় দু'টো দিন যেন ও খাঁচার মধ্যে ছিল। রিকশা বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। বসিরহাট এখন খুব ব্যস্ত। আশপাশে পুলিশের লোক আছে কী না, কে জানে? কেউ যাতে ওর মুখটা ভালোভাবে দেখতে না পারে, সেই কারণে মুখটা নিচু করে রাখল রোশনি। ও ঠিক করেই রেখেছে, স্টেশনের রেস্ট রুমে ঢুকে গোঁফটা ও খুলে ফেলবে। তার পর বোরখা পরে নেবে। ভাগ্যিস ঘলঘলিয়া থেকে বুদ্ধি করে, কাজের মেয়ে অঞ্জুমান ফুফির কাছ থেকে ও একটা বোরখা চেয়ে এনেছিল। চলে আসার সময় মাত্র একটাই বোকামি ও করেছে। মোবাইল ফোনটা ঘলঘলিয়ায় ফেলে এসেছে। মোবাইল সেটে রঞ্জনের ফোন নাম্বারটা লেখা ছিল। এখন সঙ্গে থাকলে কাজে দিত।

ভাসানের দিন মাসির বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে, রোশনি এই ধরনের একটা ভ্যান রিকশাতেই ইছামতী নদীর দিকে এসেছিল। তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিল। আজ কিন্তু মন খারাপ করছে না। মনে হচ্ছে, এমন একজন আছে, যার ওপর ভরসা করা যায়। সেদিন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা ওর মধ্যে কাজ করছিল। সেই সঙ্গে অপরিচিত জায়গায় গিয়ে ওঠার ভয়ও। তখন মনকে ও প্রবোধ দিয়েছিল, রঞ্জন তো আছে। ওর সব থেকে প্রিয়জনের কাছে ও যাচ্ছে। রঞ্জন ওকে এমন ভালোবাসবে যে, কারও অভাব টের পেতে দেবে না। আজ কিন্তু ওর সেই মনের জোরটা টের পাচ্ছে না। তার কারণ, ওর জন্য টাকির খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে থাকবে বলেও, রঞ্জন থাকেনি।

রঞ্জনের সঙ্গে ওর আলাপ ঘলঘলিয়াতেই। গেলবার পুজোর সময়। মাসির বাড়িতে রোশনি বেড়াতে এসেছিল। ওর মেসোমশাই দীপ্তেন রায় বেশ ধুমধাম করে বাড়িতে দুর্গাপুজো করেন। লক্ষ্মীপুজোর পর বাড়ির উঠোনে হয় জমজমাট বিজয়া সম্মিলনী। ঢাকা আর কলকাতা থেকে গাইয়ে-বাজিয়েদের নিয়ে এসে সবাইকে মেসোমশাই তাক লাগিয়ে দেন। ফাংশানের দিন গিটার বাজাতে এসেছিল রঞ্জন। মাসতুতো ভাই দীনেশের এক বন্ধুর পরিচিত। খুবই সুপুরুষ। ওর মাসতুতো বোন অমলা বলেছিল, গানবাজনার সুবাদেই নাকি রঞ্জন প্রায়ই ইন্ডিয়ায় যাতায়াত করে। সে দিনই রোশনি টের পেয়েছিল, মাসির বাড়িতে রঞ্জনকে সবাই খুব খাতির করে। ও নাকি প্রচুর রোজগার করে, দেদার টাকা ওড়ায়। সবার অনুরোধে সেদিন রোশনিকে দুটো গান গাইতে হয়েছিল ফাংশানে। সেই রাতেই রঞ্জন যেচে এসে রোশনির খুব প্রশংসা করে। এমনও বলে ইন্ডিয়া গেলে রোশনি নাকি গাইয়ে হিসেবে প্রচুর নাম করতে পারবে।

রোশনি সেদিনই রঞ্জনের প্রেমে পড়েছিল। তবে সেটা ও বুঝতে পারে কালীপুজোর পর ঘলঘলিয়া থেকে চিটাগাং চলে আসার দিন। মা-বাবাস সঙ্গে গাড়িতে ওঠার সময় সবার অলক্ষে রঞ্জন ওর হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছিল। সেই চিঠিটা তখন পড়ার

সুযোগ পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ও হ্যান্ডব্যাগে ভরে ফেলে। সারাটা রাস্তা আনমনা হয়ে রঞ্জনের কথাই ভেবেছিল রোশনি। ওর টুকরো টুকরো কথা, নির্নিমেষ চাউনি, ওর হাসি— সব। বারবার মনে পড়ছিল, একদিন বিকালে সবাই মিলে নদীর পারে ঘুরতে যাওয়ার কথা। রঞ্জন সেদিন একটিবার ওর কাঁধে হাত দিয়েছিল। সেই স্পর্শে চমকে উঠেছিল রোশনি। বাড়ি ফিরে রঞ্জনের চিঠিটা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলে। ও বুঝতে পারে, রঞ্জনকে ভালোবেসে ফেলেছে।

প্রথম চিঠিতেই বিয়ে করার কথা লিখেছিল রঞ্জন। আরও লিখেছিল, ওরা ইন্ডিয়ায় চলে যাবে। বাংলাদেশে প্রতিভার কেউ কদর করে না। রঞ্জন তাই কলকাতায় পাকাপাকি থাকার কথা ভাবছে। ওখানে রোজগারের প্রচুর সুযোগ। গিটার-বাজিয়ে হিসেবে কলকাতায় ওর খুব নামডাক হয়েছে। একটা নাইট ক্লাবে ও চাকরি নিয়েছে। রোশনিকে দেখার পর থেকেই নাকি রঞ্জন ঠিক করেছে, রোশনি গাইবে, আর ও বাজাবে। ওরা দু'জন গানের ট্রুপ নিয়ে বিদেশে যাবে। দু'জনে মিলে প্রচুর টাকা কামাবে। সেই টাকায় কলকাতায় থাকার মতো একটা বাসা কিনবে। দু'জনে মিলে একটা সুখের নীড় গড়ে তুলবে। রঞ্জন লিখেছিল, সারা জীবন রোশনিকে ও সুখে রাখার চেষ্টা করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিটা পড়ে রোশনির মন ভরে গিয়েছিল। রঞ্জনকে স্বপ্নের রাজপুত্তুর বলে মনে হয়েছিল ওর। চিঠিতে একটা ফোন নাম্বার লেখা ছিল। দিন কয়েক মনস্থির করতেই লেগে যায় ওর, একটা ফোন করবে কী না। রঞ্জন যা ব্যস্ত, কথা বলার সুযোগ পাবে কি? শেষ পর্যন্ত একদিন ফোনটা ও করেই ফেলে। ও প্রান্তে রিসিভারটা তুলেই কে যেন রাগি রাগি গলায় বলতে শুরু করে, 'তোমাকে বলেছি না আমায় ডিস্টার্ব করবে না?' কথাগুলো বলেই লোকটা লাইন কেটে দেয়। রোশনি খুব ঘাবড়ে গেছিল। ও প্রান্তে কি রঞ্জন? সেটা কী করে হয়? যে মানুষটা প্রেম নিবেদন করে অত সুন্দর একটা চিঠি লিখেছে, সে কি করে ওকে ফোনে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? নিশ্চয়ই লোকটা রঞ্জন নয়, অন্য কেউ। কয়েকটা দিন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচলে ও দুলতে থাকে।

বাড়িতে তখন এমন কেউ নেই, রোশনি যার সঙ্গে রঞ্জন প্রসঙ্গে কথা বলতে পারে। বাবা তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, বাড়িতে থাকেন না বললেই চলে। মা বেঁচে থাকলে হয়তো রঞ্জনের কথা ও বলতে পারত। কিন্তু তিনিও এক বছর আগে মারা গেছেন। ওঁরা দু'জন অবশ্য রোশনির আসল বাবা-মা নন। রোশনি আসলে রাঙামাটির এক অনাথাশ্রমের মেয়ে। ওর যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন চট্টগ্রামের এই বাড়িতে ওকে নিয়ে আসেন আবীর চৌধুরি। কী একটা লেখার কাজে বেশ কিছুদিন তিনি তখন রাঙামাটিতে ছিলেন। নিঃসন্তান ছিলেন বলে, রোশনিকে উনি নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছেন। বাবা বলে ডাকতে শিখিয়েছেন। লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রোশনি কোনও আগ্রহ দেখায়নি। বই পড়ার থেকে ওর অনেক বেশি ভালো লাগত গান।

ঘলঘলিয়া থেকে চলে আসার মাসখানেক পর, হঠাৎই একদিন ফোন এল রঞ্জনের।

বাড়িতে তখন বাবা ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছেন। পরে নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, কার ফোন। ভয়ে রোশনির হাত পা তখন কাঁপতে শুরু করেছিল। রঞ্জন ফোন করার আর সময় পেল না। দুপুর বেলায় ও যখন একা থাকে, তখন ফোনটা করতে পারত। তা হলে ও অনেকক্ষণ কথা বলতে পারত। বাবার দিকে লক্ষ রাখতে রাখতে রোশনি খুব মৃদুস্বরে বলেছিল, 'হ্যালো'। ও তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না রঞ্জন ওকে ফোন করেছে। প্রথমেই রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, 'আমায় ফোন করলে না যে?' (চ)

কী বলবে রোশনি, সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। ও তখন চুপ করে ছিল। রঞ্জনের চিঠিটা ও এত বার, এত পড়েছে, প্রতিটি লাইন ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। উত্তরটা তো ওর বুকের ভেতরে কলবল করছে। বলতে গেলেই গলগল করে অনেক কথা বেরিয়ে আসবে।

'আমার চিঠি পড়েছ? নাকি পড়ার আগেই ছিঁড়ে ফেলেছ?' (চ)

কাঁপা কাঁপা গলায় রোশনি বলেছিল, 'পড়েছি, আপনি আমার ফোন নাম্বারটা পেলেন কোথায়?' (চ)

'কেন, দীনেশের কাছ থেকে। আমি তো এখন ঘলঘলিয়ায়।' (চ)

'আপনি দুপুরবেলায় ফোন করবেন।' (চ) বলেই রোশনি রিসিভারটা রেখে দিয়েছিল।

এর পর মাঝে মাঝেই রঞ্জনের ফোন আসত। রোশনি আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এল। দুপুর হলেই রঞ্জনের ফোনের জন্য ও ছটফট করত। রঞ্জন খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুখের সাগরে ভাসত রোশনি। একটা সময় ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, কলকাতায় গেলে ও খুব বড় গাইয়ে হতে পারবে। রঞ্জনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ওর দেখা হয় মাসছয়েক পরে, ঘলঘলিয়ায় মাসির বাড়িতে। দীনেশের বিয়ে উপলক্ষ্যে। সে বার রোশনির জন্য কলকাতা থেকে গানের প্রচুর ক্যাসেট আর অ্যালবাম এনে দিয়েছিল রঞ্জন। হিন্দি আর বাংলা গানের। বলেছিল, 'এই গানগুলো ভালো করে শেখবার চেষ্টা করবে। কলকাতায় টিভি চ্যানেলে গানের কম্পিটিশন হয়। সেখানে তোমাকে গান গাইতে হবে। আমার বিশ্বাস, সেখানে গাইলে তুমি খুব নাম করবে।'

ঘলঘলিয়াতেই একদিন সন্ধেবেলায় পুকুর ঘাটে ও আর রঞ্জন যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে, তখন অমলার চোখে পড়ে যায়। অমলা কিন্তু ওকে সেদিন উৎসাহ দেয়নি। বরং বলেছিল, 'রঞ্জনদা বয়সে তোর থেকে অনেক বড়। ওর সঙ্গে জীবনটা তুই জড়াস না। যাকে ভালো করে জানিস না, চিনিস না, তাকে বিয়ে করার কথা ভাবলে তুই কিন্তু পস্তাবি।' কথাটা তখন রোশনির ভালো লাগেনি। কিন্তু পরে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, রঞ্জন সম্পর্কে সত্যিই ও খুব কম জানে। বাড়ির লোকজনদের নিয়ে কোনও প্রশ্ন করলে, রঞ্জন এড়িয়ে যায়। তখন মনে হত বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে হয়তো ওর সদ্ভাব নেই। সেই কারণেই বোধহয়, রঞ্জন তাদের কথা জানতে দিতে চায় না।

দিনগুলো তখন খুব সুন্দর কাটছিল রোশনির। কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন হল, ঢাকা থেকে

আলতাপিসি চট্টগ্রামে থাকতে আসার পর। জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে রোশনির। ও যে আবীর চৌধুরির পালিত মেয়ে, সেটা বারবার স্মরণ করিয়ে দিত আলতাপিসি। বলত, অনেক ভোগ করেছিস, আর আশা করিস না। রঞ্জনের ফোন এলে ধরতে দিত না। খুব দুর্ব্যবহার করত। চাকমা পরিবারে জন্ম বলে, ওকে গালাগাল দিত। একদিন গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছিল। বাবা বাড়িতে থাকলে, অবশ্য আলতাপিসি চুপচাপ থাকত। কিন্তু বাবা বাড়িতে থাকত খুব কম সময়। একটা সময় রোশনির মনে হল, চট্টগ্রামের বাড়িতে ও অনাহুত। সত্যিই তো, এ বাড়ির সঙ্গে তো ওর রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই।

এ বার মহালয়ার দিন দুপুর বেলায় আলতাপিসি যখন মন্দিরে গেছে, সেই সময় হঠাৎ ফোন আসে রঞ্জনের। মনের ভেতর অনেক দুঃখ চেপে রেখেছিল। ফোনে কথা বলতে বলতে রোশনি কেঁদে ফেলে। তখনই ও বলে, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।' (চ)

রঞ্জন এক কথায় রাজি হয়ে যায়। বলে, 'ভালোই হল, তুমি চলে এসো। আর মাস দুয়েক পর টিভিতে গানের কম্পিটিশন শুরু হচ্ছে। তুমি সেখানে গাইবে। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি। বর্ডারে আমার লোকজন জানাশোনা আছে। পাশপোর্ট ভিসা ছাড়াই ওরা তোমাকে এ পারে দিয়ে যাবে।'

ও-ই পরামর্শ দেয়, দুর্গাপুজোর ভাসানের দিন বর্ডার বলে কিছু থাকে না। বাংলাদেশের নৌকো ঠাকুর নিয়ে এ পারে চলে আসে। ইন্ডিয়ার নৌকো ও পারে চলে যায়। ওই রকম একটা নৌকো করে রোশনি যেন এ পারে টাকিতে চলে আসে। রঞ্জন বলেছিল, 'আমি খেয়াঘাটে তোমার জন্য ওয়েট করব। তার পর তোমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাব।' (চ)

চলে আসার কথাটা রোশনি একমাত্র অমলাকেই জানিয়েছিল। সেই সঙ্গে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিল, কাউকে যেন ও কিছু না বলে। রোশনি বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে ও মাঝে মাঝে ফোন করবে। কিন্তু টাকিতে রঞ্জনকে দেখতে না পেয়ে ও ঘাবড়ে যায়। ওই অবস্থায় অমলাকে ফোন করা ঠিক হবে কিনা, সেটা রোশনি বুঝতে পারছিল না। ফোন করলে অমলা ওকেই দুষত, 'তোকে বলেছিলাম না?' রঞ্জন সম্পর্কে ওর ধারণা আরও খারাপ হয়ে যেত। তবুও, ঘলঘলিয়ার অবস্থা জানার জন্য, সায়নদের বাড়ি থেকে রোশনি একবার অমলাকে ফোন করেছিল। কিন্তু অন্য প্রান্তে মাসির গলা শুনে দ্রুত ও নামিয়ে রাখে।

... পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে রোশনির মনটা অন্য দিকে চলে গেছিল। চটকা ভাঙল সায়নের কথায়, 'রোশনি, নামো, আমরা বাস স্ট্যান্ডে এসে গেছি।'

এ কী? ওরা বাসে যাবে নাকি? ভ্যান রিকশা থেকে চট করে নামার সময় রোশনি টের পেল, পায়ে ঝিঁঝি লেগেছে। সে কথা বলায়, কী বুঝল সায়ন, কে জানে। ওকে ধরে ধরে বাস স্ট্যান্ডে নিয়ে এল। বাস গুমটিতে খুব একটা লোকজন নেই। তবু রোশনির বুকের ভেতরটা ধকধক করতে লাগল, এদের মধ্যে পুলিশের কেউ থাকলেই মুশকিল। ও

এদিক ওদিক তাকাল। এমন একটা আড়াল খুঁজতে লাগল, যেখানে গিয়ে বোরখাটা পরে নিতে পারে। বোরখাটা পরে নেওয়া দরকার। বোরখা পরে এক বার বাসে উঠে গেলে, তখন আর কেউ ওকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস পাবে না। হঠাৎই গুমটির পিছনে পুরোনো একটা শিবমন্দির ওর চোখে পড়ল। মুহূর্তে মনস্থির করে, কিট ব্যাগটা সায়নের হাত থেকে নিয়ে, ও শিবমন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। সায়ন অবাক হয়ে ওর দিকে তখন তাকিয়ে।

pathagar.net

মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনবে বলে করুণাময়ীর মোড়ে বাস থেকে নেমেছিল সায়ন। ফিরে এসে দেখল, দু'জন পুলিশ রোশনির সামনে দাঁড়িয়ে। কী যেন জিজ্ঞেস করছে। বেলা প্রায় একটা। এই সময় ধর্মতলাগামী বাসে তেমন ভিড় থাকে না। দূর থেকেই সায়ন দেখতে পেল, ভয়ে রোশনি প্রায় সিঁটিয়ে গেছে। বোরখার মুখের ঢাকনাটা ওপর দিকে তোলা। ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। ও যদি কথা বলে ফেলে তা হলে মুশকিল। তার আগেই রোশনির সামনে গিয়ে, জলের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে সায়ন বলল, 'কী হয়েছে লালি, তুমি কাঁদছ কেন?' তার পরই পাশ ফিরে পুলিশটাকে বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো? আমার বিবিকে বিরক্ত করছেন কেন?'

'আপনার ওয়াইফ?' প্রশ্নটা করার সময় পুলিশ একটু ব্যাকফুটে। 'কোত্থেকে আসছেন?'

'বসিরহাট থেকে।'

'আপনার নাম?'

'মাসুদ আহমেদ রুমি। এই আমার বিবি নাজমা খাতুন লালি।' কথাগুলো বলতে বলতেই রোশনির পাশে গিয়ে ও বসল। ওর বোরখার ঢাকনাটা নামিয়ে দিল।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?'

'কলকাতায়। ডাক্তার দেখাতে। গলার ডাক্তার। বউয়ের গলায় ঘা হয়েছে। কথা বলতে পারে না। সদর হাসপাতালের ডাক্তার জবাব দিয়েছে। কলকাতায় বড় ডাক্তার দেখাতে হবে।'

এই সময় রোশনি আরও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দেখে মনে মনে তারিফ করল সায়ন। এক্সেলেন্ট। মেয়েটার সত্যি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। সকালে তাপস তা হলে ঠিকই বলেছিল। পুলিশ পাগলা হয়ে গেছে রোশনির জন্য। ঠিকই বলেছিল। ওরা হাড়োয়ায় একবার চেক করেছে। ভাগ্যিস, রোশনি বোরখাটা পরে এসেছিল। না হলে হয়তো ও ধরা পড়ে যেত। পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই রোশনির ছবি আছে। স্বামীর চরিত্রটা আরও বিশ্বাসযোগ্য করার

জন্য, একহাতে রোশনির কাঁধ জড়িয়ে নিজের দিকে টেনে আনল সায়ন। তার পর পুলিশকে শুনিয়েই বলল, 'তুমি ভালো হয়ে যাবে। কেঁদো না।'

পুলিশ দুটো নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল। বাসের অন্য প্যাসেঞ্জাররা এ দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। চাপ দাড়িওয়ালা একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে? কারে খোঁজেন?'

পুলিশটা বলল, 'বাংলাদেশের মেয়ে। মিসিং না কিডন্যাপিং কেস এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটাকে ধরে দিতে পারলে এক লাখ টাকা পুরস্কার।'

লোকটি বলল, 'ক'ন কি মিঞা? এক লাখ? তাইলে নির্ঘাত কিডন্যাপিং কেস। দ্যাখেন গিয়া, কোন র‍্যাকেটে পড়সে।'

বাস স্টার্ট দিতেই পুলিশ দুটো নেমে গেল। সায়ন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রোশনির জন্য কত ভাবেই না ওকে মাথা খাটাতে হচ্ছে। এই মজার খেলাটা এখনও পর্যন্ত ওর মন্দ লাগছে না। আড়চোখে তাকিয়ে ও দেখল, জানলার দিকে মাথা হেলিয়ে রোশনি চোখ বুজে আছে। বোরখার ঢাকনাটা ফের তুলে নিয়েছে। ওর মুখটা দেখে ভীষণ মায়া হল সায়নের। বেচারা, বাড়িঘর ছেড়ে কেন এ দেশে এসেছে? সন্দেহ নেই, মেয়েটা ভালো পরিবারের। যত্রতত্র দিন কাটানোর মেয়ে না। পালিয়ে আসার কারণটা নিশ্চয়ই ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। না হলে এত বড় ঝুঁকি ও নিত না। ও কি জানে, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কয়েকটা দিন ওকে উদ্ধার আশ্রমে কাটাতে হবে? সেটা যে কী বিশ্রী জায়গা, ও তা নিশ্চয়ই জানে না।

হাইওয়ে দিয়ে বাস কলকাতার দিকে এগোচ্ছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়ন দেখল, ধর্মতলা পৌঁছোতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। ডান পাশে থ্রি সিটারে চাপ দাড়িওয়ালা একটা লোক বেশ জমিয়ে বসেছে। বাংলাদেশের থেকে মেয়ে পাচারের নানা গল্প শোনাচ্ছে। এই রকম একটা যুবতী মেয়েকে ও নিজে কী ভাবে উদ্ধার করেছিল, তার বিবরণও দিচ্ছে। অন্য প্যাসেঞ্জাররা গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই যুবতী মেয়ের গল্প শুনছে। কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'মাইয়াডারে লইয়্যা শ্যাষে কী করলেন মিঞা?'

চাপ দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, 'কী আর করুম। ছাইড়্যা দিলে অন্যরা ছিড়াকুইট্টা খাইব। তাই আমার বাসায় রাইখ্যা দিলাম। অহন আমার কাছেই থাহে।'

কলকাতা থেকে বসিরহাট যাতায়াতের সময় বাসে এই ধরনের মাতব্বর লোক প্রচুর দেখেছে সায়ন। অনেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারিও করে। তাই পরস্পরের খুব চেনা। বাসে এদের মতো লোক থাকলে সময় কেটে যায়। মনটা জোর করে সরিয়ে এনে তিতাসের কথা সায়ন চিন্তা করতে লাগল। ও জানে, ওর কথা শুনে তিতাস বসিরহাটে ফিরবে, এমনটা কিন্তু হবে না। ছোটবেলা থেকে ও তিতাসকে দেখছে। ভয়ানক জেদি আর অহংকারী মেয়ে। অসংখ্য ঘটনা ওর চোখের সামনেই ঘটেছে। অরূপকাকা আর বিভাকাকিমা ওকে নিয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকত। মনে আছে, মা একবার বলেছিল, অনেক চিকিৎসা,

কবচ-মাদুলি, যজ্ঞের পর বিভাকাকিমা সন্তানের মা হয়েছিলেন। বিয়ের দশ বছর পর। তার পর ওদের আর কোনও সন্তান হয়নি। সেই কারণেই তিতাসের ওপর ওঁদের এত অপত্য স্নেহ।

তিতাসের জেদ দেখে ছোটবেলায় সায়নেরও প্রচণ্ড রাগ হত। তিতাস খুব হিংসে করত ওকে। একবার তো সায়ন রাগের মাথায় ঠাস করে এক চড় মেরেছিল। ওর নতুন ওয়াকম্যান ভেঙে ফেলার জন্য। সেদিন একেবারে গুটিয়ে গিয়েছিল তিতাস। রাতের দিকে ওর ধুম জ্বর। শুনে মা বকাবকি করেছিল, 'কী দরকার ছিল মেয়েটার গায়ে হাত তোলার। আমি তোকে একটা নতুন কিনে দিতাম।' ওই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন তিতাস আর ওর সামনে আসেনি। পরে অরূপকাকু একদিন বলেছিল, 'তুমি ঠিক করেছ সানু। ওর এই ট্রিটমেন্টটাই দরকার। আমরা মোটেই তোমার উপর রাগ করিনি।' দু'চারদিন পর অরূপকাকু নতুন একটা ওয়াকম্যান ওকে উপহার দিয়েছিল।

স্কুলে পড়ার সময়, মনে আছে, একবার সবাই মিলে ওরা গুরুজির আশ্রমে গেছিল। তখন কতই বা বয়স তিতাসের? তেরো কী চোদ্দো। সেদিন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। গুরুজির বহু ভক্ত আশ্রমে হাজির। সারাদিন নামকীর্তন চলছে। সেদিন হঠাৎ সবার সামনে গুরুজিকে যাচ্ছেতাইভাবে তিতাস অপমান করেছিল। অপরাধ, গুরুজি কেন ওর হাত দেখে বলেছেন, অহংবোধ ত্যাগ করতে। না করলে ও জীবনে কিছুই করতে পারবে না। সায়নের মনে আছে, গুরুজিকে প্রথমে তিতাস প্রণাম করতে চায়নি। তার পর বলেছিল, 'আপনি আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলেছেন। আপনি ভণ্ড। আপনার ওপর আমার কোনও ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। আপনাকে আমি দেখিয়ে দেব, জীবনে কিছু করতে পারি কী না?'

সেদিন তিতাসের ওপর মা এমন রেগে গিয়েছিল যে, বলেছিল, 'আমার পেটে যদি এমন মেয়ে জন্মাত, তা হলে পেটে পা দিয়ে তাকে মেরে ফেলতাম।' বাড়ি ফেরার সময় সারাক্ষণ সেদিন অরূপকাকা সেদিন মুখ কালো করে গাড়িতে বসেছিল।

মা কোনওদিনই তিতাসকে পছন্দ করত না। তবুও ওর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। তার একটা কারণ মা জানে, তিতাসকে ও মনে মনে পছন্দ করে। আরেকটা কারণও আছে। মা আপত্তি করেনি বিভাকাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে। তিতাসের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বিভাকাকিমা নাকি একবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। অত সুন্দর দেখতে ছিল কাকিমা। টেনশনে সুগার ধরল, প্রেসারের রোগী হয়ে গেল। এখন চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। বিভাকাকিমাকে একদিন সায়ন বলতেও শুনেছে, 'অন্য কোনও বাড়িতে গেলে মেয়েটার কী হাল হবে, তুই তো বুঝতেই পারছিস আভা। ও মেয়েকে শায়েস্তা করতে পারে একমাত্র সানু। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে না।'

বাস থেমেছে কোনও এক জায়গায়। প্যাসেঞ্জার তুলছে। চোখ খুলে বাইরে তাকিয়ে সায়ন দেখল, মধ্যমগ্রামের মোড়। এখানেও পুলিশ মাঝে মধ্যে চেকিং করে। ফের কোনও

উৎপাত হলে মুশকিল। পুলিশ যেন হাজির না হয়, ভেবে ও দরজার দিকে তাকাল। আর তাকিয়েই চমকে উঠল। মাই গড, বরদামেসো আর কমলামাসি! বাসে উঠেছে। আরে ওরা কোত্থেকে? উঠবি তো ওঠ, এসে বসল, ওর সামনের সিটটাতেই। আড়চোখে রোশনিকে একবার দেখে নিল সায়ন। জানলার দিকে সরে গেছে। পিছন দিকের সিটটা ফাঁকা। সেখানে উঠে গেলে হয়। কমলামাসি যদি জানতে পারে, রোশনিকে নিয়ে ও কলকাতায় যাচ্ছে, তা হলে মায়ের কাছে খবর পৌঁছোতে এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। এ কথা ভেবে, সায়ন পিছনের দিকের সিটে বসতে যাবে, তার আগেই কমলামাসির চোখে পড়ে গেল।

'কী রে সানু, তুই? লেক গার্ডেন্স যাচ্ছিস বুঝি?'

সায়ন বলল, 'হ্যাঁ, তুমি জানলে কি করে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে মাসি বলল, 'কাল রাতে তোর মা ফোন করে বলল যে। তোর মা জানতে চাইছিল তুই আমাদের বাড়িতে বিজয়া করতে গেছিলি কী না। আমি বললাম, ছোঁড়ার তো পাত্তাই নেই। এখন বড় হয়ে গেছিস তো। কমলামাসির কথা তাই মনে নেই। আগে তো ভাসান দিয়েই আমার বাড়িতে ছুটতি। নাড়ু আর সিদ্ধির শরবত খাওয়ার জন্য হাঁকপাক করতি। মনে আছে?'

'সরি মাসি। কাল পেটের অবস্থা ভালো ছিল না। ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ যাব।'

'বেচারা অনু, তোর জন্য সারাটা দিন বসে রইল। জানিস, ও কী যে ভালো রান্না করা শিখেছে, তোকে কী বলব। কাল রসগোল্লার মালাইকারি করেছিল তোকে খাওয়াবে বলে। তুই গেলি না।'

'অনু এখন কোথায় মাসি? বসিরহাটে না কলকাতায়?'

'আজ ভোরের ট্রেনে কলকাতায় গেছে। বললাম, লক্ষ্মীপুজো অবধি থেকে যা। শুনলই না। চাকরি বলে কথা। নাকি আজই জয়েন করতে হবে। হ্যাঁরে, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? রোজ ভাবি, অথচ জিজ্ঞেস করা হয় না। কাঞ্চন বলে তোর কোনও বন্ধু আছে? কী করে রে?'

'আমার সঙ্গেই পড়ত। আমার সঙ্গেই থাকে। ক্যাম্পাস ইনটারভিউতে চাকরি পেয়েছে দিল্লির নয়ডার এক কোম্পানিতে। কেন মাসি?'

'ছেলেটার স্বভাব চরিত্তির কেমন?' প্রশ্নটা করেই কমলামাসি চোখাচোখি করল বরদামেসোর সঙ্গে।

সায়ন বলল, 'ভালো। আসলে ও বাংলাদেশের ছেলে। কিন্তু এখানেই থেকে যাবে। কাঞ্চনকে তুমি দেখেছ মাসি। একবার গরমের ছুটিতে বসিরহাটে গেছিল। খুব ফরসা, লম্বা, রোগা। কান দুটো বড় বড়। মনে আছে?'

'কী জানি, দেখেছি বোধহয়। অনুর সঙ্গে ওর কদ্দিনের আলাপ রে?'

'তা বছর খানেক হবে। অনু কলকাতায় চাকরি পাওয়ার পর থেকেই মনে হয়। অনু

তো প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে। আড্ডা মারতে। কিন্তু কাঞ্চনকে নিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করছ কেন মাসি?'

'তুই বলেই বলছি। এ বার একটা জিনিস লক্ষ করলাম, অনু সারাটা দিন ফোনে ওই ছেলেটার সঙ্গে গুজগুজ করে যাচ্ছে। হ্যাঁরে, আমাদের না জানিয়ে ওরা বিয়ে-টিয়ে করে ফেলবে না তো? তা হলে কিন্তু আত্মীয়স্বজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

শুনে সায়ন হেসে ফেলল। তার পর বলল, 'উফ মাসি, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। মা, তুমি, আর বিভাকাকিমা সব এক ক্যাটাগরির। তিলকে তাল করতে ভালোবাসো। কাঞ্চনের সঙ্গে অনুর যদি কোনও সম্পর্ক থাকত, তা হলে সব থেকে আগে আমি টের পেতাম। ঠিক আছে, কালীপুজোর দিন কাঞ্চন ফিরে আসবে। তখন আমি ওকে জিজ্ঞেস করব। যাক গে, তোমরা কোথায় গেছিলে বলো।'

'বিজয়া করতে। আমার এক নন্দাই থাকেন মধ্যমগ্রামে। তাঁর বাড়িতে গেসলাম। এখন যাব গল্ফগ্রিনে। ভাইয়ের বাড়িতে। তুই তো জানিস, অনু ওর বাড়িতেই থাকে। ভালোই হল, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমরা ওই দিকেই যাচ্ছি। চল, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

ভালো বিপদ! আড়চোখে রোশনির দিকে তাকিয়ে সায়ন বোঝার চেষ্টা করল, কথাগুলো ওর কানে গেছে কী না। কানে গেলেও হয়তো বুঝবে না। রোশনি জানলার দিকে তাকিয়ে। এমন ভাব করে আছে, যেন সায়নকে চেনে না। দেখে মনে মনে খুশি হল সায়ন। কমলামাসিদের এড়ানোর জন্য ও বলল, 'মাসি, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি কিন্তু এখন লেক গার্ডেন্সে যাব না। আমাকে একবার সল্ট লেকে যেতে হবে। কলেজে একটা সার্টিফিকেট পড়ে আছে। সেটা আজই কালেক্ট করতে হবে।'

এতক্ষণ বরদামেসো কোনও কথা বলেনি। এ বার বলল, 'আমরা উলটোডাঙায় নামব রে। পাতালরেল ধরার জন্য। শোভাবাজার থেকে পাতালে টালিগঞ্জ অবধি গিয়ে, তার পর ট্যাক্সি ধরে নেব।'

যাক্, বাঁচা গেল। মেসোরা উলটোডাঙায় নেমে গেলে নিশ্চিত। রোশনিকে সঙ্গে নিয়ে শেয়ালদায় নামতে পারবে সায়ন। মনে মনে ও ছক কষে নিল। রোশনিকে নিয়ে ও চলে যাবে সাউথ সেকশনে। তার পর বজবজ লোকাল ধরে সোজা লেক গার্ডেন্স। পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা প্রায় আড়াইটা হয়ে যাবে। ওই সময় ফ্ল্যাটবাড়ি নিঝুম হয়ে থাকে। তার মানে, কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। স্টেশন থেকে রিকশা করে ও বাড়ি যাবে। তার পর রোশনিকে নিয়ে টুক করে ঢুকে যাবে ফ্ল্যাটে। ভাগ্যিস, ওদের ফ্ল্যাটটা এক তলায়। ছক কষার সময় সায়ন মনে মনে প্রার্থনা করল, ওরা যেন তনিমা বউদির চোখে না পড়ে। তনিমা বউদিরা থাকেন ওদের ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটে। ভদ্রমহিলা অ্যাপার্টমেন্টের গেজেট। রোশনিকে যদি উনি দেখে ফেলেন, তা হলেই সর্বনাশ। অ্যাপার্টমেন্টের বাকি সবাই বিকেলের মধ্যে তো জানবেই, বসিরহাটে মা-ও জেনে যাবে। গায়ে পড়া এই

ভদ্রমহিলাই কলকাতায় মায়ের এজেন্ট।

'হ্যাঁ রে, তোর মা তো তোর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তুই জানিস?'

কমলামাসির প্রশ্নটা শুনে প্রমাদ গুনল সায়ন। আশপাশের প্যাসেঞ্জাররা ওদের কথা গিলছে। ডান পাশে তাকিয়ে সায়ন দেখল। চাপ দাড়িওয়ালা লোকটা বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে। করুণাময়ীর মোড়ে এই লোকটাই পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছিল, ওরা কাকে খুঁজছে। তার পর ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে অলোচনা শুরু করেছিল, ওর এক আত্মীয় সামান্য এই গলা ব্যথা প্রথম দিকে পাত্তা দেয়নি। তার পরে সেটা ক্যানসারে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই লোকটাই কমলামাসির মুখে ওর বিয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ইস, এই বোধহয় ও ধরা পড়ে গেল। কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে দিল একজন হকার। দাড়িওয়ালা লোকটাকে আড়াল করে হকারটা বলতে শুরু করল, আমাশা কয়প্রকার হয়। এটা এমন একটা রোগ যা লুকিয়ে রেখে কোনও লাভ নেই। ওর কাছে অব্যর্থ দাওয়াই আছে। খেলে ক্রনিক আমাশাও সেরে যাবে।

হকারের মুখে আমাশার বিবরণ শুনে কমলামাসি মিটিমিটি হাসছে। চাপ দাড়িওয়ালা লোকটা ফিসফিস করে কী যেন বলছে পাশে বসা একজন প্যাসেঞ্জারকে। আড়চোখে সায়ন দেখল, বাস এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এসে গেছে। আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই উলটোডাঙায় পৌঁছে যাবে। সময় কাটানোর জন্য কমলামাসিকে ও জিজ্ঞেস করল, 'অনুর বিয়ের কথা কিছু ভাবছ নাকি মাসি?'

শুনে বরদামেসো বলল, 'দিতে তো চাই। ভালো একটা ছেলে দ্যাখ না ওর জন্য। কলকাতায় হলে ভালো হয়। তোর এত জানাশোনা।'

'কী ধরনের ছেলের কথা ভাবছ তোমরা?'

'ভালো চাকরি-বাকরি করে এমন ছেলে। অনু আবার বিজনেসম্যান ছেলেকে বিয়ে করবে না। জানিস, হাসনাবাদে একটা ডাক্তার পাত্র পেয়েছিলাম। কিন্তু অনু চাকরি ছাড়তে চাইছে না। মেয়েছেলের এত বামনাকী হলে চলে? তুই একটু ওকে বোঝাবি?'

'অনু নিজে যদি কাউকে পছন্দ করে, তা হলে তোমরা রাজি?'

কমলামাসি বলল, 'যদি ভালো ছেলে হয়, তা হলে আপত্তির কী আছে? আমি এই ডিসেম্বরের মধ্যেই ওকে পার করে দিতে চাই। অবিশ্যি তোর মা তোর বিয়েটা যদি ওই সময় দেয়, তা হলে অনুর বিয়ে আমাকে আরও তিন চার মাস পেছোতে হবে। তোর বিয়েতে নাকি আভা খুব ধুমধাম করবে।'

সায়ন বুঝতে পারছে, করুণাময়ী মোড়ে পুলিশকে যে ও মিথ্যে কথা বলেছে, সেটা অন্য প্যাসেঞ্জাররা বুঝতে পেরে গেছে। ও ধরা পড়ে গেছে। হঠাৎই রোশনি উঠে দাঁড়াল। তারপর কিট ব্যাগটা ওপরের বাঙ্ক থেকে নামিয়ে ও সামনের দিকে একেবারে ড্রাইভারের কাছাকাছি একটা সিটে গিয়ে বসল। সায়ন বুঝতে পারল না, ও উঠে গেল কেন?

লেক গার্ডেন্সে ক্লাসিক তন্দুর বলে একটা রেস্তোরাঁ আছে। ফোন করে মাঝে মধ্যে সেখান থেকে খাবার আনিয়ে নেয় সায়ন। বিশেষ করে যে দিন রুনুমাসি কাজে আসে না। আজ বেলা আড়াইটের সময় লেক গার্ডেন্সে পৌঁছে প্রথমে সায়ন ফোন করেছিল ক্লাসিক তন্দুরে। খিদেয় ওর পেট চোঁচোঁ করছিল তখন। ও হিসেব করে নিয়েছিল, খাবার আসতে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। তার মধ্যে স্নান করে ও তৈরি হয়ে নেবে টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ায় যাওয়ার জন্য। আজই তিতাসের খবর নিতে হবে। রোশনিকে সামলাতে গিয়ে ও ভুলেই গেছিল, মা কী কারণে ওকে কলকাতায় পাঠিয়েছে।

বাথরুমে ঢোকার সময় সায়ন দেখল, রোশনি ওর শোওয়ার ঘরে সোফায় বসে নিশ্চিন্তে টিভি দেখছে। আশ্চর্য, ওর আচার ব্যবহারে কোনও হেলদোল নেই। নতুন একটা জায়গায় এসেছে, অথচ ওর মধ্যে কোনও আড়ষ্টতা নেই। যেন কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছে। মেয়েটা যে অসম্ভব বুদ্ধিমতী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বসিরহাট থেকে আসার সময় তার যথেষ্ট প্রমাণও সায়ন পেয়েছে। রোশনি যখন বাসে ওর পাশ থেকে উঠে যায়, তখন সায়ন ভেবেছিল, বোধহয় ওর সংস্পর্শ ত্যাগ করল। এ বার নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু শেয়ালদায় বাস থেকে নামার পর ফের রোশনিকে পিছু পিছু আসতে দেখে ও চমকে ওঠে। পরে সায়ন বুঝতে পারে, ইচ্ছে করেই ও পাশ থেকে উঠে গেছিল। যাতে কমলামাসিরা কোনওভাবে বুঝতে না পারে, ওর সঙ্গে রোশনি আছে।

স্নান করতে করতে সায়ন দ্রুত ভাবতে লাগল, রোশনি সম্পর্কে ওকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এ ভাবে লুকোচুরি খেলতে ও পারবে না। বসিরহাটে ছিল কুন্তীমাসি। এখানেও একজন আছে, সে হল রুনুমাসি। যাকে মা ঠিক করে দিয়ে গেছে। রোজ সকালে এসে রান্না করে। রুনুমাসি এ বাড়িতে তনিমাবউদির ফ্ল্যাটেও কাজ করে। ফলে ওদের ঘরে কী হচ্ছে, সেই সব খবর তনিমাবউদি পেয়ে যায়। আর গুরুত্ব বুঝে সে সব খবর

মায়ের কানে পৌঁছে দেয়। তাই রোশনিকে এই ফ্ল্যাটে বেশিদিন রাখা যাবে না। কাল সকালে তনিমাবউদির ফ্ল্যাটে কাজ করতে এসেই রুনুমাসি খবর পেয়ে যাবে, ও এসে গেছে। তার পরই নীচে নেমে রুনুমাসি ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকবে। দেড় হাজার স্কোয়ারফুটের এই ফ্ল্যাটে সায়ন কোথায় তখন লুকোবে রোশনিকে? কী সমস্যা রে বাবা? মেয়েটাকে সায়ন গিলতেও পারছে না, আবার ফেলতেও পারছে না। ওর মুখের দিকে তাকালেই কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বাথরুমের ভেতর থেকেই ডোর বেলের শব্দ শুনতে পেল সায়ন। গা মুছতে মুছতেই ও বেরিয়ে এল। ক্লাসিক তন্দুরের খাবার এসে গেছে। পরপর তিনবার বেল। নিশ্চয় বুচান। চেনা ছেলে, প্রায়ই খাবার দিতে আসে। কাঞ্চন ওকে খুব পছন্দ করে। ওর সামনে রোশনি দরজা খুলে দিলেই মুশকিল। পরে কোনও সময় বুচান কাঞ্চনকে বলে দেবে। নিজে দরজা খোলার জন্য তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে সায়ন পিছলে গেল। ভাগ্য ভালো, ডান দিকের দেওয়ালটা ধরে ফেলেছিল। না হলে ভালো চোট পেত। সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি। সায়ন দেখল, রোশনি হাসছে। বাঃ, হাসলে ওকে তো বেশ সুন্দর দেখায়।

দরজা খুলতেই প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বুচান বলল, 'মোট দুশো তিরিশ টাকা সায়নদা। বিরিয়ানির দাম দশ টাকা বেড়ে গেছে ষষ্ঠীর দিন থেকে। সত্তর টাকা হয়ে গেছে।'

'দু প্যাকেট বিরিয়ানির দাম তা হলে দুশো তিরিশ টাকা কী করে রে বুচান?'

'বিরিয়ানির দাম একশো তিরিশ। আর একশো টাকা আমার বোনাস। সারা বছর তোমাদের খাবার এনে দিই। কাঞ্চনদা বলেছিল, পুজোর সময় আমায় বোনাস দেবে। এখন দাও।' বলতে বলতে বুচান ঘরের ভেতর ঢুকে এল।

ছেলেটার এই এক বাজে স্বভাব। যখনতখন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। লাই দিয়ে কাঞ্চনটা ওকে মাথায় তুলেছে। একটু কড়া গলাতেই সায়ন বলল, 'কাঞ্চনদা এখন নেই। ও এলে টাকা ওর কাছ থেকে নিস। তুই এখন বাইরে গিয়ে দাঁড়া। বিরিয়ানির টাকা আমি এনে দিচ্ছি।'

'কাঞ্চনদা নেই? তা হলে দু প্যাকেট বিরিয়ানি আনালে কেন সায়নদা? একা খেতে পারবে? নাকি কোনও গেস্ট আছে। কই, কাউকে তো দেখছি না।'

'তোর এত জানার দরকার কী রে?'

'না এমনিই জিজ্ঞেস করছি।' বলেই এদিক ওদিক তাকাল বুচান, 'তোমাকে একটা কথা বলব সায়নদা?' পার্স থেকে টাকা বের করে সায়ন বলল, 'এই নে টাকা। আবার কী কথা?'

'তোমাদের ঠিক ওপরের ঘরে যে বউদিটা থাকে, খুব খচ্চর টাইপের।'

'কী বলছিস বুচান? তোকে কিন্তু মারব, এই ধরনের কথা বললে।'

'সত্যি বলছি। একটু আগে আমি যখন তোমাদের এখানে এলাম, তখন দেখি তোমাদের দরজার সামনে বউদিটা ঘুরঘুর করছে। আমাকে কী বলল, জানো? বলল, এই ছোঁড়া,

দেখে এসে বল তো, ঘরের ভেতর বোরখা পরা কেউ আছে কী না? চুপিচুপি বলে যাবি কিন্তু। না হলে এ বাড়িতে তোকে আর কোনওদিন ঢুকতে দেব না।'

ওহ, তার মানে, ঢোকার সময় ওপর থেকে রোশনিকে বউদি দেখে ফেলেছে। অন্য সময় হলে সায়ন একটু দমে যেত। কিন্তু বুচানের কথা শুনে একটু রাগই হল ওর। ওর ফ্ল্যাটে কে আসবে-যাবে, তাতে বউদির কী? গায়ে পড়া এই বউদিটাকে জব্দ করতে হবে। ভেবে ও পালটা প্রশ্ন করল, 'বেরিয়ে কী বলবি তুই?'

'কই কেউ নেই তো তোমাদের ঘরে।'

'শোন তুই বলবি, সায়নদার ঘরে একটা নতুন ছেলে এসেছে, যার কাছে ব্যাগভর্তি টাকা। এমনভাবে বলবি, যাতে বউদিটা ইন্টারেস্ট নেয়। কেমন?'

'যাঃ মিথ্যে কথা বলব কেন সায়নদা।'

'না বললে কিন্তু বোনাস-টোনাস কিস্যু পাবি না। যা, এখন পালা। রাতের বেলাতেও খাবার নিয়ে আসবি। ন'টা সাড়ে ন'টার সময়। মনে থাকবে? আমি কিন্তু আর ফোন করছি না।'

ঘাড় নেড়ে বুচান বেরিয়ে গেল।

...আধ ঘণ্টা পর, খাওয়া-দাওয়া সেরে সায়ন যখন ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে পৌঁছোল, তখন বেলা সাড়ে তিনটে। স্টুডিয়ো পাড়ায় ও কোনওদিন আসেনি। কাউকেই চেনে না। বসিরহাটে তাপস বলেছিল, তিতাস নাকি রোজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে আসছে। প্রসেনজিতের কাছে ওর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

অফিস ঘরে গিয়ে ও জানতে চাইল, প্রসেনজিতের আজ শুটিং আছে কী না? ওখানেই সায়ন বিস্তর প্রশ্নের মুখোমুখি হল। কেন? কী দরকার? কোত্থেকে এসেছেন? বুম্বাদা আসতে বলেছেন কী না? শুটিংয়ের সময় বুম্বাদা কারও সঙ্গে কথা বলেন না। ওঁর সেক্রেটারির সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে। সিনেমায় চান্স চাইলে পোর্টফোলিয়ো দিয়ে যান। বুম্বাদার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তর দিতে দিতে সায়ন ক্লান্ত হয়ে গেল। তবুও প্রসেনজিতের ধারে কাছে পৌঁছোতে পারল না।

স্টুডিয়োর এদিক সেদিক ও ঘোরাঘুরি করতে লাগল। যদি কোনওভাবে তিতাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু মিনিট পনেরো চেষ্টা করেও বুম্বাদা অথবা তিতাসের হদিস পেল না সায়ন। নানা জায়গায় শুটিং চলছে। বাংলা সিনেমায় দেখা কয়েকটা পরিচিত মুখও ও দেখতে পেল। গত চার বছর কলেজের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সায়ন প্রচুর সিনেমা দেখেছে। সুযোগ পেলেই কাঞ্চন টিকিট কেটে আনত। রাতের শো-তে দু'জনে সিনেমা হলে ঢুকে পড়ত। বাংলা ছবির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে সায়ন মোটামুটি চেনে। ও দেখল, একটা স্পট-এ ডিরেক্টর হরনাথ চক্রবর্তী পার্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে কোয়েল মল্লিককে। কাছেই চেয়ারে বসে রঞ্জিত মল্লিক। তাঁর মাথায় ছাতা ধরে আছে একটা ছেলে। ইস, এই সময় যদি মা সঙ্গে থাকত, তা হলে খুব খুশি হত। কেন না, মা রঞ্জিত মল্লিকের খুব ফ্যান।

সায়ন মন দিয়ে রঞ্জিত মল্লিককে লক্ষ করতে লাগল। পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি। খুব সুন্দর লাগছে ভদ্রলোককে। বাড়িতে গিয়ে মাকে গল্প করতে হবে।

'হাই হ্যান্ডসাম, তুমি বুম্বাদার খোঁজ করছিলে না?'

কথাটা শুনে পাশ ফিরে তাকাল সায়ন। ওরই বয়সি একটা মেয়ে। পরনে লাল শার্ট, নীল জিনস। আগে মনে হয়, খুব সুন্দরী ছিল। কিন্তু এখন চোখে ক্লান্তির ছাপ। মেয়েটাকে কি আগে কখনও দেখেছে? সায়ন মনে করতে পারল না। ও অবাক হয়েই বলল, 'হ্যাঁ, খুঁজছি। উনি কোথায় বলতে পারো?'

'পারি। কিন্তু তার বদলে তুমি আমায় কী দেবে বলো।' বলেই মেয়েটা হি হি করে হাসতে লাগল।

এইসব মেয়ের মনে কি কোনও দুঃখ থাকে না? কী সুন্দর হাসছে। দেখেই মন থেকে একটা ভার নেমে গেল সায়নের। ওর মন বলল, মেয়েটা ওকে সাহায্য করবে। তাই বলল, 'ক্যাডবেরি চকলেট।'

'মাই গড। তুমি জানলে কী করে, আমার সব থেকে প্রিয় হল চকোলেট?'

'থট রিডিং বলতে পারো।'

'তা হলে চলো আমার সঙ্গে। বুম্বাদা এখন দু'নম্বর ফ্লোরের সামনে আছে। একটু আগে আমি দেখেছি। 'তোমার জন্য জীবন দিতে পারি' বলে একটা ছবির শুটিং হচ্ছে। বুম্বাদা তার হিরো।'

'দু'নম্বর ফ্লোরটা কোথায়? অনেক দূর?'

'এই তো কাছেই। বাই দ্য বাই, আমি কস্তুরী। তুমি?'

'সায়ন। তুমি কি অভিনয় করো?'

'সুযোগ পাচ্ছি কই। প্রায় বছর দুয়েক হয়ে গেল, স্টুডিয়োপাড়ায় জুতোর সুকতলা খোয়াচ্ছি। এখনও অবধি ভালো কোনও পার্ট পাইনি। তুমি কদ্দিন?'

'মাত্র আধ ঘণ্টা আগে এসেছি।'

হাঁটতে হাঁটতে কস্তুরী বলল, 'ওহ, তাই এত চকচকে লাগছে। এ পাড়ায় গডফাদার না থাকলে কারও কিছু হয় না। এখানে ঘোরাঘুরি না করে, তুমি বরং বেঙ্কটেশ ফিল্মসের অফিসে যাও। তুমি খুব হ্যান্ডসাম। চান্স পেলেও পেয়ে যেতে পারো। শুনলাম, বেঙ্কটেশ একটা নতুন ছেলে খুঁজছে।'

'আমি কিন্তু এখানে অ্যাক্টর হতে আসিনি।'

'তা হলে বুম্বাদার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ কেন?'

'আসলে আমি একটা মেয়ের খোঁজ করতে এসেছি।'

শুনে কস্তুরী দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

খুব অল্প কথায় সায়ন সব গুছিয়ে বলল। সব শুনে কস্তুরী বলল, 'হ্যাঁ, এ রকম একটা মেয়ের কথা আমি মুন্নিদির মুখে কালই শুনেছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। খুব সুন্দর

দেখতে। কিন্তু বুম্বাদা নাকি খুব বকাবকি করেছে ওকে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা, এই যে তুমি মুন্নিদির কথা বললে, ইনি কে?'

'হিরোইনদের হেয়ারড্রেসার। আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার মনে হয়, তোমাদের ওই মেয়েটাকে খুব সম্ভবত এখন মেকআপ রুমে পাওয়া যাবে। চলো, আগে মেকআপ রুমে যাই। তার পর না হয় তুমি বুম্বাদার সঙ্গে দেখা করো।'

মিনিট দুয়েক হাঁটার পর মেকআপ রুমে যাওয়ার আর দরকার হল না ওদের। ডান দিকে একটা জায়গায় প্রসেনজিৎকে ঘিরে ছোট্ট ভিড়। শট টেকিং হচ্ছে। ওখানেই দূর থেকে তিতাসকে দেখতে পেল সায়ন। আর ওকে দেখেই চমকে উঠল ও। কী বিশ্রী পোশাক পরেছে তিতাস। বসিরহাটের কেউ ওকে এই পোশাকে দেখলে ছি ছি করবে। সায়নের ইচ্ছে হল, কাছে গিয়ে এখুনি ঠাস করে একটা চড় মারে তিতাসের গালে। যে রকম চড় ওকে মেরেছিল ওয়াকম্যান ভেঙে দেওয়ার দিন। পা চালিয়ে ও শুটিং স্পটের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু হাত টেনে আটকে দিয়ে কস্তুরী বলল, 'এখন ওদিকে যেয়ো না। বুম্বাদা অসন্তুষ্ট হবে। শট দেওয়ার সময় কোনও রকম ডিস্টার্বেন্স বুম্বাদা পছন্দ করে না। এমনকী অর্পিতাদি এলেও এখন কথা বলবে না। মানুষটা এতখানিই ডেডিকেটেড। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।'

সায়ন বলল, 'শট দেওয়া কখন শেষ হবে?'

'মিনিট পাঁচেক। তুমি বরং এই গাছতলায় দাঁড়াও। মেয়েটাকে আমি কায়দা করে তোমার কাছে নিয়ে আসছি।'

একটা অশ্বত্থগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল সায়ন। গাছটাকে ঘিরে লাল সিমেন্টের গোলাকার বেদি। ভালো স্বাস্থ্যের কয়েকটা ওরই বয়সি ছেলে বেদিতে বসে আছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কস্তুরীর দিকে খেয়াল রাখার ফাঁকেই সায়ন ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। এরা বোধহয় স্টান্টম্যান। একে-এক জাম্বোদার সঙ্গে এদের ঝামেলা হয়েছে। সে ব্যাপারেই নরমে-গরমে কথা হচ্ছে। একটু পরেই সায়ন বুঝতে পারল, জাম্বো হল ফাইট মাস্টার। বাংলা ছবির কোনও এক প্রোডিউসার একে হায়দ্রাবাদ থেকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু লোকটি শুধু তেলেগু ভাষায় কথা বলতে পারে। হিন্দি বা ইংরেজি তেমন জানে না। তাই শুটিংয়ের সময় ও কী বলছে, লোকাল স্টান্টম্যানরা বুঝতে পারছে না।

নীল গেঞ্জি পরা একটা ছেলে প্রচণ্ড রেগেছে। বলল, 'এই শোনো শাটুদা। আমার সঙ্গে বাওয়াল কোরো না। তেইশটা ছবিতে আমি বুম্বাদার ডামি করেছি। আমাকে এ সব শেখাতে এসো না।'

শাটুদা বোঝানোর চেষ্টা করছে, 'আমাকে বলছিস কেন ভাই চন্দন? জাম্বোর সঙ্গে তোদের যদি না পোষায়, তা হলে সেটা বল প্রোডিউসারকে। সন্ধেবেলাতেই তো সাহেব আসবে। আমাকে ট্রাবল দিচ্ছিস কেন ভাই? আমার কথায় কি প্রোডাকশন চলবে?'

চন্দন নামে ছেলেটা বলল, 'দেখো শাটুদা। তোমার সাহেবকে মাল বাড়াতে বলো।

চেন্নাই থেকে ফাইট মাস্টার আনার সময় বাজেটে টান পড়ে না। অথচ আমরা দুটো পয়সা বেশি চাইলে তখন নাকিকান্না শুরু হয়ে যায়। ও সব আর চলবে না। কাল থেকে সব বন্ধ।'

'এই সিডিউলটা অন্তত করে দে ভাই। বুম্বা পরশুদিন নর্থবেঙ্গলে চলে যাচ্ছে আউটডোরে। কাল সকালে যদি ওর ফাইটিং সিনটা করতে না পারি, তা হলে বিরাট লস হয়ে যাবে।'

'কেন, চেন্নাই থেকে স্ট্যান্টম্যান নিয়ে আসতে বলো।'

'কী যে বলিস। সেটা সম্ভব নাকি?'

'তোমাদের মতো তিলে খচ্চরদের পক্ষে সবই সম্ভব শাটুদা। জানি, একটু পরেই তুমি গিয়ে বুম্বাদাকে বলবে, চন্দনটা খুব বাড় বেড়েছে। ওঁর কান ভাঙাবে এই বলে যে, তোমার ডামি করতে চাইছে না। কিন্তু সে সুযোগ তোমাকে আমরা দেব না। বুম্বাদার সঙ্গে আগেই আমি কথা বলে রেখেছি। কালকের সিডিউল আমি করব না বলছি না। তবে ওই রকম হাই রিস্ক কাজ করাতে গেলে, আমাকে ভালো টাকা দিতে হবে। সেফটি মেজার্স রাখতে হবে। নীচে একটা গদি পেতে দিয়ে তোমরা বলবে, তিনতলা থেকে লাফাও। এটা কিন্তু হবে না।'

'জাম্বো কাল তোকে কি করতে বলেছে?'

'তিনতলা থেকে লাফাতে হবে। তার পর মোটরবাইকে চেজ করতে হবে ভিলেন রাজেশদাকে। গেল বার ওটা করতে গিয়ে আমার অ্যাঙ্কেলটা গেল। চিকিৎসার খরচাটাও প্রোডাকশন দিল না। ভাগ্যিস, বুম্বাদা আমাকে হেল্প করেছিল। ভালো ডাক্তার দেখাল। ভালো নার্সিংহোমে অপারেশন করাল। না হলে ল্যাংড়া হয়েই হাঁটতে হত বাকি জীবনটা।'

'ঠিক আছে তুই যখন করতে চাইছিস না, তখন খানুকা সাহেবকে বলে দেখি। অন্য কাউকে অ্যারেঞ্জ করা যায় কী না।' কথাগুলো বলে একটু রেগেই শাটুদা শুটিং স্পটের দিকে চলে গেল।

দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করতে লাগল সায়ন। সিনেমায় লোকে যখন দেখবে, তখন মনে হবে প্রসেনজিৎই তিনতলা থেকে লাফাচ্ছে। ভিলেনকে ধরার জন্য জান কবুল করে দিচ্ছে। আসলে তার হয়ে কাজটা করছে স্টান্টম্যান। আসল হিরো তো ওরাই। কিন্তু ওদের কথা কেউ জানতে পারে না। চন্দন বলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সায়নের মনটা সহানুভূতিতে ভরে গেল। ওরও হয়তো মা-ভাই-বোন অথবা স্ত্রী-পুত্র আছে। সংসার চালানোর দায়িত্ব হয়তো ওরই কাঁধে। অথচ কী বিপজ্জনক কাজই না ওকে করতে হচ্ছে জীবিকানির্বাহের জন্য। স্টান্টম্যানদের কথা অবশ্য একটু পরেই সায়নের মাথা থেকে হারিয়ে গেল। ও দেখল, কস্তুরী কথা বলছে তিতাসের সঙ্গে। দূর থেকে কস্তুরী ওকে দেখাল। কিন্তু ওকে দেখেই তিতাস উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করল। তার পর ভিড়ের মাঝে ও যে কোথায় গেল, সায়ন তা দেখতেই পেল না।

খুলনা শহর থেকে বেরিয়ে আসার ঘণ্টাখানেক পর বসিরহাটের পুলিশ সুপার রজতকুমারকে ফোন করলেন আবীর চৌধুরি। 'রোশনি চৌধুরির বাবা বলছি। ওর কি কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'না স্যার, এখনও পাওয়া যায়নি। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'চার-চারটে দিন কেটে গেল। এখনও মেয়েটাকে আপনারা খুঁজে পেলেন না? ইজ সি ডেড অর অ্যালাইভ?'

'স্যার, আমরা যতদূর খবর পেয়েছি, সেটুকুই আপনাকে জানাতে পারি। আমাদের ওয়াচাররা সাসপেক্ট করছে, একটা ইয়ং ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ে বাসে করে কলকাতায় গেছে। বসিরহাট বাস স্ট্যান্ডের পাশে একটা শিবমন্দিরের পুরোহিত আর বাসের একজন প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে কাল আমরা দুটো খবর পেয়েছি। সেটাই চেজ করছি। বাসে আপনার মেয়ের পরনে বোরখা ছিল। আমরা ওই ছেলেটাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা চালাচ্ছি। সম্ভবত ছেলেটা বসিরহাট শহরের।'

খবরটা শুনে মুষড়ে পড়লেন আবীর চৌধুরি। রোশনি কলকাতায় চলে গেছে? তা হলে তো ওকে ধরা আরও কঠিন। অত বড় শহর, ওই জনারণ্যে কে কার খোঁজ রাখে? পুলিশ সুপার বলছেন, রোশনির সঙ্গে একটা ছেলে ছিল। তা হলে কি সেই ছেলেটা? রোশনির সঙ্গে যার প্রেম-ট্রেম ছিল? আলতা একবার বলেছিল বটে। তখন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু ছেলেটার সঙ্গে রোশনি ইন্ডিয়াতেই বা যাবে কেন? খবরটার কোনও মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলেন না আবীর চৌধুরি। সাতক্ষীরা সীমান্তের ওই দিকটা দিয়ে প্রচুর মেয়ে পাচার হয়। সাংবাদিক জীবনের শুরুতে তিনি এই ধরনের খবর অনেকবার করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের মেয়ে খবর হয়ে যাবে, এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি বুঝতেই পারছেন না, খুলনায় ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে রোশনি ও পারে গেল কী কারণে?

'স্যার, আপনি কি লাইনে আছেন?'

মনটা ফের ফোনে দিলেন আবীর চৌধুরি, 'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমরা ভবানী ভবন ... মানে ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সকে অ্যালার্ট করে দিয়েছি। আশা করছি, দু'একদিনের মধ্যে একটা খোঁজ পাওয়া যাবে। মুশকিল হচ্ছে, এন্টায়ার মোডাস অপারেন্ডি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, আপনার মেয়ে আর যা-ই হোক, কিডন্যাপড হননি অথবা উওম্যান ট্রাফিকিংয়ের শিকার হননি। উনি নিজের ইচ্ছেয় কলকাতা গেছেন।'

পুলিশ সুপারকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন আবীর চৌধুরি, 'আমার তা মনে হয় না মিঃ কুমার। আমার মেয়ে ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট টাইপের। নিজের ইচ্ছেয় ও কলকাতা যাবে বলে মনে হয় না।'

'স্যার, আরেকটা পসিবিলিটিজও আমরা খতিয়ে দেখছি। আপনি আমাদের ভালো হিন্টস দিতে পারেন। শুনেছি আপনার মেয়ে ভালো গান গায়। গানের কেরিয়ার পারস্যু করার জন্য কি উনি কলকাতায় আসতে পারেন? রিসেন্টলি আমরা এই রকম একটা কেস হ্যান্ডেল করেছি স্যার। খুলনা থেকে একটা মেয়ে ইল্লিগ্যালি বর্ডার ক্রশ করে কলকাতায় চলে এসেছিল। কলকাতার একটা টিভি চ্যানেলে গানের রিয়ালিটি শো করছে। তার অডিশন দেওয়ার জন্য। ওই মেয়েটাও বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। কেসটা আমাদের কাছে আসার পর ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।'

আবীর চৌধুরি বললেন, 'না মিঃ কুমার। আমার মেয়ে গান ভালো গায়। ওর গানের ক্যাসেটও আছে। কিন্তু আর যা-ই করুক, ও গানের কেরিয়ার পারস্যু করবে না। খুব ঘরোয়া টাইপের মেয়ে। আমাকে না জানিয়ে ইন্ডিয়ায় যাওয়ার মেয়ে ও না।'

'স্যার, তা হলে আপনার কী মনে হয়? এ প্রদেশে রোশনির কি কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল? আজকাল তো টিনএজার ছেলে-মেয়েরা অনেক অ্যাডভান্সড। ইন্টারনেটে চ্যাট করতে করতেও লাভ অ্যাফেয়ার্সে জড়িয়ে পড়ে। সে রকম কোনও কিছু...?'

'না মশাই। ইউ আর মেকিং থিঙ্কস আননেসেসারি কমপ্লিকেটেড।' খানিকটা বিরক্তির সুরেই আবীর চৌধুরি বললেন, 'এখন ছাড়ছি। কোনও খবর পেলে আমাকে কুইক জানাবেন। উইদিন আ ডে অর টু আই মাইট বি ল্যান্ডিং ইন ক্যালকাটা।'

চট্টগ্রাম থেকে ভোরবেলায় রওনা হয়েছিলেন আবীর চৌধুরি। প্রায় বারো ঘণ্টা লেগে গেছে খুলনা শহরেই পৌঁছোতে। সেখান থেকে যাবেন সাতক্ষীরা মহকুমার ঘলঘলিয়ায়। পৌঁছোতে দু'ঘণ্টা লেগে যাবে। রাস্তা খারাপ। আগে চট্টগ্রাম থেকে গাড়িতে সরাসরি খুলনা আসা যেত। বন্যার সময় মাঝে একটা ব্রিজ ভেঙে পড়ায় এখন ঘুরে ঢাকা হয়ে আসতে হয়। তাই অনেকটা সময় লেগে যায়। দুপুরে ঢাকায় এক সাংবাদিক বন্ধুর বাড়িতে আবীর চৌধুরি লাঞ্চ সেরে নিয়েছিলেন। তার পর পেটে আর কিছু দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি।

দীর্ঘ পথযাত্রায় তিনি এমনিতেই ক্লান্ত। তার ওপর ওই দুঃসংবাদ।

খুলনা শহর থেকে ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে আবীর চৌধুরি ভাবতে লাগলেন, সাংবাদিকতার পেশায় ব্যস্ত থাকার খেসারত এর আগে তিনি একবার দিয়েছেন, স্ত্রী কমলাকে হারিয়ে। স্ত্রীর অসুস্থতার সময় পাশে থাকতে পারেননি। এ বার হয়তো মেয়েকেও হারাতে হবে। কথাটা ভাবতেই তাঁর বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। বছর পনেরো আগে চাকমাদের নিয়ে একটা লেখার রশদ সংগ্রহের জন্য তিনি রাঙামাটি গিয়েছিলেন। সেখানকার এক শরণার্থী শিবিরে প্রথম রোশনিকে দেখেন। ওকে দেখেই মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই নিজের বাসায় নিয়ে আসেন। তখনই ওর মধ্যে দুটো গুণ আবীর চৌধুরি আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা হল ওর গানের গলা আর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। ও একবার যা শোনে, তা মনে রাখতে পারে। কোনও গান একবার শুনলে, হুবহু তা গাইতে পারে। নিজের সন্তান নেই বলে ওকে মেয়ের মতোই মানুষ করতে চেয়েছিলেন আবীর চৌধুরি। সেই ফুলের মতো মেয়েটা কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ।

রোশনির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে আবীর চৌধুরি আবার ভাবতে বসলেন। গাড়ির সিটে মাথা হেলিয়ে, চোখ বুজে। রহস্য নয়তো কী? চারদিন আগে খুলনা থেকে তাঁর শ্যালিকা রমলা ফোন করে যখন খবরটা দেয়, তখন তিনি চট্টগ্রামে, কাগজের অফিসে বসে। দেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক কলাম লিখছেন। খবরটা শোনার পরই যেটা তাঁর মনে হয়, সেটা হল, তাঁকে চাপে ফেলার জন্যই সম্ভবত কেউ রোশনিকে কিডন্যাপ করেছে। দৈনিক পূর্বকোণ কাগজের রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর নামটা পাঠকদের কাছে খুবই পরিচিত। তাঁর লেখা নিয়ে ঢাকার রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন হয়। এবার নির্বাচনে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি টানা লিখে চলেছেন। সেটা বন্ধ করার জন্যই হয়তো উগ্রপন্থী মৌলবাদীরা কেউ পালটা চাপে ফেলার কৌশল নিয়েছে।

ভায়রাভাই দীপ্তেন রায় ঘলঘলিয়ার বাসায় খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা করেন। প্রচুর পয়সাকড়ির মালিক। রোশনি প্রতিবারই দুর্গাপুজোর সময়টা খুলনায় কাটায়। ওকে যারা কিডন্যাপ করেছে, তারা নিশ্চয়ই খবরটা জানে। ভাসানের দিন তারা সেই সুযোগটা নিয়েছে। রমলার কাছে খবরটা শোনার পর আবীর চৌধুরি আর সময় নষ্ট করেননি। ঢাকায় ফোন করে হোম মিনিস্টারকে সব জানান। হোম মিনিস্টার সরকারি স্তরে যা অনুরোধ করার, করেছেন। এখন ইন্ডিয়ান পুলিশ কতটা উদ্যোগ নেয়, সেটা দেখার জন্যই তিনি অপেক্ষা করছেন। মুশকিল হচ্ছে, তার সন্দেহের কথা আবীর চৌধুরি খোলাখুলি বলতে পারছেন না। তা হলে উগ্রপন্থীরা আরও সাহস পেয়ে যাবে।

'ছার, আইস্যা গেসেন।' ড্রাইভারের কথায় সম্বিত ফিরল আবীর চৌধুরির। দেখলেন, শ্যালিকা রমলার বাসার সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে। বাসা সংলগ্ন বাগানে ম্যারাপ এখনও খোলা হয়নি। লক্ষ্মীপুজোর জন্যই বোধহয়। বাইরে একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে। কিন্তু ম্যারাপের ভেতরটা অন্ধকার। লক্ষ্মীপুজো আজ না কাল, ঠিক মনে করতে

পারলেন না আবীর চৌধুরি। কমলা মারা যাওয়ার পর থেকে নিজের বাসায় ওসব পুজোর পাঠ উঠে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজা পেরোনোর সময় রোশনির কথা ভেবে বুকটা হু হু করে উঠল। চার দিন আগেও, এখানে রোশনি হেসে খেলে বেড়িয়েছে। এখন ও কোথায় কেউ জানে না। কিডন্যাপাররা ওকে মেরে ফেলেছে কী না, কে জানে?

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই আবীর চৌধুরি দেখলেন দীপ্তেন আর রমলা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে। ভায়রাভাই দীপ্তেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও খবর পাইসেন নাকি দাদা?'

'না। ইন্ডিয়ান পুলিশ অহন কইত্যাসে, মাইয়া কলকাতায় চইল্যা গ্যাসে।'

'হায় ভগবান, কয় কী?' অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন রমলা। তার পর আবীর চৌধুরির বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলেন জায়াম্বু, আগে ভিতরে চলেন। গোসল কইর‍্যা নেন। তারপর কথাবার্তা কইয়েন।'

আধ ঘণ্টা পর সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আবীর চৌধুরি বললেন, 'অহন ডিটেলে কও তো দীপ্তেন, ভাসানের দিন কী হইসিল?'

'কী আর কমু দাদা। আমারই মুর্খামি। ছ্যামড়া-ছেমড়িরা তাল তুলল, ইছামতীতে ভাসান দিব। আমিও নাইচ্যা উঠলাম। এ বার আমাগো ঠাকুরও হইসিল সোন্দর। আটচালা লইয়্যা কুড়ি ফুট উঁচা। সবাই কইল, ইন্ডিয়ার মানুষজনরে এই ঠাকুর দেখাইতে হইব। ওই পারে লইয়া চলো। বড় দুইটো নাও ভাড়া কইর‍্যা আনল আমাগো গোমস্তা। দুই নাওয়ের মাঝে দুগ্গা প্রতিমা। এক্কেরে দেখনের মতো দৃশ্য। বিহানে ঠাকুর ভাসান দিয়া ঘলঘলিয়ার ঘাটে আইস্যা দেহি, মাইয়া নাওয়ে নাই। গেল কই? হক্কলকে জিগাই। কেউ কইতে পারে না। আমি তো এহনও বুঝি নাই, নাও থেইক্যা ছেমড়ি নামল কী কইর‍্যা?'

আবীর চৌধুরি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো কইর‍্যা মনে করো দীপ্তেন।'

'দাদা, হেই কামটাই তো করতাসি। এক হইতে পারে, ওই পারে আমাগো নাওয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাইগ্যা একটা ছোট নাও উলটাইয়া গেসিল। তখন নাইম্যা যাইতে পারে। কিন্তু তাইলেও আমাগো পোলাপানগোর কারও না কারও চোখে পড়ত।'

'জলে ডুইব্যা যায় নাই তো?'

'ক'ন কি দাদা। বাংলাদেশের মাইয়া, সাঁতার জানে, ডুইব্যা যাইব ক্যামন কইর‍্যা?'

'তাও ঠিক। আসলে কী জানো, আমার মাথার ঠিক নাই।'

নৌকোয় ধাক্কা মারার ব্যাপারটা আবার কিডন্যাপারদের ছকে হয়নি তো? কথাটা আবীর চৌধুরির মাথায় দ্রুত এসেই মিলিয়ে গেল। হতেও পারে। কোনওকিছু অসম্ভব নয়। সাংবাদিক জীবনে অভিজ্ঞতার তো শেষ নেই। অনেক কিছু তিনি দেখেছেন, ভাবতেও যা কষ্ট হয়। নৌকোয় নৌকোয় ধাক্কা লাগার ঘটনা ইন্ডিয়ান পুলিশকে জানানো হয়নি। জানালে ওরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারত, ওই নৌকোটা সেদিন কারা ভাড়া করেছিল। মাঝিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা সূত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। এর পর এস পি রজতকুমার যখন ফোনে কথা বলবেন, তখন ঘটনার কথা তাঁকে বলতে হবে।

রমলার ছেলে দীনেশ আর মেয়ে অমলা চুপ করে কথা শুনছে। অমলা রোশনির বয়সি। তাকে জিজ্ঞেস করলেন আবীর চৌধুরি, 'মা রে, তরা জানস কিছু। রোশনি কিছু কইয়া গেসে নাহি তরে?'

অমলা চমকে তাকাল। প্রশ্নটা ও আশা করেনি। একবার দীপ্তেন, তার পর রমলার দিকে তাকিয়ে ও মুখ নিচু করে ফেলল। সাংবাদিকের চোখ। ওর ভাবভঙ্গি দেখে আবীর চৌধুরির মনে হল, মেয়েটা কিছু লুকোচ্ছে। হয়তো বাপ-মার সামনে বলতে সংকোচ করছে। রোশনির সঙ্গে অমলার খুব ভাব। প্রায়ই ফোনে ওদের কথা বলতে শোনেন আবীর চৌধুরি। তাই গলায় আবেগ ঢেলে তিনি বললেন, 'ক' মা। কইয়া ফ্যাল, আমারে লুকাইস না। রোশনির সঙ্গে কারও ভাবভালোবাসা ছিল?'

শুনেও অমলা চুপ করে রইল। এবার রমলা ধমকে উঠলেন, 'এই ছেমড়ি, চুপ কইরা আছস ক্যান। মেসো যা জিগায়, ক'। উত্তর দিতাছস না ক্যান?'

ধমক শুনে অমলা কেঁদে ফেলল। তার পর বলল, 'রোশনি আমারে কইসিল, কইলকাত্তায় যাইব।'

কথাটা শুনে এ বার চমকে উঠলেন আবীর চৌধুরি। তা হলে তো ইন্ডিয়ান পুলিশের ধারণাই ঠিক। কিন্তু হঠাৎ কলকাতায় যাওয়ার কথা রোশনি ভাবল কেন? প্রশ্নটা মুখ ছিটকে বেরিয়েও এল, 'তরে কবে কইসিল?'

'অষ্টমী পুজোর দিন।'

'ক্যান, কইলকাত্তায় যাইব ক্যান?'

'রঞ্জন তালুকদারের সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'কে রঞ্জন তালুকদার? তুই চেনস নাহি তারে?'

রমলা হঠাৎ উঠে গিয়ে ঠাস করে এক চড় মারলেন অমলার মুখে, 'হারামজাদি মাইয়া, অ্যাদ্দিন ক'স নাই ক্যান? তরে আজ কাইট্টা ফেলুম।'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল অমলা। ওর ফরসা মুখটা লাল হয়ে গেছে। আবীর চৌধুরি সোফা থেকে উঠে গিয়ে বুকে আগলে ধরলেন অমলাকে। 'মারতাসো ক্যান রমলা। অর কী দোষ। আগে শুনতে দাও, ও কী জানে। আয় মা, আমার কাছে আয়। ক' তো রোশনি তরে ঠিক কী কইসিল?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে অমলা যা বলল, তা শুনে আবীর চৌধুরি গুম হয়ে গেলেন। রঞ্জন বলে ছেলেটার সঙ্গে গত বছর নাকি এই বাড়িতেই রোশনির আলাপ হয়। ছেলেটা রোশনিকে বিয়ে করতে চায়। ছেলেটা নাকি কলকাতায় কোনও একটা নামি নাইট ক্লাবে চাকরি করে। গিটারবাদক হিসেবে ইন্ডিয়াতে খুব নামও করেছে। ফোনে নাকি মাঝে মাঝে সে যোগাযোগ রাখত রোশনির সঙ্গে। এ বার মহালয়ার দিন হঠাৎ ছেলেটা ফোন করে। রোশনিই নাকি তখন ওকে বলে, কলকাতায় নিয়ে যেতে। রঞ্জন বলেছিল, ভাসানের দিন ও টাকিতে থাকবে। সেখানে ওর সঙ্গে দেখা হবে। তাই চট্টগ্রাম থেকে রোশনি ঠিক করেই

এসেছিল, সবার অলক্ষে ভাসানের দিন টালিতে যাবে। সেখান থেকে রঞ্জনের সঙ্গে কলকাতায়। ওর ধারণা, সেদিন নাকি পাশপোর্ট কিম্বা ভিসার দরকার হয় না। ইচ্ছে করলে যে কেউ বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ায় চলে যেতে পারে। রোশনি নাকি বলে গেছে। কলকাতা থেকে আর কোনওদিন ফিরবে না। ওখানে টিভিতে গান গাইবে। গান গেয়ে প্রচুর রোজগার করবে। ও আর রঞ্জন গান গাইতে বিদেশেও যাবে।

অমলার কথা শুনে পুরো ঘর নিস্তব্ধ। প্রথম কথাটা বললেন আবীর চৌধুরি, 'রঞ্জনের কোনও ফোন নাম্বার তরে কইসিল নাকি মা?'

'না, আমারে দেয় নাই। হের মোবাইল ফোন আমার কাছে ফালাইয়া গ্যাসে। নিয়া আমু?'

দীপ্তেন বললেন, 'যা নিয়া আয়। দাদা, কইলকাত্তার নাইট ক্লাবে গিয়া খোঁজ করা যায় না?'

আবীর চৌধুরি বললেন, 'কইলকাত্তায় কি একডা নাইট ক্লাব। হাজারডা আছে। কোথায় গিয়া খোঁজ করুম? হ, পুলিশরে দিলে অরা খুঁইজ্যা বাইর করতে পারব। মা অমলা, নাইট ক্লাবের নাম-টাম তরে রোশনি কিসু কইসে? মনে কইর‍্যা দ্যাখ তো মা।'

অমলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'কইসিল, মনে নাই। ওই নাইট ক্লাবে ডিস্কো থেক আছে। সিনেমা আর্টিস্টরা নাচতে যায়। ওহানে একটা বিউটি পার্লারও আছে। রোশনি আমারে কইসিল, মাসি-মেসোরে কিসু কইস না। আমি কইসিলাম, তুমি একটা মাইয়া, তুমি একা যাইতাস, ডর লাগতাসে না? ও কইল, ধূর, আমি মাইয়া সাইজ্যা যামু নাহি? সাথে গোঁফ নিয়া যাইতাসি। ব্যাটাছেলে সাজুম। কেউ চিনতে পারব না। একদিন ব্যাটাছেলে সাইজ্যা আমারে দেখাইসিল। আমি হত্যাই অরে চিনতে পারি নাই।'

আবীর চৌধুরি বললেন, 'পোলাডার কথা আমারে একদিন আলতা কইসিল। আমি ইম্পরট্যান্স দিই নাই। টিন এজ, ক্রাশ লাভ কত হয়। হায় হায় রে, ও পলাইয়া যাইব জানলে, আমি...'

'অর মনে খুব দুঃখ হইসিল মেসো।'

'ক্যান? আমি তো অরে কোনও দুঃখ দিই নাই।'

'আলতাপিসি অরে গঞ্জনা দিত। আমাগো এহানে আসার আগে অরে নাকি আলতাপিসি কইসিল, তুই আবীর চৌধুরির আপন মাইয়া না। তুই অনাথাশ্রমের মাইয়া। তর বাপের কুনো ঠিক নাই। আমি আইস্যা গেছি। তুই যদি ভাইব্যা থাকস, আবীরের সম্পত্তি লুইট্যা-পুইট্যা খাবি, তাইলে ভুল ভাবছস। এহেনে আইস্যা প্রথম দিনেই ও আমারে কইসিল, অরে নাহি কেউ ভালোবাসে না।'

শুনে আবীর চৌধুরি থ মেরে বসে রইলেন। না, তা হলে রোশনি কিডন্যাপড হয়নি। স্বেচ্ছায় চলে গেছে। কে এই অপকর্মটি করল তা ভাবার আগে, তিনি পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করলেন। তারপর নাম্বার টিপতে লাগলেন। বসিরহাটের এসপি তা হলে ঠিকই বলেছিলেন।

সকালবেলায় জগিং করতে বেরিয়েছিল সায়ন। ফেরার সময় দেখল, অ্যাপার্টমেন্টের লনে তনিমাবউদি মর্নিং ওয়াক করছেন। যাতে মুখোমুখি হতে না হয়, তার জন্য সায়ন মুখ নিচু করে হাঁটছিল। কিন্তু বউদিকে এড়িয়ে যাওয়া শিবেরও অসাধ্যি। পা চালিয়ে ঠিক ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন বউদি। বললেন, 'এই শোনো শোনো সানু, তোমার জন্যই ওয়েট করছিলাম। ওই মিষ্টি ছেলেটা কে গো?'

সায়ন অবাক হয়ে বলল, 'কোন ছেলেটা বউদি?'

'আরে তোমার সঙ্গে যে ছেলেটা কাল এল। বোরখা পরে পুট করে ঢুকে গেল, সেই ছেলেটা।'

সঙ্গে সঙ্গে বুচানের কথা মনে পড়ল সায়নের। ঠিক যা বলতে বলে দিয়েছিল, তনিমা বউদিকে ও তাই বলেছে। সায়ন বলল, 'ওহ্, দেখেছেন তা হলে। ও তো কাঞ্চনের ভাই, মাসতুতো ভাই রোশন। বাড়ি থেকে রাগ-মাগ করে চলে কোথায় চলে যাচ্ছিল। কাঞ্চন তাই জোর করে ওকে নিয়ে এসেছে।'

'কেন বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল কেন?'

'সে অনেক গল্প। বাড়ি থেকে ওকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছিল। ও বিয়ে করবে না।' আরও সাসপেন্স তৈরি করার জন্য সায়ন বলল, 'পরে সব বলব বউদি। এখন একটু তাড়া আছে।'

'বলো না, বলো না গো। ছেলেটা কী মিষ্টি, কী মিষ্টি।'

'প্লিজ বউদি, ওর কথা এখানে কাউকে বলবেন না। পুলিশ এসে কিন্তু ওর খোঁজ করতে পারে।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ? তোমার এই তনিমাবউদির মুখ থেকে কেউ একটা কথাও বের করতে পারবে না। হ্যাঁ গো, ছেলেটা কি একটু পাগল-পাগল টাইপের?'

শুনে হাসি পেল সায়নের। বলল, 'একটু পাগল নয় বউদি, পুরোটা পাগল।'

'আহা রে, ভগমানের কী বিচার। অমন মিষ্টি একটা ছেলে, এই বয়েসে পাগল হয়ে গেছে। তা, অমন ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন কেন ওর বাবা মা?'

'এইখানেই তো যত প্রবলেম। রোশনের বাবা যে মেয়েকে পছন্দ করেছেন, তাকে ও বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু ওর বাবা সেই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেবেন। এই নিয়ে নিত্যি অশান্তি। তার পর থেকেই রোশনের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ও যে পাগল, সেটা আপনি জানলেন কী করে বউদি?'

'এই দেখো, তোমাকে বলিনি, তাই না? কাল বিকেলে কালীপুজোর চাঁদা চাইবার জন্য তোমার ফ্ল্যাটে গেসলাম। তা, তখন তুমি ছিলে না। বারবার ডোর বেল টিপছি। কোনও সাড়া নেই। তার পর দেখি, ওই ছেলেটা দরজা খুলে দিল। যত জিজ্ঞেস করি, সায়ন কই, ছেলে ফরফর করে কী যে বলে বাবা, বুঝতে পারি না। আহা রে, ছেলেটার যে মাথা খারাপ, তখন জানব কী করে? চারতলার রেখা কাল আমার ফ্ল্যাটে গল্প করতে এয়েছিল। ওকে বললাম, সানুর ঘরে একটা ছেলে এয়েচে, কী মিষ্টি, কী মিষ্টি। বল তো, তোর মেয়ের জন্য ঘটকালি করি। কিন্তু এ ছেলেও যে ফাঁকা নেই, তখন জানব কী করে?'

ধরা পড়ে তনিমা বউদি কালীপুজোর বাহানা দিচ্ছেন। পেটের ভেতর হাসি কুলকুল করছে, তবুও নিজেকে সামলে সায়ন বলল, 'কার কথা বলছেন বউদি, কেকা? হ্যাঁ, ওর সঙ্গে রোশনকে মানাবে ভালো। এমনিতে তো ছেলেটা খারাপ নয়। কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ভালো চাকরি করত। মাঝখান থেকে কী যে হয়ে গেল।'

'তুমি ওকে একজন ভালো ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন সানু?'

'আমার সেরকমই ইচ্ছে। কিন্তু মাকে তো জানেন বউদি। রোশনের কথা কানে গেলেই আমায় বলবে, পাগল-টাগলকে তুই আবার কেন ঘরে রেখেছিস? কাঞ্চনের ঝামেলা তুই কেন ঘাড়ে নিবি? রোশনকে নিয়ে এমনিতে অবশ্য কোনও ঝামেলা নেই। আপনি তো দেখেইছেন ওকে কাল, কী মনে হল?'

'খুব মিষ্টি ছেলে। আভাদিকে নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না। ওকে যা বলার, আমি বলে দেব। তুমি রোশনকে ভালো করে তোলো। দেখি, কেকার সঙ্গে ওর বিয়েটা দেওয়া যায় কী না?'

'আমি তা হলে যাই বউদি?'

'যাবে, যাও। কিন্তু আর কী যেন বলব, বলব মনে হচ্ছিল? ও, হ্যাঁ, বসিরহাট থেকে আভাদি কাল সন্ধেবেলায় ফোন করেছিল। তোমার কথা জানতে চাইছিল। পৌঁছে কী না।'

'মাকে রোশনের কথা কিছু বলেননি তো বউদি?'

'তোমার মাথা খারাপ?'

'যাক নিশ্চিন্ত।' সায়ন মাসকা লাগাতে শুরু করল। 'মা আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করে যে, প্রেসার বাড়িয়ে ফেলেছে। এ বারও বাড়ি গিয়ে বললাম, তুমি এত ভেবো না মা।

কলকাতায় তনিমাবউদি আছেন। সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখেন। শুধু আমার নয়, অ্যাপার্টমেন্টের সবার খবর উনি রাখেন। আমাকে নিয়ে তোমার এত ভাবার কী আছে? কিন্তু কে কার কথা শোনে?'

শুনে তনিমাবউদি একেবারে গদগদ। বলল, 'বাঃ বাঃ। এ সব বলেছ বুঝি। আমি তো সবাইকে বলি, সানুর মতো ছেলে হয় না। তুমি বাবা, রোশন ছেলেটাকে পাগলের ডাক্তার দেখাও। সময় নষ্ট কোরো না। ছেলেটা কী মিষ্টি, কী মিষ্টি।'

তনিমাবউদির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সায়ন। ভোরবেলায় জগিং করতে যাওয়ার সময় দরজার বাইরে তালা লাগিয়ে গিয়েছিল। তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই ও চমকে উঠল। দেখল, ওরই জামা আর ফুলপ্যান্ট পরে রোশনি বসে আছে। নাকের তলায় সরু গোঁফ। দেখে মনেই হচ্ছে না ও মেয়ে। সায়নের মনে পড়ল, বসিরহাট থেকে বেরোনোর দিনও মেয়েটা ছদ্মবেশ নিয়েছিল। এ মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। চমক কেটে যাওয়ার পর সায়ন হাসতে শুরু করল। সত্যি সত্যিই ধুরন্ধর মেয়ে। না হলে তনিমা বউদির মতো ঘোড়েল মহিলাকে টুপি পরাতে পারে? হাতের মুদ্রায় ও রোশনিকে বোঝাল, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে ও বাথরুমে ঢুকে গেল। রুনুমাসি একটু পরেই কাজ করতে আসবে। রোশনিকে দেখে বুঝতেই পারবে না ও মেয়ে।

স্নান করার ফাঁকেই সারাদিনের কাজ ছকে ফেলল সায়ন। আজ বেলা দশটার মধ্যেই ওকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে পৌঁছোতে হবে। ওর জন্য ওখানে অপেক্ষা করবে কস্তুরী। ওকে নিয়ে যাবে প্রসেনজিতের কাছে। তিতাসকে বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছেন প্রসেনজিৎ। তিতাস যদি আজই বসিরহাটে ফিরতে রাজি হয়, তা হলে অবশ্য একটা সমস্যা আছে। রোশনির কী হবে? সায়ন মনে মনে ঠিক করল, আজ বিকেলেই ও রঞ্জন তালুকদারকে খুঁজে বের করবে। ওর হাতে রোশনিকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যাবে বসিরহাট। তেমন হলে একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে নেবে।

বাথরুমের দরজায় টোকার শব্দ শুনে সায়ন বাইরে মুখ গলাল। তখনই ওর মোবাইলের রিং টোনটা ও শুনতে পেল। এত সকালে কে আবার ফোন করল? রোশনি সেটটা এগিয়ে দিয়েছে। হাত বাড়িয়ে নেওয়ার সময় ওর হাতে স্পর্শ হতেই সায়নের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিজেকে সামলে ফোনটা কানে দিতেই, অন্য প্রান্তে গলা শুনে ও বুঝতে পারল, কাঞ্চন। 'সানু তুই কি বসিরহাটে?'

সায়ন বলল, 'না, কলকাতায়। একটা ইম্পরট্যান্ট কাজে মা পাঠিয়েছেন। তুই কবে আসছিস রে?'

'যাওয়ার কথা তো ছিল কালীপুজোর পর। কিন্তু নয়ডা থেকে কাল রাতে ফোন পেলাম, সাতদিনের মধ্যে আমাকে অফিসে জয়েন করতে হবে। কী করি বল তো, যাব?'

নয়ডার একটা আইটি কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে কাঞ্চন। বেশ ভালো মাইনের। চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া ওর উচিত হবে না। তাই সায়ন বলল, 'তুই এখন কোথায়?'

'চিটাগাংয়ে। তুই বসিরহাট চলে যাওয়ার পর ভাবলাম, চাকরিতে একবার জয়েন করে গেলে বছর দেড়েকের আগে তো আর চিটাগাংয়ে আসা হবে না। তাই কোন্নগরে মাসিদের নিয়ে বেড়াতে এসেছি। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।'

'ভালো করেছিস। তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস লেক গার্ডেন্সে চলে আয়। তার পর কী করবি, ভাবা যাবে। এখানে আসার পর ট্রেনের টিকিট যদি না পাস, ফ্লাইটে দিল্লি চলে যাবি। দু'আড়াই ঘণ্টার তো মামলা। অত চিন্তার কী আছে?'

কাঞ্চন বলল, 'তারপর ... পুজোটা তোর কেমন কাটল, সানু? তিতাসের সঙ্গে দেখা-টেখা হল?'

'আমার কথা ছাড়। তুই যে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিস, সেটা চেপে গেলি কেন রে?'

'মানে...তুই কা...কার কথা বলছিস?'

'আমি সব জানি। তুই আয়, তোর ব্যবস্থা আমি করছি। কবে আসছিস, জানিয়ে দিস। এখন স্নান করছি। আর কথা বলতে পারব না। আচ্ছা, ছাড়ি তা হলে?'

বলেই লাইনটা কেটে দিল সায়ন।

... বেলা দশটার সময় ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে গিয়ে সায়ন দেখল, দু'নম্বর ফ্লোরের কাছে কস্তুরী দাঁড়িয়ে আছে। আজ ওর পরনে ঘাঘরা চোলি। মুখে মেক আপ। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সামনাসামনি হতেই কস্তুরী বলল, 'বুম্বাদা মেক আপ রুমে আছে। একটু পরেই শট দিতে আসবে। ভিলেনের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। আমার একটা মাত্তর ডায়লগ। একটু ওয়েট করো। আমি ডায়লগটা ঝালিয়ে নিই।'

কথাগুলো বলেই কস্তুরী গাছতলায় গিয়ে বসল। আশপাশে অনেকেই কাজে ব্যস্ত। বাঁ দিকে একটা তিনতলা বাড়ি। ঠিক তার নীচে কয়েকটা লোক পিচবোর্ডের বাক্স সাজিয়ে রাখছে। তার ওপর বিরাট একটা গদি পাতছে। সায়ন বুঝতে পারল, তার মানে তিনতলার ওপর থেকে গদিতে কেউ লাফিয়ে পড়বে। সেই সিনটা ক্যামেরায় তোলার উদ্যোগ চলছে। নীচে পড়ার পর যাতে চোট না লাগে, সেজন্য গদিটার নীচে পিচবোর্ডের বাক্স রাখা হয়েছে। সিনেমায় কত কী-ই না দরকার লাগে। হঠাৎ সায়ন দেখল, একটু দূরে একটা জটলা। কালো মতো একটা লোককে ঘিরে বেশ উত্তেজনা। তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলছে স্ট্যান্টম্যান চন্দনের। যার সঙ্গে কাল শাটুদার খুব ঝামেলা হচ্ছিল। চন্দন আঙুল তুলে কথা বলছে। তা হলে এই কালো মতো লোকটাই ফাইটমাস্টার জাম্বো? লোকটাকে দেখে খুব মজা পেল সায়ন। এই লোকগুলোই হিরো আর ভিলেনদের ফাইটিং শেখায়।

জাম্বো লোকটাকে আরো ভালো করে দেখার জন্য সায়ন জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চন্দন যত হুমকি দেওয়ার সুরে কথা বলছে, জাম্বো ততই কিন্তু নরম গলায়। লোকটা হিন্দিতে কী বলছে, ভালো বোঝা যাচ্ছে না। কেননা কথায় দক্ষিণ ভারতীয় টান। হঠাৎই

জাম্বো ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল। তার পর মোবাইলে কথা বলতে লাগল কার সঙ্গে। জাম্বোর দিকে তাকিয়ে চন্দন কাকে যেন বলল, 'তোরা কেউ রাজি হবি না। দেখি ফাইট সিনটা জাম্বো আজ করে কী করে?' চন্দন বলে ছেলেটার কথাবার্তার ধরন দেখে মনে মনে একটু রাগই হতে লাগল সায়নের। টিপিক্যাল বাঙালি। কাজ বন্ধ করে দাবি আদায় করছে। ওদের কথা শুনতে শুনতে সায়ন একবার তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকাল। ওই হাইট থেকে লাফানো এমন কী ব্যাপার। বসিরহাটে ওর থেকেও উঁচু নারকেল গাছে উঠে ওরা ইচ্ছামতীতে ডাইভ মারত। ডুব সাঁতারে চলে যেত মাঝ নদীতে।

'ওপর দিকে তাকিয়ে কী দেখছ সায়ন?'

কস্তুরীর গলা শুনে সায়ন পাশ ফিরে তাকাল। গাছতলা থেকে কখন উঠে এসেছে, ও টের পাইনি। ও বলল, 'দেখছি ওই তিনতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়া যায় কিনা?'

'এমনভাবে তুমি বলছ, যেন তোমার কাছে জলভাত।'

'জলভাত হয়তো নয়, কিন্তু এমন কিছু কঠিনও নয়। দরকার শুধু সাহসের। বুঝলে?'

'অত সোজা নয় সায়ন। আচ্ছা আচ্ছা স্টান্টম্যান কিন্তু ঘাবড়ে যায়।'

'দেখবে আমি পারি কী না?'

'না বাবা, অত হিরোইজম দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। মাঝখান থেকে হাত পা ভেঙে শুয়ে থাকবে। যে কাজটা করতে এসেছ, সেটা করে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাও। বুম্বাদার মেক আপ হয়ে গেছে। এখুনি এখানে এসে পড়বে।'

'তিতাস কি স্টুডিয়োতে এসেছে?'

'অনেকক্ষণ। ও তো বুম্বাদার মেক আপ ভ্যানে বসে আছে। তুমি আসার আগে, দিলীপদা আমায় বলল, বুম্বাদা নাকি সকাল থেকে ওকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে?'

'কে দিলীপদা?'

'জানো না? ও হরি, তুমি জানবেই বা কী করে? দিলীপদা হল বুম্বাদার মেক আপ ম্যান। আরে, ওই তো...তিতাস বলে মেয়েটা আসছে। দেখতে পাচ্ছ, বুম্বাদার সঙ্গে? আমার মনে হয়, আগে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো। তারপর না হয়, বুম্বাদার কাছে যেয়ো।'

তিতাসকে সোজাসুজি ওর দিকেই আসতে দেখে সায়ন একটু অস্বস্তি বোধ করল। পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, স্লিভলেস টপ। বসিরহাটের মেয়ে বলে ওকে মনেই হচ্ছে না। যেন র‍্যাম্প থেকে নেমে এল। ওকে শেষ কবে সামনাসামনি দেখেছে, সায়ন ঠিক মনে করতে পারল না। বোধহয় বরদামেসোর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর দিন। বছর চারেক আগে তো হবেই। রোসি ঠিকই বলেছিল, তিতাসের মতো মেয়েকে বসিরহাটে মানায় না। আগুনের মতো রূপ নিয়ে ও যেভাবে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে একদিন না একদিন ভালো কোনও ডিরেক্টরের চোখে পড়ে যেতে পারে।

স্টান্টম্যানদের জটলার কাছে প্রসেনজিৎ এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তিতাস দাঁড়াল না। ওর সামনে এসে বেশ রাগতস্বরেই বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে? তোমাকে তোমার মা পাঠিয়েছে বুঝি?'

কথায় খোঁচা। তবুও সায়ন ঠান্ডা গলায় বলল, 'কে আমাকে পাঠিয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। অরূপকাকা খুব অসুস্থ। তোমাকে আমি নিতে এসেছি।'

'ইউ আর লায়িং। বাবার কিস্যু হয়নি। বসিরহাটের খবর আমি রোজই পাচ্ছি। আমি আর বসিরহাটে ফিরব না। তুমি চলে যাও। এখানে আমার গার্জেন হওয়ার চেষ্টা কোরো না।'

'তিতাস, তুমি কিন্তু ভুল করছ। সিনেমার জগৎটাকে তুমি যা ভাবছ, তা কিন্তু নয়। মাথা ঠান্ডা করো। যা বলছি, শোনো। একবার পা স্লিপ করে গেলে, আর কিন্তু ফিরতে পারবে না।'

'আমাকে জ্ঞান দিয়ো না সায়ন। দু'তিনদিনের মধ্যেই আমি মুম্বাই চলে যাচ্ছি। অ্যাকট্রেস হয়ে তোমাদের আমি দেখিয়ে দেব, শাশুড়ির পায়ে তেল মালিশ করে জীবন কাটানোর মেয়ে আমি না।'

'তোমাকে অ্যাকট্রেস হতে তো কেউ বাধা দিচ্ছে না।'

'তার মানে? তা হলে আমাকে নিতে এসেছ কেন? বাবা যে সেদিন বলল, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছে। তোমার মা নাকি মত দিয়েছে। তুমি ভাবলে কি করে সানুদা, তোমাকে আমি বিয়ে করব? তোমার ওই কনজার্ভেটিভ মাইন্ডের মায়ের বউমা হয়ে সারাটা জীবন কাটাব? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও সানুদা। প্লিজ, আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

কস্তুরীর সামনেই তিতাস এ সব কথা বলে যাচ্ছে। তীরের মতো এক একটা কথা বিঁধছে ওর গায়ে। মারাত্মক জ্বালুনি অনুভব করল সায়ন। কথাগুলো যে বলবে, তিতাস বোধহয় তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। ও কি দশ বছর আগে চড় খাওয়ার বদলাটা আজ নেবে বলে ঠিক করেছিল? ও যা বলল, তারপর আর কোনও অনুরোধ চলে না। ওর দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে সায়ন ভাবতে লাগল, এই মেয়েটাকে কী করে ও ভালোবেসেছিল? অথবা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, যদি কাউকে বিয়ে করে, তো এই মেয়েটাকেই করবে। ওর সব থেকে খারাপ লাগল এটা শুনে 'তুমি কি করে ভাবলে, তোমাকে আমি বিয়ে করব?' মেয়েটার এত ঔদ্ধত্য!

অন্য কোথাও হলে সায়ন ফের ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসত। কিন্তু জায়গাটা বসিরহাট নয়। তাই অপমানটা হজম করে ও বলল, 'তা হলে বসিরহাটে তুমি আর ফিরছ না।'

'সার্টেনলি নট। দয়া করে তুমি আর আমার সামনে এসো না। আমার নামে উলটো-পালটা বলে তোমরা বুম্বাদার মন ভাঙানোর চেষ্টা করছ করো। কিন্তু তাতে কোনও লাভ

হবে না।'

'অরূপকাকা যদি জানতে চান, তা হলে কী বলব?'

'তোমার যা ইচ্ছে, তাই বোলো।' হিসহিস করে কথাগুলো বলে তিতাস ফ্লোরের ভেতর ঢুকে গেল। দেখার প্রয়োজনও মনে করল না, ফ্যাকাশে মুখে সায়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

pathagar.net

বেলা সাড়ে ন'টায় সায়ন বেরিয়ে যাওয়ার পরই রোশনি স্নান সেরে নিল। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। না হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। নতুন জায়গা, তার ওপর অচেনা পরিবেশ। নানা আশঙ্কায় বারবার ওর ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। সকালবেলায় ও ঘুম থেকে ওঠে গায়ে ম্যাজম্যাজানি নিয়ে। স্নান সেরে বেরিয়ে আসার পর সেই অস্বস্তিটা উধাও হল বটে, কিন্তু ডাইনিং টেবিলে, ভিজে চুলে, পাখার তলায় বসার পর ওর শীত শীত করতে লাগল। প্রায় পাঁচ দিন হল ও ঘলঘলিয়া থেকে পালিয়ে এসেছে। একেকটা দিন একেক ভাবে কেটেছে। তবে মাসির বাড়িতে অমলা ওকে যতটা ভয় দেখিয়েছিল, তার কণামাত্র ওকে মুখোমুখি হতে হয়নি। বিশেষ করে, বসিরহাটে সায়নদের বাড়িতে ঢোকার পর থেকে রোশনি অনেকটাই নিশ্চিন্ত। ওর বিশ্বাস জন্মে গেছে, আর যা-ই করুক সায়ন ওর কোনও ক্ষতি করবে না।

কাল রাতে ডিনারের পর ভেতরের ঘরে রোশনি যখন শোওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন সায়ন বলেছিল, 'ভয় লাগলে, তুমি নীল লাইটটা জ্বালিয়ে রাখতে পারো। আমি পাশের ঘরে আছি। দরকার হলে ডেকো। আর হ্যাঁ শোনো, ভেতর থেকে ছিটকিনিটা দিয়ে দাও।'

কৃতজ্ঞতায় তখন রোশনির মনটা ভরে গেছিল। সায়নের প্রতি বিশ্বাসে ও ছিটকিনি না দিয়েই শুয়ে পড়েছিল। অনেক রাতে হঠাৎ দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে ও[illegible] [illegible]পে ওঠে। তার পর দরজাটা হাট করে খুলে যায়। চাদরের ফাঁক দিয়ে ও দেখে, দোরগোড়ায় সায়ন দাঁড়িয়ে। তখন ওর অমলার কথা মনে পড়ে যায়। অমলা তা হলে ঠিকই বলেছিল। ইন্ডিয়ান ছেলেরা ভালো না। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। সুযোগ পেলেই টেনে নিয়ে যাবে বিছানায়। (চ) সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে রোশনি দমবন্ধ করে তখন শুয়েছিল। দরজায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সায়ন ঘরে ঢুকে আসে। তার পর ফ্রিজ খুলে, জলের বোতল নিয়ে, ফের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ডাইনিং টেবিলে বসে রোশনি আফশোশ করতে লাগল, সায়নের সঙ্গে মন খুলে ও কথা বলতে পারছে না বলে। কথা বলতে পারলে নিজে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ত না। কাল সন্ধেবেলায় যখন সায়ন ঘরে ফিরল, তখন ওর মুখটা খুব কালো লাগছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ও গুম হয়ে বসেছিল টিভির সামনে। রোশনি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, টিভির পর্দার দিকে সায়নের মন নেই। বারবার ও চ্যানেল সার্ফ করছে। একটা সময় সোফা ছেড়ে উঠে সায়ন বাথরুমে ঢুকেছিল। স্নান সেরে ফেরার পর ওকে স্বাভাবিক লাগে। তাতে রোশনির ধারণা হয়, সায়ন যেখানে গিয়েছিল, সেখানে এমন কিছু ঘটেছে, যা ও আশা করেনি। ওর ইচ্ছে করছিল সব জানার। কিন্তু ও নিজেকে দমিয়ে রেখেছিল। বসিরহাটে রোশনি ভেবেছিল, ছেলেটার আপনজন বলতে কেউ নেই। কিন্তু পরে দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখে ও জানতে পারে, মা আছে। মা আর ছেলের চেহারার খুব মিল। এখানে আসার পর ছবিটা দেখিয়ে রোশনি ইঙ্গিতে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার মা কোথায়? কিন্তু প্রশ্নটা সায়ন ঠিক বুঝতে পারেনি। যাই হোক, কয়েকটা দিন কাটিয়ে রোশনি বুঝতে পারছে, ওকে নিয়ে সায়ন খুব অস্বস্তির মধ্যে আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। একটা অপরিচিত মেয়ে, যার প্রতি ওর কোনও আগ্রহও নেই, তাকে কাঁধে করে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এক ছাদের তলায় রাত কাটাচ্ছে। ওর বাড়িতে জানাজানি হলে তো বদনাম হয়ে যাবে। না, এই পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। রোশনি ঠিক করল, খুব তাড়াতাড়ি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে। রঞ্জনকে খুঁজে নেওয়ার কাজটা, দরকার হলে ও-ই করবে।

টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছে সায়ন। ডিশ উলটে রোশনি দেখল টোস্ট, কলা আর অমলেট। টোস্ট মুখে দেওয়ার পরই ওর বিস্বাদ লাগল। আর খাবে কী না যখন ভাবছে, ঠিক তখনই ডোর বেলের শব্দ। উঠে গিয়ে লুকিং গ্লাস দিয়ে রোশনি দেখল, ওপরতলার মোটামতো সেই মহিলা। হাসিখুশি তনিমা বউদি। কাল সন্ধেবেলায় এসে যিনি আড্ডা মারার চেষ্টা করেছিলেন। সঙ্গে আর একটা মেয়ে। তনিমা বউদির হাতে একটা বাটি। সর্বনাশ, ভদ্রমহিলা আসার আর সময় পেলেন না? এখন ভিজে চুলটা ও লুকোবে কী করে? ভদ্রমহিলা যাতে বুঝতে না পারেন ও মেয়ে, সেই কারণে চট করে গার্ডার দিয়ে ও পনিটেল করে নিল। তার পর টেবিলের ওপর রাখা গোঁফটা লাগিয়ে, দরজা খুলে বলল, আসুন। (চা)

ঘরে ঢুকেই মুখে হাসি ছড়িয়ে তনিমা বউদি বললেন, 'রোশনভাই, সানু নেই?'

রোশনি ঘাড় নাড়ল, নেই। ও বুঝতে পারল না, তনিমা বউদি ওকে রোশন ভাই বলে ডাকলেন কেন?

'কী ভালো, কী ভালো। যাক গে যাক, তুমি তো আছ। তা হলেই চলবে। তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করাতে নিয়ে এলাম। এ হচ্ছে কেকা। চারতলায় থাকে।'

কেকা হাত বাড়িয়ে বলল, 'হাই।'

রোশনি ওকে চেয়ার এগিয়ে দিল। মেয়েটার পোশাক দেখে অবশ্য ওর ভ্রূ কুঁচকে

উঠল। পরনে শর্টস আর একটা শ্লিভলেস গেঞ্জি। এক দু'টো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। এই ভাবে কেউ কারও বাড়িতে আসে নাকি? কে জানে, হয়তো এটাই কলকাতার মেয়েদের রেওয়াজ। কেকা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে একটু রাগ রাগ ভাব। তনিমাবউদিকে বলল, ' হাই বলল না, এ কোন গাঁইয়া ভূতের কাছে তুমি আমায় নিয়ে এলে আন্টি?' রোশনি অবশ্য বুঝতে পারল না, কেকা কী বলল।

হাতে ধরা বাটিটা টেবিলের ওপর রেখে তনিমাবউদি বললেন, 'তোমার জন্য একবাটি পায়েস নিয়ে এলাম। খেয়ে দ্যাখো তো কেমন।'

তনিমাবউদির ভাবভঙ্গি দেখে রোশনি কথাটা বুঝতে পারল। চামচে করে খানিকটা পায়েস মুখে নিয়ে ও বলল, 'খুব সুন্দর। এর সঙ্গে খানিকটা এলাচ আর কাজুবাদাম দিলে আরও ভালো লাগত।' (চ)

কেকা বলল, 'ও আন্টি, বাঙালটা চাইনিজ ভাষায় কথা বলছে কেন গো?'

তনিমাবউদি বললেন, 'আমিও কি ছাই তা জানি? তোকে বললাম না, মাথা খারাপ। সানু বলেছিল, এই সময়টায় নাকি ও এভাবেই কথা বলে।'

'তালে তোমার কথা বুঝল কী করে আন্টি?'

'আমি তো বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি। আমার কথা যে কেউ বুঝবে।'

তনিমাবউদিকে হিহি হাসতে দেখে রোশনি মুচকি হাসল। ওরা দু'জন কী বলছে, তা ও বুঝতে পারছে না বটে, কিন্তু তনিমাবউদিকে ওর ভালো লাগছে। ঠিক মায়ের মতো। একটু আগে টোস্ট মুখে দিয়ে কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকেছিল। পায়েসটা খেতে কিন্তু ওর ভালো লাগল। চট্টগ্রামে মা প্রায়ই ওকে পায়েস করে দিত। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর আর কেউ ওকে পায়েস করে খাওয়ায়নি। মায়ের কথা মনে পড়তেই রোশনির মনটা ভারী হয়ে উঠল। হঠাৎ মায়ের চেহারাটা ওর চোখের সামনে একবার ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল।

'কী মিষ্টি ছেলেটাকে দেখতে, তাই না রে কেকা?'

'কার মতো দেখতে বলো তো আন্টি? সুরেশ লাম্বা?'

'সে মিনসেটা আবার কে রে?'

'মাই গড, সুরেশ লাম্বাকে চেনো না? টপ মডেল। বোম্বেতে থাকে। খুব সেক্সি।'

'আমাদের এই ছেলেটাও কম সেক্সি নাকি। ঠোঁট দু'টো দেখ, ঠিক কমলালেবুর কোয়ার মতো, তাই না? কী করে অত লাল হল রে কেকা? ছেলেটা লিপস্টিক দেয় না কি? পাগল ছাগল মানুষ, দিতেও পারে।'

'একবার চুমু খেয়ে দেখব নাকি আন্টি? লিপস্টিক তালে উঠে আসবে।'

'এখন না, এখন না। কাছাকাছি যাস না। সানু ডাক্তার দেখানোর জন্য ওকে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার কী বলে, দেখা যাক। তার পর ও সব খাস। বাপের পয়সাকড়ি আছে। ছেলেটাকে ধরে রাখ। মাঝেমধ্যে গল্প করতে আসিস। তোর একটা হিল্লে হয়ে যাবে।'

'বিয়ের পর কিন্তু আমি বাংলাদেশে গিয়ে থাকব না আন্টি। তোমায় আগেই বলে রাখলাম।'

'দূর বোকা। বাংলাদেশ যাবি কেন? তার আগেই বশ করে ফেলবি। এমন প্যাঁচে জড়াবি, যাতে আর খুলতে না পারে। যাক গে যাক, এখন চল। পরে একা আসবি।'

তনিমাবউদি কেকার সঙ্গে কথা বলছে। একবর্ণও বুঝতে পারছে না বটে রোশনি, তবে কেন জানে না ওর মনে হচ্ছে, দু'জনে ওকে নিয়েই কথা বলছে। বউদি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তার পর হাতের ইশারায় ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমি যাই কেমন? কেকা পরে আসবে।'

তনিমাবউদি আর কেকা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে রোশনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আর কতদিন যে ওকে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, কে জানে? গোঁফ খুলে, ভিজে চুল এলিয়ে সোফায় গিয়ে বসতেই ওর যেন কেমন শীত শীত করতে লাগল। মাথাটাও টিপটিপ করছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিলে ভালো হত। কিন্তু রোশনির উঠতেই ইচ্ছে করল না। চুপ করে ও বসে রইল। সায়ন ইশারায় বলে গেছে, দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে। তার মানে, ও কখন ফিরবে, তার কোনও ঠিক নেই। রুনুমাসির রান্না করা খাবার ফ্রিজে আছে। শুধু গরম করে নিতে হবে। রোশনি নিজে খুব ভালো রাঁধে। ওর ইচ্ছে করছে, একদিন ভালো করে রেঁধে সায়নকে খাওয়াবে। কিন্তু মায়া বাড়িয়ে লাভ কী? রঞ্জনের ওখানে চলে গেলে না হয়, সায়নকে একদিন নেমতন্ন করবে।

সোফায় বসে বসেই রোশনি অনুভব করল, ওর জ্বর আসছে। ইস, এই সময় যদি রঞ্জন ওর কাছে থাকত, তা হলে ওর মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিত। কপালে হাত বুলিয়ে ওর সব অস্বস্তি দূর করে দিত। রঞ্জনের কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ কপালে কার হাতের স্পর্শ অনুভব করল রোশনি। খুব প্রিয়জনের সেই স্পর্শ। ও দ্রুত বুঝতে পারল, রঞ্জন। এ কী? ও কোথা থেকে এল? কে ওকে দরজা খুলে দিল? ধড়মড় করে রোশনি উঠে বসতে যাচ্ছে, সেই সময় রঞ্জন নরম গলায় বলল, 'থাক, থাক, এখন উঠতে হবে না। আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তুমি চোখ বন্ধ করে থাকো।' (চ)

চোখ বন্ধ করে রেখেই রোশনি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখন এলে রঞ্জন?' (চ)

'এই তো একটুখানি আগে।' (চ)

'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। তুমি কেন টাকিতে এলে না? জানো, পুলিশ আমাকে ধরে ফেলত?'

'রাগ কোরো না সোনা। মহালয়ার দিন ক্লাবে হঠাৎ গেট টুগেদার হল। আমাকে ছুটি দিল না।'

'ফোনে সে কথা আমাকে জানালে না কেন?' (চ)

'কী করে জানাব? যতবারই তোমাদের মোবাইলে ফোন করেছি, ততবারই বলছে,

সুইচড অফ। তুমিই বা আমাকে ফোন করলে না কেন?' (চ)

'করেছি। যতবার করেছি ততবারই লোকটা বলেছিল রং নাম্বার।' (চ)

'তাই নাকি সোনা। দেখেছ, আমাদের ক্লাবের লোকজন কী রকম হিংসুটে? এই চাকরি আর বেশিদিন আমি করব না। তুমি এসে গেছ। এখন এমন একটা ক্লাবে চাকরি নেব, যেখানে তুমি গাইতে আর আমি বাজাতে পারব।' (চ)

'তুমি জানলে কী করে, আমি লেক গার্ডেন্সে আছি?' (চ)

'ভালোবাসলে সবকিছুই জানা যায় রোশনি। ভগবানই মিলিয়ে দেয়। এই ক'দিন আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি, তা ঈশ্বরই জানেন। যাক, ও সব কথা। শুনে তোমার লাভ নেই। হ্যাঁ গো, এখানে আসার আগে আমার কথা কি কাউকে বলে এসেছ? তোমার বাবা কি আমার কথা জানেন?' (চ)

'বাবাকে আমি কিছু বলিনি। পিসির মুখে হয়তো তোমার কথা শুনে থাকবে। এখানে আসার আগে অমলাকে শুধু বলে এসেছি। ও কাউকে কিছু বলবে না।' (চ)

'ভয় পেয়ো না রোশনি। আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।' (চ)

'তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাবে রঞ্জন?' (চ)

'খুব বেশি দূরে নয়। পার্ক সার্কাস বলে একটা জায়গায়। ক্লাবের পিছনে, তোমার জন্য খুব সুন্দর একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। দেখো, তোমার খুব ভালো লাগবে, ওখানে থাকতে।' (চ)

'আমাকে এখনই নিয়ে চলো না সেখানে।' (চ)

'এখন না সোনা। সায়নকে না বলে তোমার চলে যাওয়া উচিত হবে না।' (চ)

'জানো, সায়নকে তোমার ঠিকানাটা আমি দিয়েছি।' (চ)

'দিয়ে ভালো করোনি সোনা। পুলিশ যদি কোনওদিন ওর কাছে পৌঁছে যায়, তা হলে তোমার খোঁজ পেতে ওদের অসুবিধে হবে না। তার আগেই আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। আমি ভাবছি, এখানে কালীঘাটের মন্দিরেই না হয় বিয়েটা সেরে ফেলব। তার পর তোমাকে নিয়ে হানিমুনে যাব মুম্বাইয়ে। তোমার কী মনে হয় সোনা, ভালো হবে না?' (চ)

কপালের টিপটিপানি উধাও। রঞ্জনের কথা শুনে সুখের সাগরে ভাসতে শুরু করল রোশনি। একটু পরে চোখ খুলে রঞ্জনকে খুঁজতে লাগল ও। কোথাও দেখতে পেল না। দরজাটা আগের মতোই বন্ধ। এ কী, তা হলে কি এতক্ষণ ও স্বপ্ন দেখছিল? শরীরটা কেমন যেন করছে। শোওয়ার ঘরের বিছানায় যাওয়ার জন্য সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই, ওর মাথাটা টলে গেল। ধপ করে ও সোফায় বসে পড়ল।

তিনতলার ছাদে এসে দাঁড়াল সায়ন। এখান থেকেই লাফ দিয়ে ওকে নীচে গদির ওপর পড়তে হবে। একটু আগে ফাইট মাস্টার জাম্বো ওকে সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দিয়েছে। প্রসেনজিতের সঙ্গে রাজেশ শর্মার মারপিটের দৃশ্যটা সম্ভবত আগে তোলা হয়ে গেছিল। পুলিশ ইনসপেক্টর প্রসেনজিৎ ভিলেন রাজেশ শর্মাকে ধরার জন্য তিনতলা থেকে লাফ দিচ্ছেন, এখন এই দৃশ্যটা তোলা হবে। সায়নকে প্রসেনজিতের ডামি সাজতে হয়েছে। ওর গায়ে এখন পুলিশের খাকি পোশাক। প্রসেনজিতের সঙ্গে ওর হাইটের বেশ তফাত। তা সত্ত্বেও, জাম্বো রাজি হয়ে গেছে। ডিরেক্টর হরনাথ চক্রবর্তী চাইছেন, যাতে একবারেই শট ও কে হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করতে। সেই কারণে নীচে একাধিক ক্যামেরা বসিয়েছেন। দৃশ্যটা ছবিতে অবশ্য অন্যভাবে দেখানো হবে। তিনতলার ছাদ থেকে, সায়ন যেন লাফিয়ে পড়ছে নীচে সুইমিং পুলে।

ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে সায়ন দেখল, ক্যামেরার পজিশন নিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন ডিরেক্টর হরনাথ চক্রবর্তী। তাঁর হাতে মাইক। ইউনিটের অন্য সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। কাছেই একটা রঙিন ছাতার নীচে চেয়ারে বসে আছেন প্রসেনজিৎ। তাঁকে ঘিরে ছোট্ট ভিড়। তিতাসকেও ওই ভিড়ের মাঝে দেখতে পেল সায়ন। ওকে দেখেই মনের ভেতরে একটা জ্বালা অনুভব করল ও। রিয়েল লাইফের হিরোর পিছনে তিতাস দৌড়াচ্ছে। ওকে আজ দেখিয়ে দিতে হবে, রিয়েল লাইফের হিরো কে? সত্যি কথা বলতে কী, তিতাসকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ও আজ স্টান্টম্যানের এই বিপজ্জনক কাজটা যেতে নিয়েছে।

বেলা সাড়ে ন'টার সময় ও যখন আজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে পৌঁছোয়, তখন ফাইট মাস্টার জাম্বো মাথায় হাত দিয়ে অফিস-ঘরে বসে। ঘরের বাইরে স্টান্টম্যানের জটলা। ওরা জানিয়ে দিয়েছে, কেউ কাজ করবে না। জাম্বোকে আলাদা ডেকে, তখনই সায়ন নিজের ইচ্ছেটা জানায়। প্রথম দিকে কিছুতেই জাম্বো রাজি হয়নি। ওর নিজস্ব হিন্দি-

ইংরাজিতে সায়নকে বোঝানোর চেষ্টা করে, 'নো নো মিস্টার। থার্টি মিটার্স জাম্প রিস্কি। ইয়ে মজাক নেহি হ্যায়।' কিন্তু পরে সায়নের বাঁচ দেখে ও রাজি হয়ে যায়, 'ঠিক হ্যায়। ইউ ডু। লেকিন মেরা রিস্ক নেহি। ইউ সাইন পেপার। দেন জাম্প।'

রীতিমতো কাগজপত্তরে সই করিয়ে নিয়েছে জাম্বো। কোনও রকম চোট পেলে, চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে না। তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সায়ন ভাবল, সত্যি ও যদি চোট পায়, তা হলে রোশনির কাজটা আর করতেই পারবে না। বসিরহাট থেকে মা দৌড়ে আসবে। রোশনির কথা সবাই জেনে যাবে। বেচারা রোশনি! আসলে আজ টালিগঞ্জে ওর আসার কথাই ছিল না। কাল প্রায় সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। সকাল থেকে শরীরটা একটু ম্যাজম্যাজ করছে। নেহাত তিতাসের কথা সব শুনে মা সকালবেলায় বলল, 'তুই আরেকবার চেষ্টা কর বাবা। তোর অরূপকাকা বোধহয় বাঁচবে না। ওঁর মুখ চেয়ে তুই ফের তিতাসের কাছে যা। যে করেই হোক, তুই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।'

মা বসিরহাটে ফিরে এসেছে। সকাল বিকাল বিভাকাকিমার সঙ্গে নার্সিংহোমে দৌড়াচ্ছে। মা আসলে কলকাতার পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন না। মনে করছে, তিতাস বোধহয় আগের মতোই রয়েছে। কিন্তু মেয়েটা যে এই কয়েকটা দিনের মধ্যেই আমূল বদলে গেছে, অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে, সায়ন নিজে তা না দেখলে বিশ্বাস করত না। গ্ল্যামার জগতের জল হাওয়াই বোধহয় অন্যরকম। মানুষ এত স্বার্থপর হয়ে যায়, তখন সমাজ-সংস্কারের কথা আর মনে রাখে না। শুধু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার কথাই ভাবে। এই তিতাস এখন বিশ্বাসও করতে চাইছে না, অরূপকাকা সত্যি সত্যি অসুস্থ। অথচ তিতাসের সামান্য সামান্য আবদার মেটাতে অরূপকাকা একটা দিন কী না করেছে?

ছাদের ওপর চেয়ারে বসে আছে জাম্বো। ওকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'ইউ কনসেনট্রেট। ডরনা মাত। কেয়া ঠিক হ্যায় না?'

আরেকবার নীচের দিকে তাকিয়ে সায়ন ঘাড় নাড়ল। না, ও ভয় পায়নি। ও ভয় পাওয়ার ছেলেই না। যতক্ষণ সামনে তিতাস থাকবে, ততক্ষণ বুকের জ্বালাটা ওকে ভয় পেতে দেবে না। প্রথমবারের লাফটা যদি ঠিক না হয়, তা হলে ও দ্বিতীয়বার দিতেও রাজি। দ্বিতীয়বার কেন, একশো বার লাফ দিতেও ও রাজি। শুধু মনটা খিচখিচ করছে রোশনির জন্য। ওর যদি কিছু হয়, তা হলে রোশনির কী হবে?

কাল সন্ধেবেলায় ও যখন লেক গার্ডেন্সে ফেরে, তখন একেবারে বিধ্বস্ত। টালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ও গিয়েছিল শেকসপিয়র সরণিতে। রঞ্জন তালুকদারের সঙ্গে দেখা করতে। না গেলেই বোধহয় ভালো করত। রঞ্জন যে নাইট ক্লাবে চাকরি করে, সেই ক্লাব সম্পর্কে পাশের একটা দোকানে জানতে চেয়েছিল। দেখল, লোকটা কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, 'হবে কাছাকাছি কোথাও। ঠিক জানি না।'

হাল না ছেড়ে তবুও সায়ন শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছিল ক্যালকাটা নাইট ক্লাব। পুরোনো আমলের একটা বাড়ি। সরু অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়। তবে

দোতালাটা খুব সাজানো গোছানো। একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে রিসেপশনে বসেছিল। সে পালটা জানতে চাইল, 'রঞ্জন...মানে এখানে যে গিটার বাজায়, না কি ওয়েস্টার্ন গায়? দু'জনকেই আপনি রাত আটটার আগে পাবেন না। কেন, ওদের সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

দরকারটা খুলে মেয়েটাকে বলা যাবে না। মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল সায়ন। রোশনির রঞ্জন কী করে, তা ওর জানা নেই। জিজ্ঞেস করেও আসেনি। তাই ও বলেছিল, 'আমি যার খোঁজে এসেছি সে রঞ্জন তালুকদার। ওর এক পরিচিত আমাকে খোঁজ করতে পাঠিয়েছে।'

কথাটা ও শেষ করার আগেই, পালোয়ান গোছের একটা লোক হাজির হয়েছিল। খুব রুক্ষ স্বরে লোকটা বলেছিল, 'আপ আভি যাইয়ে। ইঁহা উসি নামসে কিসিকো নেহি মিলেগা।'

একেই মেজাজ খারাপ তিতাসের জন্য, তার ওপর লোকটার ওই রকম ব্যবহার, মাথা চট করে গরম হয়ে গেছিল সায়নের। টেনে একটা লাথি মারতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু রঞ্জনের কথা ভেবে ও নিজেকে সামলে নেয়। ফের হয়তো এখানে আসতে হতে পারে। সেই রাস্তাটা যেন বন্ধ হয়ে না যায়। লোকটা ওকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এল রাস্তা পর্যন্ত। পার্ক সার্কাস সাতমাথার মোড়ের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সায়ন তখন ভেবেছিল, রঞ্জন লোকটাই বা কেমন? এইসব গুন্ডা ধরনের লোকের মাঝে ও কী কাজ করে? আসলে রোশনির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যে কী, তা এখনও সায়ন বুঝতে পারেনি। বুঝবে কী করে? ভালো করে কথাই যে বলতে পারছেনা না, ওই মেয়েটার সঙ্গে।

কাল রাতে রোশনির কাছ থেকে সব জানবে, সায়ন তা ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু রোশনি ঘুমঘুম চোখে দরজা খুলে দেওয়ার পর সেই যে বিছানায় শুল, আর কাছেই এল না। এমনিতেই সায়নের কথা বলতে ভালো লাগছিল না। খানিকক্ষণ টিভি দেখে, মাকে ফোন করে, তিতাসের কথা বলে। রোশনিকে ডাকার জন্য পাশের ঘরে ঢুকতেই ও দেখেছিল, তখনও রোশনি শুয়ে আছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সায়ন চোখ ফেরাতে পারছিল না। কী নিষ্পাপ মুখ। দ্রুত তিতাসের মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। উগ্র মেক আপে আর সাজসজ্জায় তিতাস কেমন যেন হয়ে গেছে। মোহগ্রস্তের মতো সায়ন তখন বিছানার কাছে চলে আসে। ওর তখন ইচ্ছে করছিল, দু'হাতে রোশনির মুখটা তুলে ধরে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে।

ইচ্ছেটা কোনও রকমে দমন করে, ও বিছানায় এসে বসে। রোশনির ঘুম ভাঙাতে ও চায়নি।

মনে মনে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত সায়ন হেরে যায়। বার কয়েক রোশনির নাম ধরে মৃদুস্বরে ও ডাকতে থাকে।

তা সত্ত্বেও ওকে উঠে বসতে না দেখে, সায়ন ওর কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে।

আগুনের মতো গরম। ও, জ্বরের জন্য তা হলে রোশনি আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে? ছিটকে উঠে ও তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে থার্মোমিটার বের করে আনে। বালিশে কাত হয়ে থাকা মুখটা সোজা করে চাপ দিয়ে হাঁ করিয়ে থার্মোমিটারটা মুখে গুঁজিয়ে দেয়। মিনিট দুয়েক পর জ্বর দেখে ওর মাথা ঘুরে যায়। একশো চার। একজন ডাক্তার ডেকে আনা উচিত। জীবনে কখনও সায়ন এই পরিস্থিতিতে পড়েনি। কী করবে, ও বুঝতে পারল না। মশার কামড়ে ভয়ঙ্কর সব জ্বর হচ্ছে চারদিকে। ডেঙ্গি, চিকনগুনিয়া। সে রকম যদি রোশনির কিছু হয়, তা হলে ওর দায়িত্ব নেবে কে?

'সায়নভাই, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

নীচ থেকে হঠাৎ মাইকে হরনাথ চক্রবর্তীর গলা শুনতে পেল সায়ন। রোশনির কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে, হাত নেড়ে ও বোঝাল, শুনতে পেয়েছে।

'এবার আমরা টেকিংয়ে যাব। আমি অ্যাকশন বলার পর ঝাঁপ দেবেন। বুঝতে পারলেন? তার আগে নয়।'

সায়ন ফের হাত তুলে জানাল, ঠিক আছে। ছাদ থেকে ও দেখল, নীচে ফ্লোরের সব ক'টা লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আপনাকে কীভাবে দৌড়ে আসতে হবে, জাম্বোর কাছ থেকে আর একবার জেনে নিন। ও বলে দেবে, ঠিক কোন পয়েন্ট থেকে আপনাকে ঝাঁপটা দিতে হবে। দেখুন, সেই পয়েন্টে একটা দাগ দেওয়া আছে। পিস্তলটা যেন হাতে ধরা থাকে। এটা একটু খেয়াল রাখবেন, কেমন? না হলে আপনি কিন্তু ক্যামেরার বাইরে চলে যাবেন।'

ছাদে উঠে জাম্বো আগেই এ সব বলে দিয়েছে। লোকটা নাকি তামিল ছবিতে রজনীকান্তের ফাইট মাস্টার ছিল। একটু আগে ওর নিজস্ব হিন্দি-ইংরাজি ঘরানায়, এই কথাগুলো সায়নকে শুনিয়েছে। কথার মধ্যে খানিকটা ক্ষোভের ছোঁয়া ছিল তখন। লোকটা ঝাঁপ দেওয়ার কায়দাটাই শুধু শেখায়নি। ল্যান্ডিংয়ের সময় পা দু'টোকে কীভাবে ফেলতে হবে, সেটাও পইপই করে বুঝিয়েছে। নীচের দিকে তাকিয়ে সায়ন শেষবারের মতো গদিটাকে দেখে নিল। একটু দূরেই গাছতলায় রাগি রাগি মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্টান্টম্যানরা। তাদের উদ্দেশে সায়ন মনে মনে বলল, 'কিছু মনে কোরো না ভাই। তোমাদের ভাত মারতে আসিনি। এই আমার প্রথম আর শেষ ঝাঁপ।' সত্যি সত্যিই তিতাসকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও ঝাঁপটা দিচ্ছে। কিন্তু ঠিকভাবে ল্যান্ডিংটা ওকে করতে হবে রোশনির জন্য।

হরনাথের মুখে অ্যাকশন কথাটা শোনার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে, সায়নের মনে পড়ল, রোশনির জন্য ডাক্তার খুঁজতে বেরিয়ে, কাল রাতেও ও অ্যাকশন কথা শুনেছিল। কথাটা মনে হতেই ওর হাসি পেল। লেক গার্ডেন্সে মাত্র একজন ডাক্তারকেই ও চেনে। দরজা বন্ধ করে সায়ন তখনই বাইরে বেরিয়ে রিকশা ধরেছিল। কয়েক মিনিট পর, চেম্বারের কাছাকাছি গিয়ে ও দেখে, রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তার বাড়ি চলে গেছেন। রিকশাওয়ালাটা তখন বলেছিল, 'লর্ডসের মোড়ে আর একজন ডাক্তারবাবু আছেন। ওর

কাছে চলুন।'

সায়ন ঘাড় নেড়েছিল। ঠিক চেম্বার নয়, বড় একটা ওষুধের দোকান। রিকশা থেকে নেমে খোঁজ করতেই একজন কর্মচারী বলল, 'ডাক্তারবাবু আছেন। তবে এত রাতে আউটসাইড কল-এ যাবেন না।'

শুনে মাথা গরম হয়ে গেছিল সায়নের। প্রচণ্ড রেগে ও বলেছিল, 'না গেলে ওঁকে তুলে নিয়ে যাব।'

লোকটার সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়েছিল সায়নের। দোকানের সামনে কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছিল। একটু পরেই ভেতর থেকে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। বয়স্ক ভারী মানুষ, কেমন যেন পাগলাটে চেহারা। মাথায় কাঁচা পাকা এলোমেলো চুল। নাকের ডগায় চশমা। গায়ে সাদা অ্যাপ্রন। গলায় স্টেথিসকোপ। ডাক্তারবাবু খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার, এত উত্তেজনা কিসের?'

সায়ন বলল, 'আমার বাড়িতে একজনের মারাত্মক জ্বর। আপনাকে যেতে হবে।'

'মাস্তানিটা তা হলে তুমিই করছিলে? দেখি, তুমি কত বড় মস্তান। আগে আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ো। যদি আমাকে হারাতে পারো, তা হলে তোমার সঙ্গে যাব। নইলে নয়।'

সায়ন হাসবে কী কাঁদবে, বুঝতে পারছিল না। ডাক্তারবাবু কিন্তু সিরিয়াস। ততক্ষণে অ্যাপ্রন খুলে ফেলেছেন। কাউন্টারে ডান হাতের কনুই সেট করে রেখে, সায়নকে ডাকলেন, 'কাম অন, বিট মি ইন আর্ম রেসলিং।'

রাজি না হয়ে সায়নের তখন উপায় নেই। বসিরহাটে প্রায়ই দাদানের সঙ্গে ওকে পাঞ্জা লড়তে হয়। দাদান আগে জিতত। ইদানীং পারে না। কাউন্টারে কনুই রেখে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পাঞ্জা মেলাতেই ও অবশ্য বুঝতে পারল, হাত নয়, হাতুড়ি। ডাক্তারবাবু তখন বললেন, 'আমি অ্যাকশন বলব। তার পরই শুরু। ঠিক আছে?' সায়ন ঘাড় নেড়েছিল। কিন্তু 'অ্যাকশন' বলার পর মাত্র দশ সেকেন্ড। তার মধ্যেই ও হেরে গিয়েছিল। গায়ে ফের অ্যাপ্রন চাপিয়ে ডাক্তারবাবু তখন বলেছিলেন, 'জ্বর কত? একশো তিন না, চার?'

'একশো চার।'

'ভাইরাল ফিভার। ভয়ের কিছু নেই। এ দিকটায় খুব হচ্ছে। আজই পাঁচ ছ'টা এমন কেস পেয়েছি। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আগে বলো, পেশেন্টের বয়স কত?'

'কুড়ি-একুশ।'

সাদা কাগজে খসখস করে প্রেসক্রিপশন লেখার ফাঁকে ডাক্তারবাবু দোকানের লোকটাকে বললেন, 'সামন্ত এই দুই ধরনের ক্যাপসুল ওকে দিয়ে দাও। আর সঙ্গে আমার মোবাইল নাম্বারটাও, যাতে কাল সকালে আমাকে খবরটা দিতে পারে।'

'আপনি গেলে খুব ভালো হত আঙ্কল।'

'তুমি জিতলে নিশ্চয়ই যেতাম। যাক সে কথা, রাতে ওষুধ খাইয়ে পেশেন্টটাকে কিন্তু জলপটি দিও।'

'থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল। আপনার ফিজ কত?'

'শোনো, পাঞ্জা লড়ায় যার সঙ্গে জিতি, তার কাছে থেকে আমি ফিজ-টিজ কিছু নিই না। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। পেশেন্ট নিশ্চয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

বাড়ি ফিরে দু'টো ক্যাপসুল সঙ্গেসঙ্গে ও রোশনিকে খাইয়ে দিয়েছিল। ক্যাপসুল খাওয়ানোর সময় রোশনিকে ও তুলে বসায়। ঘুমে আচ্ছন্ন রোশনি তখন ওকে জড়িয়ে ধরে। বুকে মাথা এলিয়ে দেয়। জীবনে কখনও ওই পরিস্থিতিতে পড়েনি সায়ন। একটা যুবতী মেয়ে ওর শরীরের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। তার গরম শ্বাস হাতের ওপর পড়ছে। সেই তাপ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। অস্বস্তিতে রোশনিকে ও শুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু রোশনি ওকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে। প্রায় সারা রাত ঠায় ওর বিছানার পাশে বসেছিল সায়ন। জলপটি দিয়েছে। রোশনির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সায়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে রঞ্জনের কাছে পৌঁছে দেবে। ভোরবেলায় চেয়ারে বসেই ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে, ও দেখে রোশনি বিছানায় নেই। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বেরোতেই সায়নের চোখে পড়েছিল, স্নান সেরে রোশনি টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। মুখটা সামান্য ফ্যাকাশে। ওর দিকে চোখ যেতেই রোশনি মৃদু হেসেছিল।

...'সায়নভাই, রেডি তো?'

নীচ থেকে ফের হরনাথবাবুর গলা শুনে সায়ন হাত নাড়ল।

'রোল', 'অ্যাকশন'।

শোনার পরই, রোশনির মুখটা চোখের সামনে রেখেই, সায়ন ছাদের কার্নিশ ধরে দৌড়োতে লাগল। জাম্বো একটা জায়গায় সাদা খড়ির দাগ দিয়ে রেখেছেন। ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে, পিস্তলটা হাতে ধরে ও নীচের দিকে লাফ মারল। পাঁচ ছয় সেকেন্ড হবে, নাকি তার থেকে সামান্য বেশি? নরম গদির ওপর দুটো পা ফেলতেই সায়ন ফের খানিকটা শূন্যে উঠে গেল। আর তখন ও হাততালির শব্দ শুনতে পেল। বোধশক্তি ফিরে পাওয়ার পর ও দেখল, সারা ইউনিট হাততালি দিচ্ছে। এমন কী, প্রসেনজিৎও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। গদি থেকে নেমে আসার পর হরনাথবাবু ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মনিটরে দেখলাম, পারফেক্ট শট। থ্যাঙ্ক ইউ সায়নভাই।'

ওকে দেখে প্রসেনজিৎ নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, 'এক্সেলেন্ট সায়ন। দেখে মনেই হল না, আগে তুমি কখনও স্টান্টম্যানের কাজ করোনি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আসলে আমি কিন্তু এ কাজ করতে আসিনি। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।'

'আমি জানি। কস্তুরী আমাকে সব বলেছে। কাল থেকে তিতাসকে আমি বোঝাচ্ছি। আমার কথা ও শুনছেই না। কী বলব, বলো।' কথাগুলো বলতে বলতেই ঘাড় ঘুড়িয়ে তিতাসের দিকে তাকালেন প্রসেনজিৎ। তারপর ওকে বললেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো। এই

সায়নরাই হচ্ছে রিয়েল লাইফের হিরো। একে যদি হাসব্যান্ড হিসাবে পাও, ধরে নেবে, তোমার কপাল ভালো। যাও, ভালো মেয়ের মতো এর হাত ধরে বাড়ি ফিরে যাও। তোমার মতো মেয়ের জন্য টালিগঞ্জ ঠিক জায়গা নয়।'

পরামর্শটা তিতাসের মাথায় ঢুকল বলে মনে হল না সায়নের। সেই অহংকারী মেয়েটা ওর মধ্যে ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ও বলল, 'কক্ষনও নয়। আপনি যা-ই বলুন বুম্বাদা, আমি কিন্তু আর বাড়ি ফিরছি না। প্লিজ, আপনি এই রিকোয়েস্টটা করবেন না।

প্রসেনজিৎ বললেন, 'জেদ কোরো না তিতাস। যা বলছি, তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

'সরি বুম্বাদা। আপনার কথা রাখতে পারলাম না।' কথাগুলো বলেই উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল তিতাস।

সেটা দেখে প্রসেনজিৎ একজনকে বললেন, 'যা তো, মেয়েটাকে ধরে আন। আমি মেক আপ ভ্যানে আছি। মেয়েটার ব্রেনওয়াশ করতে হবে। এসো সায়ন, যা বলার, তোমার সামনেই বলব।'

pathagar.net

সকালবেলায় অনু এসে হাজির। সায়ন তখন বসে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে। অনুকে দেখে ও একটু অবাকই হল। আজ তো রোববার নয়। কাজের দিনে সকালবেলায় সাধারণত অনু আসে না। ঘরে ঢুকেই ও বলল, 'কাঞ্চনদা নাকি ওর এক ভাইকে এনে তোমার এখানে রেখেছে। কই, আমি তো কোনও দিন ওর মুখে কোনও ভাইয়ের কথা শুনিনি।'

সায়ন বলল, 'খবরটা কে তোকে দিল রে?'

'আরে, লর্ডসের মোড়ে কাল অটো-র জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ তনিমাবউদির সঙ্গে দেখা, ফল কিনছিল। ওর মুখেই শুনলাম। চিটাগাং থেকে কাঞ্চনদা নাকি এসে গেছে? কই, আমাকে তো কিছু বলেনি?'

'তোকে বলবে কেন?' প্রসঙ্গটা বদলে দেওয়ার জন্য সায়ন পালটা প্রশ্ন করল।

শুনে একটু থতোমতো খেল অনু। 'না, মানে আমাকে বলেছিল, কালীপুজোর পর আসবে। তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'আমাকে লুকোস না অনু। তোদের রিলেশনশিপটা কোথায় গেছে, আমি সব জানি। বরদামেসো আর কমলামাসি আমার কাছে জানতে চাইছিল। খুব খারাপ লেগেছে, আমাকে তোরা কিছু বলিসনি।'

'সরি সানুদা। কাঞ্চন আমায় বলতে বারণ করেছিল। মা-বাবা জেনে গেছে?'

'ওরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? পুজোর সময় ফোনে এত ঘনঘন কথা বললে, জানতে পারবে না? যাক সে কথা, তোরা কি ঠিক করেছিস, বিয়ে করবি? এই তো কিছুদিন আগেও, কাঞ্চনকে বাঙাল বলে কত হাসি ঠাট্টা করতি। এখন ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস, কী ব্যাপার রে?'

'না গো। ছেলেটার মনটা খুব ভালো। শোনো না, মা-বাবার মতটা কী বুঝলে গো?'

'আমাকে বড় সার্টিফিকেট দিতে হবে কাঞ্চন সম্পর্কে। আর কী? তোরা দু'জন যদি

মেনল্যানড চায়নায় নিয়ে গিয়ে, ভালোমতো ট্রিট না দিস, তা হলে কিন্তু সার্টিফিকেটটা দেব না।'

'খাওয়াব, খাওয়াব। এ মাসের মাইনেটা পাই, তার পর। বাঙালটা আসছে কবে বলো তো?'

'যে কোনওদিন আসতে পারে। ভাইটাকে আমার কাছে গছিয়ে, ওর মাসি-মেসোকে নিয়ে হঠাৎ চিটাগাং বেড়াতে গেছে। এখানে এসেই কিন্তু ও নয়ডায় চলে যাবে।'

'ভাইটাকে নাকি খুব মিষ্টি মিষ্টি দেখতে? তনিমাবউদি বলছিল, দেখলেই নাকি আদর করতে ইচ্ছে করে। কেকার সঙ্গে নাকি ওর বিয়ে দেওয়ার কথাও তো বউদি ভাবছে। ভাইটা কোথায় গো? আজ তা হলে আলাপ করে যাই।'

'ভেতরের ঘরে। খুবই গম্ভীর টাইপের ছেলে। সাত কথায় একটা উত্তর দেয়। বেশি কথাবার্তা কেউ বললে খুব চটে যায়। দাঁড়া, ওকে ডেকে আনি।'

ভেতরের ঘরে গিয়ে সায়ন দেখল, রোশনি আগেভাগেই গোঁফ লাগিয়ে রেখেছে। পরনে জিনসের প্যান্ট আর শার্ট। দেখে বোঝার উপায় নেই, ও মেয়ে। ওকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সায়ন পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই হল কাঞ্চনের ভাই রোশন। আর এ আমার বোনের মতো অনু...অনুত্তমা। এই তোরা দু'জন গল্প কর। আমি লর্ডসের মোড়ে যাচ্ছি। ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে আসি।'

লর্ডসের মোড়ে ইদানীং অনেকগুলো খাবারের দোকান হয়েছে। একেকটা দোকানে একেক রকম ভালো খাবার পাওয়া যায়। অনু এলেই রাধাবল্লভি খাওয়ার বায়না ধরে। রাধাবল্লভি কেনার জন্য কল্পনা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তখনই ওর চোখে পড়ল, মোড়ের মাথায় প্রসেনজিতের বিশাল একটা কাট আউট। এই ক'দিন আগেও, সিনেমা আর্টিস্টদের কাট আউট দিয়ে বিজ্ঞাপন করার চল ছিল না কলকাতায়। ইদানীং হয়েছে। প্রসেনজিতের দিকে তাকিয়েই মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল সায়নের। আশ্চর্য একটা মানুষ। কাল দুপুরে তিতাসকে যেভাবে বোঝালেন, ওর আপনজনেরাও সেভাবে বোঝাত কী না সন্দেহ। এই মানুষটাকে এতদিন সায়ন সিনেমায় দুষ্টের দমন করতেই দেখেছে। এবার চোখের সামনে দেখল, ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষটা ভালো।

লাঞ্চ ব্রেক-এ নিজের মেক আপ ভ্যানে দু'জনকে নিয়ে বসেছিলেন প্রসেনজিৎ। তিতাসকে বোঝাতে লাগলেন, কেন ওর বসিরহাটে ফিরে যাওয়া উচিত। প্রথমদিকে মাথা নিচু করে তিতাস সব শুনছিল। তার পর ওর আসল চেহারাটা বেরিয়ে এল। সেই উদ্ধত, অহংকারী রূপটা। তর্কটা ও শুরু করল এই বলে, 'আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন, নায়িকা হওয়ার পোটেনসিয়ালিটি আমার আছে। এখন কেন উলটো কথা বলছেন?'

'কই, আমি উলটো কথা বললাম। তোমার যে পোটেনসিয়ালিটি নেই, এই কথাটা তো আমি কখনও বলিনি। বসিরহাটে তুমি যখন আমার কাছে গিয়েছিলে, তখন তোমার

ফ্যামিলি সম্পর্কে একগাদা মিথ্যে কথা বলেছিলে। বলেছিলে, তোমার বাবা নেই। নাচ-গান করে তুমি যা রোজগার করো, তাতে সংসার চালাতে পারো না। কেন বলেছিলে এ সব কথা? এই কারণেই তো তখন আমি বলেছিলাম, কলকাতায় এসো, তোমাকে যতটা সাহায্য করা সম্ভব, করব।'

'সত্যি কথা বললে, আপনি পাত্তা দিতেন?'

'সত্যিই দিতাম না। মিথ্যের জগতে বাস করতে করতে এখন কী মনে হয় জানো? সত্যির চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না। শোনো তিতাস, বুঝতে পারছি, গ্ল্যামার জগতে আলো দেখে তোমার চোখটা ধাঁধিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি হয়তো জানোও না, সেই আলোর নীচে কী মারাত্মক অন্ধকার। একবার সেই অন্ধকারে ঢুকে গেলে তুমি বেরিয়ে আসতে পারবে না তিতাস। সায়নের মুখে তোমার সম্পর্কে যা শুনলাম, তাতে তো মনে হল, তুমি একটা সুন্দর ফ্যামিলিতে বিলং করো। সায়নের মতো একটা ছেলে তোমাকে ভালোবাসে। এদের সবাইকে ছেড়ে একটা আনসার্টেনটির মধ্যে তুমি ঝাঁপ দিতে চাইছ কেন? ইচ্ছে করলে, বিয়ের পরও তো তুমি সিনেমা লাইনে আসতে পারো। সায়ন আপত্তি করতে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'থাক, সায়নের হয়ে আপনাকে আর সাফাই গাইতে হবে না। আপনাকে আমি বুঝে গেছি বুম্বাদা।'

'তুমি ভুল বুঝছ তিতাস।'

'মোটেই ভুল বুঝছি না। জানি, এরপর আপনি আমাকে হেল্প করবেন না। কিন্তু টালিগঞ্জে আপনি ছাড়াও অন্য অনেকে আছেন। আমি তাদের কাছেই যাব। চলি, আর আপনার কাছে আসছি না। আপনাকে দেখিয়ে দেব, আপনার হেল্প ছাড়াই আমি হিরোইন হতে পারি। বিনানি আপনার সম্পর্কে ঠিকই বলেছিল। এখানে যদি আপনি চান্স না দেন, তা হলে বিনানির সঙ্গে আমি মুম্বই চলে যাব।'

'কোন বিনানি তিতাস? প্রোডিউসার? তার খপ্পরে পড়েছ নাকি? প্লিজ, ও সব বাজে লোকের পাল্লায় পোড়ো না। লাইফ হেল হয়ে যাবে।'

খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি করে তিতাস রাগ করেই মেক আপ ভ্যান থেকে নেমে গেছিল। প্রসেনজিৎ হাল ছেড়ে দিয়ে শেষে বলেছিলেন, 'সরি সায়ন, পারলাম না। আই ফিল পিটি ফর দিস গার্ল। যাক সে কথা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। একটু আগে মনিটরে তোমার ছবি দেখলাম। ফেসটা খুব ফোটোজেনিক। বেঙ্কটেশ ফিল্মস নতুন নায়ক খুঁজছে ওদের ফোর্থকামিং ছবির জন্য। তুমি কি ইন্টারেস্টেড?'

সায়ন বলেছিল, 'না, বুম্বাদা। চাকরি নিয়ে আর ক'দিন পরই আমি চলে যাব সুরাতে। আমার অভিনয় হবে না।'

'যদি কোনও দিন মাইন্ড চেঞ্জ করো, তা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।'

'নিশ্চয়ই।'

pathagar.net

লর্ডসের মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রসেনজিতের কথাটা মনে পড়তেই সায়ন হাসল। কথাটা অনুকে বলতে হবে। আচ্ছা, যদি সত্যি সত্যিই ও সিনেমায় নামে, তা হলে? মা অবশ্য প্রথমেই বারণ করবে। না, না সিনেমা লাইনের মেয়েরা ভালো না। তোমার বদনাম হয়ে যাবে। অনু, লালি আর তাপস হয়তো উৎসাহ দেবে। কিন্তু রোসি বলবে, অ্যাকটিং যদি করতে চাস, তা হলে বলিউড থেকে শুরু করাই ভালো। টলিউডে কী আছে বল তো? ওখানে যে ভলিউমে বিজনেস হয়, তা পাতে দেওয়ার মতো নয়। সিনেমায় নামলে অবশ্য, মুখের ওপর থাপ্পড় মারা যাবে তিতাসকে। তখন ও জ্বলেপুড়ে মরবে। আর রোশনি? রোশনির কী হবে? ওর কথা মনে হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সায়ন দ্রুত মিষ্টির দোকানে ঢুকে গেল। না, আর মজা-টজা নয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। এই সময়টুকুর মধ্যে যদি কাঞ্চনকে ফোন করে অনু জানতে চায়, রোশনি, সত্যি সত্যি কে, তা হলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। কাঞ্চন বেচারা যে কিছুই জানে না।

খাবার কিনে অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময় সায়ন তনিমাবউদির মুখোমুখি হয়ে গেল। বউদি বললেন, 'অনু এয়েচে দেখলাম।'

উফ, কোনও কিছুই কী তনিমাবউদির নজর এড়ায় না? সায়ন বলল, 'হ্যাঁ।'

'ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা হল বুঝি।'

'হ্যাঁ।' বলে পাশ কাটাতে চাইছিল সায়ন, তনিমাবউদি বললেন, 'শোনো না সায়ন, তোমাকে না একটা কথা বলার ছিল।'

আবার কোন বিপদে পড়বে, বুঝতে পারল না সায়ন। দাঁড়িয়ে পড়ল। তনিমাবউদি বললেন, 'তোমার দাদার কী বুদ্ধি দেখো। কাল দুটো টিকিট কিনে এনেচে সিনেমার। সাউথ সিটির ফেম হলের। মনে নেই আজ লক্ষ্মীপুজো। কী করে আমি যাব বলো তো? টিকিট দুটো নষ্ট হবে, তাই ভাবলাম রোশনকে নিয়ে কেকা না হয় সিনেমাটা দেখে আসুক। বেচারা ঘরের মধ্যে সারাটা দিন বসে থাকে। যাক না, একটু কেকার সঙ্গে বাইরে, ঘুরে ফিরে আসুক। দু'জনে একটু মেলামেশা করুক। তুমি কী বলো সায়ন?'

রোশনিকে এখন বাইরে না পাঠানোই ভালো। একটু গররাজি হয়েই, সায়ন বলল, 'রোশনের শরীরটা ভালো নেই বউদি। কাল রাতে খুব জ্বর এসেছিল। আমি চাইছি না, এ সি-তে জ্বরটা ও আরও বাড়াক। এখন এ সব থাক না। পরে না হয় কেকার সঙ্গে মেলামেশা করবে।'

ঘরে ঢুকেই সায়ন দেখল, অনুর সঙ্গে বসে গল্প করছে কস্তুরী। আর রোশনি উলটো দিকে বসে ওদের কথা শুনছে। ওকে দেখেই কস্তুরী বলল, 'কী রকম সারপ্রাইজ দিলাম বলো তো?'

'সত্যিই সারপ্রাইজ। কাল স্টুডিয়ো থেকে ফেরার সময় তোমার সঙ্গে আর দেখা হল না। সব শুনেছ নিশ্চয়?'

'শুনেছি। তুমি চলে আসার পর, তিতাস ফের বুম্বাদার কাছে গেছিল। প্রচুর কান্নাকাটি,

নাটকের চূড়ান্ত। বুম্বাদার মতো লোকও লাস্টে বিরক্ত হয়ে গেছিল।'

'তাই নাকি? দাঁড়াও দাঁড়াও, সব শুনব। আগে পেটপুজোর ব্যবস্থা করি।'

'কী এনেছ? ভাজাভুজি বুঝি। না গো। আমি এ সব খাই না। ফিগারটা ঠিক রাখতে হবে। খাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রচুর রেস্ট্রিকশন।'

অনু বলল, 'তা কি করে হয়? আমরা খাব, আর তুমি বসে বসে দেখবে?'

কস্তুরী বলল, 'সংযম, অনু সংযম। মোটা হয়ে গেলে, সিনেমা হল-এ বসে, তুমি যে তখন আমাকে দেখতে চাইবে না। এটা সব সময় আমাদের মনে রাখতে হয়।'

অনু প্লেটে করে খাবার সাজিয়ে দিতে থাকল। সেই ফাঁকে সায়ন বলল, 'তুমি আমার বাড়ি চিনলে কী করে কস্তুরী?'

'আরে, আমি তো খুব কাছেই থাকি। সুপার মার্কেটের কাছে। তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন আলাপ হয়, সেদিন তুমি এই অ্যাপার্টমেন্টের কথা বলেছিলে। আজ একটা চান্স নিলাম বলতে পারো। তবে আসার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আগে তুমি পেটপুজো করে নাও। তারপর তোমায় বলব। আগে শুনলে, বিষম খাবে।'

ঠাট্টা করে সায়ন বলল, 'তুমি কি জানো, তোমার বুম্বাদা আমাকে সিনেমায় নামাতে চাইছে?'

শুনে খুব উৎসাহ দিল কস্তুরী, 'সত্যি? তুমি রাজি হয়ে যাও সায়ন। তুমি অ্যাকশন হিরো হলে লোকে নেবে। কাল যেভাবে তিনতলা থেকে লাফটা দিলে, আমি তো দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। হিরোইজম দেখাতে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙলে বোধহয়। সত্যি তোমার সাহস আছে। পরে শাটুদা তোমার খোঁজ করছিল। কেন জানো? তোমার পারিশ্রমিক দেবে বলে। দু'হাজার টাকা। এই নাও বাবা তোমার টাকা। দিয়ে আমি হালকা হই।'

খেতে খেতে কস্তুরীর কথা শুনছিল অনু। বলল, 'তোমাদের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সানুদা।'

সায়ন বলল, 'ও সব শুনে তোর কাজ নেই। শুনলেই তো মায়ের কানে ঢেলে দিবি।'

অনু কি চুপ করে থাকার মেয়ে? খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কস্তুরীর পেট থেকে সব কথা বের করে নিল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'এটুকু দেখে তোমরা তাজ্জব হয়ে যাচ্ছ? বসিরহাটে সানুদার হিরোইজমের গল্প যদি বলি, তা হলে একশো চ্যাপ্টারের একটা বই হয়ে যাবে। তুমি জানো, সানুদাকে পাওয়ার জন্য কত মেয়ে হাপিত্যেশ করে বসে আছে? ঐন্দ্রিলা বলে একটা মেয়ে তো সুইসাইড করবে বলেছিল।'

অনুকে কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ সায়নের চোখ গেলে রোশনির দিকে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। একটু অবাক হয়ে সায়নও ওর দিকে তাকিয়ে রইল। রোশনি কি কিছু বলতে চাইছে? একটু পরেই রোশনি মুখ নিচু করে ফের খেতে লাগল।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে অনু চলে যাওয়ার পর, কস্তুরী বলল, 'সায়নদা, একটা বাজে

খবর আছে। কাল সকালের ফ্লাইটে তিতাস, বিনানি বলে এক প্রোডিউসারের সঙ্গে মুম্বই যাচ্ছে।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল সায়নের। বলল, 'তুমি জানলে কী করে?'

'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও কিছু চাপা থাকে না সায়নদা। সক্কালবেলায় মুন্নিদি আমায় খবরটা দিল।'

সায়ন বলল, 'শুনলে তিতাসের বাবা হার্টফেল করবেন। কী করা যায় বলো তো?'

'কী আর করবে? আফটর অল, ও একটা অ্যাডাল্ট মেয়ে। জানো সায়ন, একটা কথা কাউকে কোনওদিন আমি বলিনি। তোমাকেই বলছি। এই বিনানি লোকটা টালিগঞ্জের আরও একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে। হিন্দি সিনেমায় নামানোর টোপ দেখিয়ে ও তাকেও মুম্বই নিয়ে গেছিল। প্রথম একটা সপ্তাহ সেই মেয়েটাকে খুব ভালো হোটেলে রেখেছিল। সকাল বিকেল বন্ধু প্রোডিউসারদের ডেকে আনত। রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মদের গ্লাস নিয়ে বসত। কিন্তু তিন চার দিন পরই বিনানির স্বরূপ মেয়েটা টের পেয়ে গেল। লোকটা যেদিন জোর করে ওকে ভোগ করল।'

সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী। কয়েকটা দিন ফুর্তি করার পর বিনানি মেয়েটাকে অন্য একজনের হাতে তুলে দিল। মেয়েটা মুম্বইতেই রয়ে গেল। হোটেল থেকে গেস্ট হাউস, তারপর সস্তার ফ্ল্যাট, হাত ফেরতা হতে হতে, শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটাকে গিয়ে উঠতে হল বস্তিতে। টালিগঞ্জে ফিরে মেয়েটা শুনল, বিনানি অনেক অনেক কুৎসা রটিয়েছে তার নামে। প্রোডিউসাররা খুব শক্তিমান। মেয়েটা একা কী করে লড়বে?'

'কে এই মেয়েটা কস্তুরী?'

'কে আবার? তোমার সামনেই সে বসে আছে।'

pathagar.net

১৩

ট্যাক্সি করে পার্ক সার্কাসের মোড়ের দিকে যাচ্ছিল সায়ন। পার্ক সার্কাস ব্রিজে ওঠার মুখে ও টের পেল পকেটে মোবাইল ফোনটা বাজছে। সেট বের করে ও দেখল, অজানা নাম্বার। সন্ধে প্রায় সাতটা বাজে, এই সময় ওকে কে ফোন করতে পারে? সুইচ অন করতেই তিতাসের গলা পেল সায়ন। শুনেই ওর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। তিতাসের সেই কথাটা ওর মনে পড়ল, 'তুমি ভাবলে কী করে, তোমায় আমি বিয়ে করব?' গম্ভীর গলায় ও বলল, 'বলো।'

'তোমাদের লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে একটু আগে ফোন করেছিলাম। ফোনে আগডুম বাগডুম বলছিল মেয়েটা কে?'

তিতাসকে জ্বালানোর জন্যই সায়ন বলল, 'রোশনি, আমার বান্ধবী।'

এ বার তিতাসের গলাটা তিতকুটে, 'কলকাতায় তোমার বান্ধবী একটাই, নাকি আরও অনেক আছে?'

'তুমি ভাবলে কী করে, পুরুষ হিসাবে আমি এত কম দামি?'

'আই সি, লিভ টুগেদার করছ নাকি?'

'প্রায় সে রকমই বলতে পারো।'

'তোমার মা জননী কি সেটা জানেন?'

'এখনও বলিনি। কিছুদিন দেখি, মেয়েটা আমার সঙ্গে জেল করে কী না। তার পর মাকে বলব।'

'জানলে তো উনি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন।'

'তাতে তোমার কি কোনও অসুবিধে আছে? পার্সোনাল কথা ছাড়ো। ফোনটা করলে কেন বলো।'

'তার আগে বলো, যে মেয়েটা ফোন ধরেছিল, সে কি আমার থেকেও সুন্দরী?'

'আমার চোখে তো বটেই। ইচ্ছে হলে, তাকে দেখে যেতে পারো'।

pathagar.net

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনভিটেশন সানু। তবে কী না, আমার হাতে সময় নেই। থাকলে অবশ্যই দেখতে যেতাম। এটুকু বুঝতে, আঙুর ফল টক কী না।'

'ফর ইওর ইনফর্মেশন তিতাস, মেয়েটা শুধু সুন্দরীই নয়, পাকা আঙুর।'

'তাই নাকি, তার জন্য তা হলে আমার শুভেচ্ছা রইল। বাই দ্য বাই, যেজন্য আমি তোমাকে ফোন করলাম, সেটা বলি। একটা ছবিতে চান্স পেয়েছি। হিরোইনের রোল। কাল সকালেই আমি মুম্বই যাচ্ছি।'

'জানি। একটা লোফারের সঙ্গে মুম্বই যাচ্ছ তুমি।'

'তুমি জানো? কী করে?'

'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও কথা চাপা থাকে না তিতাস।'

'বুম্বাদা বলেছে নিশ্চয়। এই তুমি...তোমার জন্যই বুম্বাদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেল। তোমাকে আমি কোনওদিন ক্ষমা করব না। আর বুম্বাদাকেও আমি দেখিয়ে দেব, অভিনেত্রী হতে পারি কী না।'

'বুম্বাদা তো তোমাকে খারাপ অ্যাডভাইস দেননি।'

'ছাড়ো, ছাড়ো। তোমাদের সবাইকে আমার চেনা হয়ে গেছে। তোমরা সবাই স্বার্থপর। তোমার সম্পর্কে রোসিদা আমাকে ঠিকই বলেছিল। টিপিক্যাল মিডলক্লাস মেন্টালিটির লোক তুমি। তোমাকে বিয়ে করে যেন জীবনটা আমি নষ্ট না করি।'

'রোসি আর কী বলেছিল তিতাস?'

'সে সব শুনে তোমার লাভ? তুমি যে একটা মেয়ের সঙ্গে লিভ ইন করো, এ কথাটা কি বুম্বাদা জানে? এই খবরটা জানিয়ে ওকে কি বলব, বিয়ে করলে সারাটা জীবন তুমি আমায় ঠকাতে? রোসিকে অবশ্য এখুনি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোমার মুখোশটা বসিরহাটে খুলে দিতে পারে।'

'আমাকে ভয় দেখিয়ো না তিতাস। তোমার হিংসেটা কিসের জন্য বলো তো? তোমার থেকেও সুন্দরী একটা মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে, সেজন্য? সত্যি করে বলো তো।'

'মাই ফুট। তোমাকে হিংসে করতে যাব কেন সানু? আজ থেকে একটা বছর পর, আমার নামডাক দেখে তুমিই হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরবে আর আপশোশ করবে।'

'তোমার কি আর কিছু বলার আছে। আমি কিন্তু ছাড়ছি।'

'আর কী বলার থাকতে পারে সানু। আমার মুম্বাই যাওয়ার কথা আমার বাড়িতে জানিয়ে দিয়ো। ব্যস, এইটুকু। তোমার পাকা আঙুরকে দেখার খুব ইচ্ছে রইল। ছাড়ি তা হলে। ভালো থেকো।'

ফোনটা কেটে যাওয়ার পর সায়ন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তিতাসের কথা ও জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল। একটা ভালো কাজের জন্য ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। সেই কাজে সফল ওকে হতেই হবে। রোশনিকে ও কথা দিয়ে এসেছে, যেমন করেই হোক, রঞ্জনকে

সঙ্গে নিয়ে ও আজ বাড়ি ফিরবেই। রাত আটটার আগে নাকি রঞ্জনকে ক্লাবে পাওয়া যায় না। সেই কারণে সন্ধে সাতটায় সায়ন লেক গার্ডেনস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। দরকার হলে সারা রাত্তির রঞ্জনের জন্য ও অপেক্ষা করবে। ওর এত উৎসাহের কারণ, রঞ্জন তালুকদারের সঙ্গে রোশনির সম্পর্কটা আজই ও জানতে পেরেছে।

এতদিন রোশনির কোনও কথা সায়ন বুঝতে পারছিল না। আজ দুপুরে মুশকিল আশান হয়ে দাঁড়ায় কাঞ্চন। চট্টগ্রাম থেকে হঠাৎ এসে হাজির। রোশনি তখন মেয়েদের পোশাকে ডাইনিং টেবিলে বসে লাঞ্চ সারছে। ওকে দেখে কাঞ্চন একটু অবাকই হয়। ইশারায় জানতে চায়, কে? পালটা ইশারায় সায়ন বলে, পরে জানাচ্ছি। এর পর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। কলকাতায় পৌঁছোনোর খবরটা যখন ফোনে কাঞ্চন ওর বাবা-মাকে দিচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ সায়ন লক্ষ্য করে, রোশনির মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে ও উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঞ্চন ফোনটা রাখার পরই রোশনি ফরফর করে কী সব বলতে শুরু করল। কাঞ্চনও চাটগাঁয়ের ভাষায় উত্তর দিতে লাগল। সায়ন তখনই বুঝতে পারে, রোশনি এতদিন চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলছিল। সারাটা দুপুর কাঞ্চন মারফত ও রোশনির সঙ্গে কথা বলেছে। আর তারপর থেকেই মেয়েটার প্রতি ভালোবাসা ওর অনেক বেড়ে গেছে।

ট্যাক্সি পার্ক সার্কাস ব্রিজ দিয়ে হুহু করে ছুটে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে আসা বাতাসে বেশ ঠান্ডা লাগছে সায়নের। তবুও ভালো লাগছে। রোশনির কথাগুলো মনে পড়ছে বলে। মেয়েটা বয়ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করার জন্য এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় এসেছে। ভাবা যায়? কী পরিমাণে তা হলে ভালোবাসে ওর প্রেমিককে। রঞ্জনের ওপর হিংসেই হচ্ছে সায়নের। সত্যিই ছেলেটা ভাগ্যবান। নিজের সঙ্গে রোশনির একটা মিল খুঁজে পেয়েছে আজ সায়ন। ও নিজেও তো তিতাসের খোঁজে কলকাতায় এসেছিল। যাকে দীর্ঘদিন ও প্রেমিকা বলে ভেবে এসেছে। কিন্তু তিতাসের জন্য তীব্র টান অনুভব করল কই? ও কি সত্যিই ভালোবেসেছিল তিতাসকে? মনে হয় না। তা হলে এত সহজে ওকে মুম্বই যেতে দিল কেন? একটা বাজে লোকের সঙ্গে তিতাস মুম্বই যাচ্ছে, এটা জানার পরও চুপ করে বসে রইল?

এক ধরনের সহমর্মিতা অনুভব করার পরই সায়ন একের পর এক প্রশ্ন করেছিল রোশনিকে। কাঞ্চন মারফত। রোশনির কাছ থেকে জেনে নিয়ে, উত্তরগুলো দিচ্ছিল কাঞ্চন। তখনই একবার ওকে সাবধান করে, 'কাজটা কিন্তু ভালো করিসনি সানু। এখন আমার মনে পড়ছে, চিটাগাংয়ের কাগজে এই মেয়েটার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে খবর দেখেছি। রোশনির বাবা গর্ভমেন্ট লেভেলেও চেষ্টা করছে। ইন্ডিয়ান পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুই আবার ফেঁসে না যাস।'

সায়ন তখন বলেছিল, 'ফেঁসে যাই, যাব। কিন্তু রোশনিকে ওর বয়ফ্রেন্ডের কাছে পৌঁছে দেব। আজই আমি রঞ্জনকে খুঁজে বের করব ভাই।'

কাঞ্চন মারফত ওর এই কথাটা শুনে রোশনি খুব খুশি। আজ সারাটা দিন রোশনি বকবক করেছে কাঞ্চনের সঙ্গে। একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে পেরে যেন বেঁচেছে। কাঞ্চনকে ও বলেছে, তোমার বন্ধুটা খুব ভালো। ও আমার খুব উপকার করেছে। ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। কথাগুলো শুনে সায়নের খুব ভালো লেগেছিল। বিকেলে একটা ফোন পেয়ে কাঞ্চন হুট করে বেরিয়ে গেল। ওর ব্যস্ততা দেখে সায়নের তখন হাসি পাচ্ছিল। কাঞ্চন বলল বটে কিছু কেনাকাটা করার আছে, কিন্তু সায়ন জানে, ও অনুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। প্রায় তিন সপ্তাহ দু'জনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব তো হবেই। সত্যিকারের প্রেমে পড়লে মানুষ এ রকম পাগল হয়। তেমন প্রেমে সায়ন পড়তে পারল কই?

ব্রিজ থেকে নেমে ট্যাক্সি বাঁ দিকে টার্ন নিচ্ছে। থিয়েটার রোডের মুখেই রঞ্জনের নাইট ক্লাব। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে সায়ন বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। এই সময়টায় এই অঞ্চলে লোকজন খুব কমই হাঁটা চলা করে। হুশ করে বাস, ট্যাক্সি আর অটো বেরিয়ে যাচ্ছে। আর অপেক্ষা না করে সায়ন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। দোতলায় ক্লাবের দরজার গোড়ায় দু'জন বাউন্সার দাঁড়িয়ে। আগের দিন এদেরই একজন সায়নের সঙ্গে বিশ্রী ব্যবহার করেছিল। আজ ওকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। কাচের দরজাটা খুলে দিয়ে সেই লোকটাই বলল, 'সঙ্গে কেউ আছে? না, কাউকে দরকার।'

নাইট ক্লাবে একা ঢোকার অনুমতি নেই। জোড়ায় জোড়ায় আসতে হয়। কোনও কিছু না ভেবেই সায়ন বলল, 'আছে। একটু পরে আসবে।' লোকটা ভেতরে যাওয়ার রাস্তা করে দিল। হল ঘরে ঢুকে একটু চমকেই গেল সায়ন। বাজনার শব্দে ওর কানে প্রায় তালা লাগার জোগাড়। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ক্লাবের ভেতরটা কত ঝলমলে। বিরাট হল ঘরের এক পাশে বার কাউন্টার, রেস্তোরাঁর মতো চেয়ার-টেবিল সাজানো। অন্য দিকে একটা মঞ্চ। সেখানে কর্ডলেস মাইক নিয়ে গান গাইছে স্বল্পবাস পরা একটা মেয়ে। বার কাউন্টার আর মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটা ডান্স ফ্লোর। বাজনার তালে তালে সেখানে নাচানাচি করছে ওরই বয়সি একদল ছেলে মেয়ে।

জীবনে একবার ডিস্কো থেক-এ গেছিল সায়ন। পার্ক হোটেলের তন্ত্রা-তে। শব্দদূষণের জন্য ও পালিয়ে এসেছিল আধ ঘণ্টা পর। রঞ্জনদের নাইট ক্লাবেও কতক্ষণ ও বসে থাকতে পারবে, তা নিয়ে ওর সন্দেহ জাগল। কোণের দিকে একটা চেয়ার ফাঁকা পেয়ে সায়ন বসে পড়ল। মুখ ঘুরিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকাতেই ও দেখতে পেল, ট্যাক্সি করে ওরই বয়সি দু'একজন নামছে, সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের নিয়ে। দু'জন কোমর জড়াজড়ি করে ভেতরে ঢুকে আসছে। চোখটা ভেতরে সরিয়ে আনল সায়ন। এই সব নাইট ক্লাব ওর মতো ছেলের জন্য নয়। ওপর ওপর ডিস্কো থেক, মদ্যপানের ঠেক। কিন্তু ভেতর ভেতর মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করার জায়গা। সায়ন শুনেছে, মাঝে মাঝে পুলিশ এসে উৎপাত করে। ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় থানায়। ও মনে মনে প্রার্থনা করল, আজ যেন তা

না হয়।

'বিয়ার দেব স্যার, না হুইস্কি?'

সাদা পোশাক পরা একটা নেপালি মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে ট্রে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে সায়ন বলল, 'বিয়ার।' সল্ট লেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ও কখনও-সখনও বিয়ার খেয়েছে। কিন্তু কখনই ওর ভালো লাগেনি। ভালো না লাগলেও এখানে কিছু না কিছু ওকে নিতেই হবে। না হলে বসে থাকা যাবে না।

মেয়েটা ট্রে থেকে একটা কাচের মগ টেবিলের ওপর রেখে বিয়ার ঢালতে লাগল। তার পর প্রায় কানের কাছে মুখ এনে জানতে চাইল, 'স্যার, আপনার পার্টনার আসবে, না আমরা পাঠিয়ে দেব?'

সায়ন তাড়াতাড়ি বলল, 'আসবে। পাঠানোর দরকার নেই।' আর তখনই ও দেখল, কাচের দরজা ঠেলে কস্তুরী ঢুকছে। ডান্স ফ্লোরের হই হট্টগোলের মাঝে চলে গেলে ওকে পাওয়া যাবে না। তাই মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে মেয়েটাকে ও বলল, 'ওই যে এসে গেছে। ওই জিনস পরা মেয়েটা। ওকে তুমি আমার টেবিলে পাঠিয়ে দাও।'

'হোয়াট আ সারপ্রাইজ, সায়ন তুমি? মাই গড, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' ডান দিকের চেয়ারে বসতে বসতে কস্তুরী বলল।

সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে প্রায়ই আসো নাকি?'

'সপ্তাহে দু'তিনদিন তো হবেই। তুমি এখানে?'

'লং স্টোরি। শোনার আগে বলো, কী খাবে? খেতে খেতে কথা হবে।'

'হুইস্কি। দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি। এরা সবাই আমাকে চেনে।' বলেই হাত তুলে নেপালি মেয়েটাকে ডাকল কস্তুরী। তারপর বলল, 'শান্তা, আমার ব্র্যান্ড নিয়ে এসো। কুইক, এখানে দু'টো মেরে ইনসোমনিয়া যাব। আজ ওখানে পার্টি আছে।'

যে মেয়েটা গান গাইছিল, সে মঞ্চে নাচতে শুরু করেছে। ওর শরীরের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না সায়ন। বিয়ার চুমুক দিয়ে কস্তুরীকে ও বলল, 'আজব জায়গা, তাই না?'

'সত্যিই আজব জায়গা। এ বার বলো, এখানে এলে কেন?'

রোশনির কথা গুছিয়ে বলল সায়ন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই নাইট ক্লাবের সবাইকে তুমি চেনো?'

'চিনি। এমন কী, মালিককেও চিনি। একটা ছবি প্রোডিউস করেছিল। আমাকে অর্ধেক টাকা দেয়নি। সেই কারণে প্রায়ই এখানে আসি। যতটা পারি উশুল করে নিই।' কথাগুলো বলে কস্তুরী হাসতে লাগল।

'রঞ্জন ছেলেটাকে তুমি চেনো নাকি?'

'ভালো করে চিনি। খুব গুণী ছেলে। অনেকগুলো বাজনা বাজাতে পারে। ওই যে স্টেজে দেখ, অক্টোপ্যাডের সামনে...ওই ছেলেটাই। পরিক্রমা বলে একটা রক ব্যান্ড আছে। সেখানে বাজায়। মাঝে মাঝে মুম্বইতেও যায়।'

স্টেজের দিকে তাকিয়ে ছেলেটাকে দেখতে পেল সায়ন। বাজিয়েদের সবার পরনে লাল সিল্কের শার্ট, কালো ট্রাউজার্স। তার মাঝে উজ্জ্বল লাগছে ছেলেটাকে। খুব হ্যান্ডসাম। এই কারণেই রোশনি মজেছে। ও বলল, 'এই ছেলেটার সম্পর্কে আর তুমি কী জানো?'

'খুব বেশি কিছু না। যেমন এই কাছাকাছি কোথাও থাকে। সম্প্রতি একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। ও কলকাতার ছেলে না। বাইরে কোথাও থাকত। বছর দুয়েক কলকাতায় আছে।'

মিলে যাচ্ছে, রোশনির কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। দুপুরে রোশনি এই সব তথ্যই দিয়েছিল রঞ্জন সম্পর্কে।

সায়ন বলল, 'কী রকম রোজগার করে, কিছু জানো?'

'ক্লাব থেকে কত, জেনে তো বলে দিতে পারি। কিন্তু এদের মতো বাজিয়েদের আরও রোজগার আছে। ব্যান্ডের সঙ্গে বাজায়, বছরে অন্তত একশোটা করে ফাংশানে যায়। বিদেশেও গেছে। আমার জন্য একবার একটা পারফিউম এনে দিয়েছিল। রোজগার খারাপ না।'

'ছেলেটার সঙ্গে আজ আলাপ করিয়ে দিতে পারবে?'

'এখন না। এই সময়টায় ওরা খুবই ব্যস্ত। রাত বারোটার আগে ওরা ফ্রি হবে না। তুমি একটা কাজ করো। ওদের সঙ্গে কথা বলার বেস্ট সময়টা হচ্ছে, সন্ধে ঠিক সাতটা। তখন ওরা মেক আপ রুমে থাকে। তখন বসে খানিকক্ষণ তুমি কথা বলতে পারবে। কাল এসো, আমিও থাকব। কাল আমার শুটিং নেই।' কথাগুলো বলতে বলতে এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে ফেলল কস্তুরী। তারপর বলল, 'আমাকে এখন উঠতে হবে গো সায়ন। একবার তাজবেঙ্গলে যেতে হবে।'

সায়নও উঠে পড়ল, 'আমারও বসে থেকে লাভ নেই। যা খবর জানার ছিল, জেনে গেছি। চলো, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি লেক গার্ডেন্সে চলে যাব।'

কস্তুরী বলল, 'দরকার নেই সায়ন। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। নিজের নয়, পবন ভুতুরিয়ার গাড়ি। আমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। ইনসোমনিয়ায় আজ ওর সঙ্গে ডান্স করতে হবে।'

বিল মিটিয়ে একটু পরে কস্তুরীর সঙ্গেই নীচে নেমে এল সায়ন। মেয়েটার কী অফুরন্ত এনার্জি। পারে বটে। এখান থেকে তাজে। তারপর রাতে কখন বাড়ি ফিরবে কে জানে? সামনেই দু'টো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সায়ন যখন উঠতে যাচ্ছে, তখন গাড়ির ভেতর থেকে কস্তুরী চেঁচিয়ে বলল, 'এই সায়ন, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তোমার প্রেমিকার খবর জানতে চাইলে না যে?

'তিতাসের খবর? কি হয়েছে ওর?'

'মুম্বইয়ে যায়নি। বিনানি ওকে রায়চকের এক রিসর্টে নিয়ে গেছে। স্ক্রিপ্ট শোনাবে বলে। আমাকেও নিয়ে গেছিল। ওই রিসর্টের ফোন নাম্বারটা আমার কাছে আছে। নেবে? তা হলে গাড়িতে উঠে এসো।'

১৪

বিনানির জন্য রিসর্টের ঘরে অপেক্ষা করছিল তিতাস। লোকটা বলেছিল, সকালবেলায় ডিরেক্টর আর স্ক্রিপ্ট রাইটারকে নিয়ে আসবে। কিন্তু তার পাত্তাই নেই। বেশ কয়েকবার লোকটাকে ও মোবাইলে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু লোকটা ধরেনি। রিসর্টের ঘরে একা বসে তখন একটু ভয়ভয় করছিল তিতাসের। ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর এই রিসর্টে দুপুরের পর থেকে কোনও লোকজন ওর চোখে পড়েনি। রিসেপশনিস্ট লোকটাও যেন কেমন। বেলা তিনটের সময় রিসেপশনে ফোন করে ও বলেছিল, একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। তিতাস ভেবেছিল, রাতে রিসর্টে একা থাকা ঠিক হবে না। কসবায় ওর এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু রিসেপশনিস্ট লোকটা খুব কড়া গলায় বলল, ট্যাক্সি ডেকে দেওয়া যাবে না। মিস্টার বিনানির পারমিশান ছাড়া সে কিছু করবে না। শুনে তখন মাথা গরম হয়ে গেছিল তিতাসের। এর পরেই সায়নকে ধরার জন্য তিতাস ল্যান্ডে ফোন করে। ও ভেবেছিল, সায়নকে লেক গার্ডেন্সের বাড়িতেই পাবে। ও যে একটা ছবির অফার পেয়েছে, সে কথাটা জানাবে। যাতে সায়ন আরও বেশি জ্বলুনি অনুভব করে? কিন্তু ও প্রান্তে রিসিভারটা তোলে একটা মেয়ে। তার কথা তিতাস কিছুই বুঝতে পারেনি। একটু অবাক হয়েই শেষ পর্যন্ত ফোনটা ও ছেড়ে দেয়। ওর মোবাইলে সায়নের মোবাইল নাম্বারটাও স্টোর করা ছিল। সেই নাম্বারে ফোনটা করার পর সায়ন জানায়, মেয়েটা ওর গার্লফ্রেন্ড। তিতাস বিশ্বাস করে নি, সায়নের মতো মা-মুখো ছেলে কারও সঙ্গে লিভ ইন করতে পারে। তবুও মেয়েটাকে নিজের চোখে দেখার ইচ্ছে ওকে কুরেকুরে খেতে থাকে।

তিতাস ঠিকই করে রেখেছিল, আজ দুপুরের দিকে কোনও একটা সময় ও নিজেই ট্যাক্সি ডেকে লেক গার্ডেন্সে যাবে। সায়নের চালিয়াতি হাতেনাতে ধরে ফেলবে। কিন্তু বেলা বারোটার সময় হাজির হল বিনানি। এসেই হাতজোড় করে বলল, 'মাফ করবেন ম্যাডাম, কাল সারাদিন বেওসার কাজে ফেঁসে ছিলাম। আসতে পারিনি। লেকিন আজ সারা দিন আপনার সাথে আছি।'

লোকটাকে দেখে রাগ হয়ে গিয়েছিল তিতাসের। কিন্তু মাফ চাওয়ার বিনম্র ভঙ্গি দেখে ও নিজেকে সংযত করে বলল, 'ফোনটাও তো ধরতে পারতেন।'

'আরে, হামার সেকরেটারিটা একদম বুরবক। ওর হাতে ফোনটা দিয়ে হামি মিটিনে ঢুকেছিলাম। হামাকে বলেওনি, আপনি ফোন করেছেন।'

'ডিরেক্টর আর স্ক্রিপ্ট রাইটার কখন আসবেন?'

'এনি টাইম ম্যাডাম। ব্রেক ফাস্ট করছে নীচে। আখুনি উঠে আসবে। আসার সোময় ওরা স্টোরিটা হামায় বলছিল। এক্সিলেন্ট। শুনলে আপনার ভালো লাগবে।'

'কার লেখা?'

'মনে হয় ডিরেক্টর সাহেবরই লেখা হোবে। ঠিক জানি না। আপনি হিরোইন। হিরো নিউকামার। হামার দাদার ছেলে। সঞ্জয় বিনানি।'

'বৃন্দাদাকে নিচ্ছেন না কেন?'

'পুরানা হিরো-হিরোইনদের দিয়ে পিকচার আর চলবে না। নিউ ব্লাড আনতে হোবে। আপনাদের মতো নিউ ফেস। আরে...এই তো ডিরেক্টর সাহেব এসে গেছেন। আসেন দাদা, আসেন।' বলে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল বিনানি। তারপর পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি হচ্ছেন মিস্টার হরিবল আর ম্যাডাম হলেন তিতাস...আমার হিরোইন। দাদা, এনার কথাই আপনাকে বলেছিলাম।'

হিরোর কথা শোনার পর থেকেই তিতাসের মনটা খচখচ করছিল। ডিরেক্টরকে দেখে মনটা একেবারে চটকে গেল। লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। মনে হয়, জরিপ করার চেষ্টা করছে, ওকে দিয়ে চলবে কী না। বয়স ষাটের ওপরে। প্রায় ছয় ফুটের মতো লম্বা, রোগা হিলেহিলে। গায়ে চকরা-বকরা হাফ হাতা শার্ট। গালভাঙা মুখ, চোখে রিমলেস চশমা, কানদুটো বেশ বড়। অন্য কোথাও দেখলে নির্ঘাত হাসি পেত। কিন্তু লোকটা প্রথম ছবির গল্প শোনাতে এসেছে। হাসলে বাদ দিয়ে দিতে পারে। হতাশ হয়ে উলটো দিকের সোফায় তিতাস ধপ করে বসে পড়ল। হরিবল? এ আবার কী ধরনের নাম?

হাতের ফাইল সেন্টার টেবিলে রেখে লোকটা এ বার বলল, 'আমার পুরো নাম হরিশঙ্কর বল। বিদেশে আমার বন্ধু ডিরেক্টররা, ছোট করে আমাকে হরিবল বলে ডাকে। এই উচ্চিংড়ে বিনানিটা আমার সম্পর্কে আপনাকে কী ধারণা দিয়েছে, জানি না। নিজেই বলছি, আমি আর্ট ফিলিম করিয়ে ডিরেক্টর হিসাবেই পরিচিত। আমার দুটো ফিলিম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বিদেশে। বিনানি, এ বার তুই আমার সম্পর্কে যা জানিস, বল।'

বিনানি কৃতার্থ হয়ে বলল, 'আপনার সম্পর্কে হামি কী বলব দাদা। সবাই জানে, আপনি কী রকম পাওয়ারফুল ডিরেক্টর। আপনি স্টোরিলাইনটা বলুন। হামি তো আপনাকে বলেই দিয়েছি, কমার্শিয়াল পিকচার অনেক করেছি। এ বার আর্ট ফিলিম দিন। হামার অ্যাওয়ার্ড চাই।'

'দেব রে দেব। ক'টা অ্যাওয়ার্ড তোর চাই? শুধু তুই নোস, তোর এই হিরোইনও

অ্যাওয়ার্ড পাবে। শুধু আমি যা করতে বলব, তোদের করে যেতে হবে। শোনো তিতাল, কামিং সিক্স মান্থ অন্য কোথাও কাজ করা চলবে না। এই রিসর্টে আমি তিন মাস ওয়ার্কশপ করব, তারপরের তিন মাস পুরুলিয়ায় টানা শুটিং। যদি রাজি থাকিস, তা হলে বল। আমি টালিগঞ্জের ভিড়ভাট্টায় শুটিং করতে পারব না।'

হরিবলের কথাগুলো শুনতে শুনতে তিতাসের মনে হল, লোকটা কি পাগল? একবার তুই বলছে, পরক্ষণেই তুমি। ওর নামটাও ঠিক মতো মনে রাখতে পারেনি। এই লোকটা কী ডিরেকশন দেবে? বিনানি অবশ্য ওর সঙ্গে খুব খাতির করে কথা বলছে। তাই ও চুপ করে রইল। হরিবল লোকটা চোখ বন্ধ করে মাথায় আঙুলের টোকা মারছে। উত্তরের আশায় রয়েছে। তিতাসের হয়ে বিনানিই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'দাদা, আপনাকে তো হামি বলেই দিয়েছি, কুনও চিন্তা করবেন না। আপনি যা চান, তাই পাবেন। ম্যাডামকে আখুন স্টোরিটা শোনান।'

শুনে হরিবল খিঁচিয়ে উঠল, 'হারামজাদা, তুই জানিস না, স্টোরি ন্যারেট করার সময়, আমার কী লাগে? যা রুম সার্ভিসে ফোন করে সে সব আনতে বল। এক সঙ্গে দু'পেগ আনতে বলবি। দুটো নিট গলায় না ঢাললে আমার মাথাটা খোলে না।'

'দাদা এই সাতসকালে হুইস্কি খাবেন? এই তো ব্রেকফাস্ট করলেন।'

'ক্রিয়েটিভ লোকদের কাছে সব বেলাই সমান রে পাঁঠা। তোরা প্রোডিউসাররা সে সব বুঝলে তো নিজেরাই ছবি বানাতি।'

লোকটা এই ঘরে বসে মদ খাবে নাকি? তিতাস মনে মনে খানিকটা দমে গেল। বিনানির দিকে তাকাতেই ওঁর চোখ মুখে অস্বস্তির চিহ্ন দেখতে পেল ও। চার দিন হল ও কলকাতায় এসেছে। এর মধ্যে বিনানি ওকে দুটো পার্টিতে নিয়ে গেছে। সেখানে অনেকের হাতেই মদের গ্লাস দেখেছে তিতাস। তখন ওর খারাপ লাগেনি। ধরেই নিয়েছিল, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে এটাই দস্তুর। কিন্তু রিসর্টের এই ঘরে বসে কেউ মদ্যপান করবে, সেটা ভালো লাগল না ওর। ও দেখল, খানিকটা অনিচ্ছা দেখিয়ে বিনানি কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে ডায়াল করতে লাগল রুম সার্ভিসে। হরিবল লোকটা চোখ বুজে ক্রমাগত নিজের মাথায় বুড়ো আঙুলে টোকা মেরে যাচ্ছে। হঠাৎ বলে উঠল, 'তিতাল, তোর আবার ছুৎমার্গ নেই তো? আমি কিন্তু গল্প বলার সময় একা ড্রিঙ্ক করতে পারি না।'

হ্যাঁ কী না বলবে, তিতাস ভেবে উঠতে পারছিল না। ওকে বাঁচিয়ে দিল মোবাইল ফোন। কেউ বোধহয় ফোন করেছে। সেট-এর পর্দার দিকে তাকিয়ে ও দেখল, রোসিদা। বসিরহাটের খবর জানার জন্য সকালে রোসিদা ফোন করেছিল ও। বোধহয় কোনও খবর আছে। বিনানিদের সামনে বাড়ির কথা বলা যাবে না। তাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে ও বলল, 'বলো রোসিদা। বাড়িতে গেছিলে?'

'আমি যাইনি। রুশাতিকে পাঠিয়েছিলাম। এ দিকে সব ঠিক আছে।'

'কিন্তু সানুদা যে বলল, বাবা নার্সিংহোমে?'

'ঢপ। তোকে ফিরিয়ে আনার জন্য গল্প ফেঁদেছিল। রুশাতি তো আমায় বলল, তোদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন হচ্ছে। তোর বাবা লোকজন আপ্যায়ন করছে। কী বলবি বল। কার কথা বিশ্বাস করবি।'

'অবভিয়াসলি তোমার কথা। যাক, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে রোসিদা। জানো, একটা ভালো খবর আছে। খুব নামকরা একজন ডিরেক্টর এসেছেন আমায় গল্প শোনাতে। আর্ট ফিল্ম করেন। আমাকে হিরোইন করে ছবিটা করবেন। খুব এক্সাইটেড লাগছে।'

'ভেরি গুড। এই তো... তোর লড়াই শুরু হয়ে গেল। শোন, প্রোফেশনে যদি সাকসেস পেতে চাস, তা হলে কোনও কিছুর সঙ্গে আপস করবি না। আর একটা কথা, সুযোগ পেলে কোনও মতেই সেটা ছাড়বি না, বুঝলি। তার জন্য যদি কোনও মূল্য দিতে হয়, দিবি। আজ থেকে পাঁচ বছর পর কেউ কিন্তু মনে রাখবে না, তোকে কী মূল্যটা দিতে হয়েছিল। তোরও মনে থাকবে না। আমি চাই, তোর নামটা চারদিকে ফেটে যাক। তারপর তোকে কী ভাবে ইউজ করতে হয়, সেটা দেখবি।'

'ঠিক আছে রোসিদা। আমাকে সাকসেস পেতেই হবে।'

'তোর মুম্বই যাওয়ার কী হল রে?'

'এরা সিডিউল বদলেছে। মনে হচ্ছে, এই ছবিটার জন্য মাস ছয়েক এখানেই থাকতে হবে।'

'রাতে আমায় ফোন করিস। আমি তোকে এ দিককার খবর দিয়ে যাব। ছাড়ি তা হলে?'

রোসিদার ফোনটা ছেড়ে মনে একটু বল পেল তিতাস। ঠিকই বলেছে রোসিদা, সাকসেস পেতে হলে সব কিছু দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘরে ফিরে সোফায় বসার সময় তিতাস দেখল, হরিবল আর বিনানি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ওকে দেখেই বিনানি বলল, 'কার ফোন ম্যাডাম?'

'বাড়ি থেকে। নিন, গল্পটা শুরু করুন। আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

হরিবল শুরু করলেন, 'আমি যে সব ছবি করি, সেগুলো সব একেবারে বাস্তব জীবনের। এ গল্পটা ইমরানা বলে একটা মুসলিম মেয়ের জীবন থেকে নেওয়া। খবরের কাগজে পড়েছ নিশ্চয়। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, বর্ডার এরিয়ার। যোলো বছর বয়সে তার নিকাহ হয় সালাম বলে একজনের সঙ্গে। ইমরানাই আমার ছবির প্রোতাগনিস্ট। ওকে...অর্থাৎ কী না তোকে সেন্টার করেই ছবিটা এগোবে। ফার্স্ট শট ভাবছি, করব এইভাবে, নির্জন পুকুর ঘাট। গাছপালা দিয়ে ঘেরা। সেখানে ইমরানা স্নান করতে নেমেছে। দু'তিন বার জলে ডুব দিয়ে সে উঠে আসছে। ভিজে শাড়িটা তার বুকের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। ক্যামেরা তখন প্যান করবে শুধু তোর দিকেই। আলো ছায়ার মাঝখানে থেকে জলপরির মতো ইমরানা উঠে আসছে চুল এলো করে। তোর কাঁখে তখন থাকবে একটা ঘড়া। দূর থেকে ঘুঘুর ডাক শোনা যাবে। অলস দুপুরের রিফ্লেকশন বলতে পারিস...'

বাধা দিয়ে বিনানি বলল, 'দাদা, স্টোরিটা আগে বলুন।'

'বলছি, বলছি। হড়বড় করিস না তো।' হরিবল একটু বিরক্ত হয়েই গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'সিকোয়েন্সটা আগে ওকে বুঝতে দে। ওই যে পুকুর ঘাট থেকে তিতালের উঠে আসা, ওটাই জুরিদের টানটান করে বসিয়ে রাখবে। তোরা বড্ড বেশি ইন্টারাপ্ট করিস। এই জন্যই তো তোদের টাকায় আমি আর্ট ফিলিম করতে চাই না।'

'ভুল হয়ে গেছে দাদা। মাফ করে দিন। আপনি আপনার মতো করে বলে যান।'

চোখ বন্ধ করে হরিবল গুম হয়ে বসে রইলেন। বুড়ো আঙুল দিয়ে ফের মাথায় টোকা মারতে শুরু করলেন। তিতাস হাসবে কী কাঁদবে বুঝতে পারল না। এই লোকটার ডিরেকশনে যদি কাজ করতে হয়, তা হলে ওর লাইফ হেল হয়ে যাবে। টালিগঞ্জে যাতায়াত শুরু করার পর থেকে, ডিরেক্টরদের মধ্যে ও শুধু হরনাথ চক্রবর্তীকেই দেখেছে। ঠান্ডা মাথার মানুষ। কেরিয়ারের প্রথম ছবিটা ওর ডিরেকশনে করার সুযোগ পেলে ভালো হত। দশবার এন জি হলেও আর্টিস্টদের উনি কিছুই বলেন না। বরং উৎসাহ দেন, পরের বার ভালো করে করো। আর এই লোকটা একবার এন জি করলে তো, মেরেও দিতে পারে।

হরিবল মুড ফিরিয়ে আনছেন। এমন সময় ল্যান্ডলাইনের ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে, ওপ্রান্তে গলার স্বর শুনে তিতাস বুঝতে পারল সায়ন। চাপা গলায় ও বলল, 'আমি এখন ব্যস্ত। তোমাকে আমার কোনও দরকার নেই। আমাকে তোমার দরকার থাকলে ঘণ্টা দুয়েক পরে ফোন কোরো।'

ওপ্রান্ত থেকে সায়ন বলল, 'ছবির গল্প শুনছ বুঝি। তোমার মতো অনেক মেয়েকেই ওই গল্পটা শুনিয়েছে বিনানি। সেই ছবি কোনওদিন হয়নি।'

'আটারলি ননসেন্স। কী বাজে কথা বলছ তুমি?'

'বাজে কথা নয়, কাজের কথাই বলছি আমি। গল্পটা আমি জানি। তুমি শুনতে চাইলে আগাম শুনিয়েও দিতে পারি। এটা ইমরানা বলে একটা মেয়ের গল্প। সালাম বলে একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর ছাড়া আর কেউ ছিল না। বিয়ের পর লেবারের কাজ করার জন্য এই সালাম চারমাসের জন্য দিল্লিতে গেল। তখনই ইমরানার জীবনে দুর্ভোগ শুরু হল। ফাঁকা বাড়িতে শ্বশুর তাকে রেপ করল। ইমরানা অনেক বাধা দেওয়া চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না। এর পর শ্বশুর ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখল ইমরানাকে। রোজই তাকে রেপ করত।'

'কী বাজে কথা বলছ সানুদা?'

'বাজে কথা নয় তিতাস। গল্পটা পরে মিলিয়ে নিয়ো। একদিন এক প্রতিবেশীর সাহায্যে ইমরানা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। এ দিকে, সেই সময় ওর স্বামীও দিল্লি থেকে ফিরে এল, বাবার কুকীর্তি শোনা সত্ত্বেও সালাম নিজের বাড়িতে নিয়ে এল ইমরানাকে। তখন গ্রামের মৌলভিরা ফতোয়া দিল, ইমরানাকে নিজের বিবি বলে সালাম ক্লেম করতে

পারবে না। ওকে শ্বশুরের সঙ্গে ঘর করতে হবে। কী মিলছে, বিনানির গল্পের সঙ্গে? কতটা তুমি শুনেছ তিতাস?'

সায়নের মুখে গল্পটা শুনতে সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল তিতাসের। ও ঢোঁক গিলে বলল, 'তুমি এ সব জানলে কী করে?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই। ছবিতে অন্তত ছয়-সাতবার রেপ সিন থাকবে। তোমার অ্যাক্টিং কেরিয়ার একেবারে বরবাদ করে দেবে বিনানি। টালিগঞ্জে তার পর কেউ তোমাকে ছোঁবে না।'

সায়ন কি ফের ঢপ দিচ্ছে? কিন্তু সেটাই বা কী করে হয়। এই প্রথম তিতাসের খেয়াল হল, ও যে এই রিসর্টে আছে, সেটা সায়ন জানল কী করে? ফোন নাম্বারটাই পেল কার কাছ থেকে? ভেতরে ভেতরে ও একটু দুর্বল হয়ে গেল। তবুও গলায় জোর এনে বলল, 'তুমি যে ঠিক বলছ, তা বিশ্বাস করব কেন?'

সায়ন বলল, 'এখনও তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তিতাস? আমি আরও বলে দিচ্ছি, ওই রিসর্ট থেকে তুমি আর বেরোতে পারবে না। আগামী তিন মাস ওয়ার্কশপ-এর নাম করে বিনানি তোমাকে আটকে রাখবে। আরও বলে দিই, সালামের রোলটা করবে ওর এক দুশ্চরিত্র ভাইপো সঞ্জয়। শ্বশুরের রোলটা করবে বিনানি নিজে। সে কথা এখন তোমাকে বলবে না। তুমি জানো না, টালিগঞ্জের এক প্রোডিউসারের সঙ্গে বিনানি বাজি রেখেছে, বিছানায় তোমাকে নিয়ে যাবেই। কেউ নাকি সেটা আটকাতে পারবে না। এখনও সময় আছে। তুমি বললে, সঙ্গে পুলিশ নিয়ে গিয়ে তোমাকে আজই উদ্ধার করে আনতে পারি।'

তিতাস উত্তরটা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় ওর হাত থেকে রিসিভারটা বিনানি কেড়ে নিল। আর তখনই তিতাস টের পেল, ও বিপদে পড়েছে।

pathagar.net

রাত সাড়ে ন'টার সময় বাড়ি ফিরে সায়ন দেখল, রোশনি ঘরে নেই। বিন্দাস চ্যানেলে কাঞ্চন হলিউডের একটা ফিল্ম দেখছিল। ওকে সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'রোশনি কোথায় রে?'

'তনিমাবউদির ফ্ল্যাটে। সেই দুপুরবেলায় ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। এখনও ফেরেনি।'

'ওপরে এতক্ষণ কী করছে?'

'কী করে জানব? ওপরে লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে। চারতলার মেয়েটা বিকেলে এসে বলে গেল, সায়নদা ফিরলে তোমরা ওপরে চলে এসো। আজ বউদির ওখানেই প্রসাদ খাবে।'

একটু আগে রঞ্জনদের ক্লাবে সায়ন বিয়ার খেয়েছে। এই অবস্থায় ওর তনিমাবউদিদের ঘরে যাওয়া উচিত কী না, সেটা ও বুঝতে পারছিল না। মুখ দিয়ে গন্ধ পেলে বউদি কথাটা মাকে বলে দিতে পারে। ও বলল, 'তুই একবার ওপরে যাবি প্লিজ? রোশনিকে বলবি, খবর আছে। এখুনি যেন চলে আসে। তোদের ভাষায় বলবি, আর কেউ যেন বুঝতে না পারে।'

'একটু পরে গেলে হয় না? এই বইটাতে নিকোলাস কেজ ফাটাফাটি ঝাড়পিট করছে। বইটা শেষ হয়ে যাক। তার পর যাব। আর মিনিট দশেক বাকি। ক্লাইমেক্স এসে গেছে।'

সায়ন বলল, 'ঠিক আছে। তাই যা। তনিমাবউদি যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলবি, শরীরটা ভালো নেই। যেতে পারব না। প্রসাদ যেন পাঠিয়ে দেয়।'

'তোর আবার কী হল? এই তো ভালো ছিলি।'

'আমি ঠিক আছি। একটু বিয়ার খেয়েছি, বুঝেছিস?'

'ওহ, তাই বল। এটা কোনও প্রবলেম হল? আমি সলভ করে দিচ্ছি। আমার কাছে অরবিট আছে। একটা দিচ্ছি। চিবোতে চিবোতে ওপরে উঠবি। বিয়ারের গন্ধ কেউ টের পাবে না।'

কথাগুলো বলেই কাঞ্চন ফের টিভি-তে মন দিল। হাত মুখ ধোয়ার জন্য সায়ন

বাথরুমে ঢুকল। ওর মনের ভেতর একটা পাথর চেপে বসে আছে। সেটাকে উপরে ও বের করে দিতে পারছে না। থিয়েটার রোড থেকে কস্তুরী এইমাত্র ওকে লেক গার্ডেন্সে নামিয়ে দিয়ে গেল। আসার সময় বিনানি সম্পর্কে যা বলল, তাতে শোনার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে আছে। কস্তুরী বলল, নমিতা বলে একটা মেয়েকেও বিনানি ফিল্মে নামানোর নাম করে ওই রিসর্টে তুলেছিল। তারপর তিন তিনটে মাস ওয়ার্কশপের নামে আটকে রেখে, ওকে ছিবড়ে করে দিয়েছিল। এ সব শুনে গাড়ি থেকে নামার পরই সায়ন ফোন করেছিল তিতাসকে। কিন্তু মেয়েটা ওর কথা বিশ্বাসই করল না।

তনিমাবউদির ফ্ল্যাটে যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না সায়নের। তবু মিনিট দশেক পর, রোশনির অনুরোধে, কাঞ্চনের সঙ্গে ওকে ওপরে উঠতেই হল। ওকে দেখে তনিমাবউদি বললেন, 'এসেছ? নাও, আগে ঠাকুরকে প্রণাম করে নাও। তারপর চলো ছাদে যাব। রোশন ওখানে আছে। উফ, সারাটা দিন আমাদের সঙ্গে কী খাটনিটাই না খাটল। ছেলেটা কী মিষ্টি, কী মিষ্টি।'

ঘরের ভেতর খুব সুন্দর আলপনা দেওয়া। মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। ঘর থেকে বেরিয়ে সেই ছাপ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'বাঃ বউদি, আলপনাটা কি আপনি দিয়েছেন?'

'কী যে বলো। ও তো রোশনের দেওয়া। ছেলেটার কত গুণ জানো? আমাকে কিছু করতে হয়নি। পুজোর ফল কাটা থেকে শুরু করে, এ বার সবই তো রোশনই করে দিল। বাড়িতে করার বোধহয় অভ্যেস আছে। এ বাড়ির লোকজনদের তো ও আজ অবাক করে দিল। লক্ষ্মীর পাঁচালি... বই না দেখে পুরোটা ও আউড়ে গেল। বাপ রে! আমিও রোজ পাঁচালি পড়ি ভাই। একটা পাতাও মনে থাকে না। পুরুতমশাইয়ের চোখও ট্যারা হয়ে গেছে আজ। এমন ছেলে ভাই, মেয়েদের থেকেও এককাঠি ওপরে। রেখাকে বললাম, এই ছেলেটাকে ঘরজামাই করে রেখে দে। এমন হিরের টুকরো ছেলে ছাড়িস না।'

বকবক করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন তনিমাবউদি। ছাদে উঠে বউদি বললেন, 'হ্যাঁ গো সায়ন, মাঝে মাঝে আমার অবশ্য সন্দেহও হচ্ছে। রোশন সত্যি সত্যি ছেলে তো? বিকেলে ছাদে উঠে দেখি, ক্যাটারারের লোকদের সরিয়ে দিয়ে নিজেই ও ধোকার ডালনা রান্না করছে। ও মা, এ তো মেয়েদের থেকেও ভালো রাঁধে। ফ্ল্যাটের লোকেরা সেই ডালনা খেয়ে ধন্যি ধন্যি করছে।' যত শুনছে, সায়নের মনে ততই অস্বস্তি বাড়ছে। রোশনি আজ একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি করে ফেলল। বাড়িতে সম্ভবত লক্ষ্মীপুজো করত। এখানে বাড়ির মতো পরিবেশ পেয়েছে। তাই নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। যাক গে, কালকেই তো কেটে পড়ছে। রঞ্জনের কাছে চলে যাচ্ছে। এই সব নাটক এখানে আর ওকে করতে হবে না।

ছাদে উঠে সায়ন দেখল, রঙিন ম্যারাপ বাঁধা, তার তলায় ফ্ল্যাট বাড়িরই কিছু লোক বসে খাচ্ছে। এক কোণে রোশনি দাঁড়িয়ে। ওর পরনে কাঞ্চনের পাজামা আর পাঞ্জাবি।

খুব সুন্দর মানিয়েছে ওকে। মেয়েটাকে যত দেখছে, ততই সায়ন অবাক হচ্ছে। আজ সকালে ও চমকে দিয়েছিল। ডাইনিং টেবলে বসে সায়ন খবরের কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ রোশনি এসে পরিষ্কার বলল, 'এই নাও সানুদা, তোমার চা।'

কাগজ গুটিয়ে রেখে, হাসিমুখে সায়ন বলেছি, 'আরে বাঃ, তুমি আমাদের ভাষা শিখলে কী করে?'

'কাঞ্চনদা শিখিয়েছে।'

আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছিল কাঞ্চন, 'কাল থেকে আমি ট্রেনিং দিচ্ছি। মাইরি, আমার এই ভাইটা জিনিয়াস। যা শোনে, তাই মুখস্থ করে ফেলে। তুই ভাবতে পারবি না। এফ এম-এ মান্না দে-র একটা গান হচ্ছিল। ওই যে রে...যখন কেউ আমাকে পাগল বলে, তার প্রতিবাদ করি আমি। রোশনিকে আমি বললাম, এই গানটা একবার শুনে তুই গাইতে পারবি? ও ঘাড় নাড়ল, পারবে। সত্যি, একবার শুনে আধখানা গান ও গেয়ে দিল। গানের গলাটাও খুব ভালো। আজ দুপুরেই ও আমাকে চাকমাদের ফোক সং শোনাচ্ছিল, দারুণ। এই সব গানের সঙ্গে যদি ওয়েস্টার্ন মিউজিক পাঞ্চ করা যায়, তা হলে ভাই একটা ব্যান্ড খুলে ফেলা যাবে। নতুন ধরনের ব্যান্ড। পার শো হাজার কুড়ি টাকা।'

কাঞ্চনের ওই কথাগুলো মনে পড়ায় সায়নের হাসি পাচ্ছিল। এমন সময় তনিমাবউদি বললেন, 'তোমরা খেতে বসে যাও সায়ন। ওপর নীচ করতে করতে আমার মাজা ধরে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পালা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দাও ভাই।'

ডেকোরেটরের টেবল-চেয়ার পাতা রয়েছে ম্যারাপের নীচে। ফাঁকা দুটো চেয়ার দেখে সায়ন আর কাঞ্চন বসে পড়ল। আর তখনই দেখল, রোশনি পরিবেশন করার জন্য এগিয়ে এসেছে। কোত্থেকে জলভরা মগ নিয়ে এল। মাটির গ্লাসে জল ঢালার ফাঁকে কাঞ্চনকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে কী না, সানুদাকে জিজ্ঞেস করো তো?' (চ)

সায়ন বলল, 'বল, ঘরে গিয়ে বলছি।'

লুচি, সুজির হালুয়া, খিচুড়ি, লাবড়া, ধোকার ডালনা, চাটনি, মিষ্টি। রোশনি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের খাওয়াচ্ছে। বাড়িতে খেতে দেওয়ার সময় মা যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক সেই রকম। খেতে খেতে রোশনির প্রতি তীব্র একটা টান অনুভব করল সায়ন। কাল বিকালেই এই মেয়েটা চলে যাবে। হয়তো আর কোনওদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না। কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল সায়নের। আচ্ছা, ওকে রেখে দেওয়া যায় না? দাদান বলেছিল, প্রেমে আর রণে কোনও কিছুই অন্যায় বলে কিছু নেই। একটু পরে নীচে গিয়ে ও যদি রোশনিকে রঞ্জন সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলে, তা হলে খুব পাপ করবে? যদি বলে, রঞ্জন দুশ্চরিত্র, লম্পট টাইপের ছেলে, তা হলে কি রোশনি তা বিশ্বাস করবে? অথবা ও যদি বলে, রঞ্জন আদৌ ওই ঠিকানায় থাকে না, তা হলে রোশনি অন্য

কাউকে দিয়ে যাচাই করবে? অথবা ও যদি বলে, রঞ্জন আদৌ ওই ঠিকানায় থাকে না, তা হলে রোশনি অন্য কাউকে দিয়ে যাচাই করবে? পরক্ষণেই এই চিন্তাগুলো মন থেকে সরিয়ে দিল সায়ন। না, না, প্রবল ভালোবাসার টানে রোশনি সব তুচ্ছ করে, এত ঝুঁকি নিয়ে এ দেশে ছুটে এসেছে। ওর বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত না।

একটা কাজ অবশ্য করা যেতে পারে। রোশনির বাবাকে খবরটা দিয়ে দেওয়া। দিলে, কলকাতায় এসে মেয়েকে উনি নিয়ে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। তাপস সেদিন বলছিল, পুলিশ বসিরহাটে বসে নেই। ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজছে রোশনিকে। কলকাতা পুলিশের সাহায্যও ওরা নিতে পারে। চট্টগ্রাম থেকে রোশনির বাবা কলকাতায় চলে এলে, পুলিশের ওপর চাপ হয়তো আরও বাড়বে। এই সময় কোনও টিভি চ্যানেলের সাহায্য যদি উনি নেন, রোশনির ছবি দিয়ে খোঁজ করতে থাকেন, তা হলে কেউ না কেউ পুলিশকে খবর দিয়ে দেবে। এই ক'দিন আগেই হাওড়ার একটা মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছিল। ক্যালকাটা টিভি তাকে ঠিক খুঁজে বের করেছিল। কথাটা মনে হতেই সায়ন ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হয়ে গেল। কী দরকার ছিল রোশনির আজ লক্ষ্মীপুজো নিয়ে মাতার? ফ্ল্যাটের এত লোক যে ওকে দেখে ফেলল। ওকে যদি পুলিশ এই ফ্ল্যাটে পায়, তা হলে সায়ন বিপদে পড়ে যাবে।

দাদান, একমাত্র দাদানই পারে, একটা সুপরামর্শ দিতে। নীচে নেমে আজ রাতেই দাদানকে একবার ফোন করতে হবে। রাত এগারোটার সময় ছাদ থেকে ওরা সবাই নেমে এল। ডাইনিং টেবলে বসে সায়ন খুব ভারাক্রান্ত মনেই সুখবরগুলো দিল রোশনিকে। কাঞ্চন মারফত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিল রোশনি। সোফায় বসে সেই সময় ওর মুখটা দেখছিল সায়ন। যেন খুশির জোয়ারে ভাসছে। মুখ থেকে চিন্তার সব রেখাগুলো উধাও হয়ে গেছে। কী ভালো লাগছে ওকে দেখতে। দেখলে মা ওকে পছন্দ করে ফেলত। সত্যি, রঞ্জন ছেলেটা ভাগ্যবান। এই রকম একটা মেয়ে ওকে ভালোবাসে। সোফায় বসে থাকার সময়ই সায়ন দেখল, কাঞ্চন খুনশুটি করছে। খিলখিল করে হাসছে রোশনি। ওদের কোনও কথাই সায়ন বুঝতে পারছে না। একটু অবাক হয়েই ও তাকিয়ে ছিল। সেটা লক্ষ করে কাঞ্চন হাসিমুখে বলল, 'আমার ভাইটা কী বলছে জানিস সানু, রঞ্জন নাকি প্রমিস করেছে, কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করবে। আমি বললাম, পুলিশ তোমাদের পিছনে এমন লেগে রয়েছে, ওখানে গিয়ে বিয়ে করলে, তোমাদের বাসরঘরটা কিন্তু কাটাতে হবে কালীঘাট থানার হাজতে। খবরদার ওটা করতে যেয়ো না। কথাটা শুনে ও হাসছে।'

সায়ন বলল, 'কলকাতায় রঞ্জনের কোনও আত্মীয়স্বজন নেই? ওর কাছে জেনে বল তো?'

'সে সালতামামি করা হয়ে গেছে। কলকাতায় কেন, বাংলাদেশেও নাকি রঞ্জনের তিনকুলে কেউ নেই। আর থাকলেও রোশনি সেটা জানে না। ও অনেকবার জানতে চেয়েছে রঞ্জনের কাছে। আমায় বলল, জানতে চাইলে নাকি রঞ্জন এড়িয়ে যেত।'

'রঞ্জনের কোনও ফোন নাম্বার ওর কাছে নেই?'

'আছে, এ দেশে এসে রঞ্জনকে ও ফোনও করেছিল। কিন্তু ওকে পায়নি। এ কারণে ওর একটু রাগও হয়েছে রঞ্জনের ওপর।'

'তোর কি মনে হয়, রঞ্জনের হাতে ওকে তুলে দেওয়া উচিত?

'তোর তো আর কোনও উপায়ও নেই। রোশনিকে নিয়ে আসার আগে তোর এ সব কথা ভাবা উচিত ছিল। ওর মুখে রঞ্জন সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, ছেলেটা ভয়ানক গোলমেলে ক্যারেক্টরের। সত্যি বলছি, মনটা খুব খচখচ করছে রে।'

'কিন্তু কস্তুরী তো ওর খুব প্রশংসা করল।'

'একটা কথা বলব সানু, তুই খচে যাবি না, প্রমিস কর।'

'না, না খচব কেন? কী বলবি, বল।'

'রোশনিকে তুই বিয়ে করে ফ্যাল না। তোর মা তো তোর বিয়ে দিতে চাইছেন।'

'আমি! কী বলছিস তুই? রোশনি রাজি হবে কেন? ও তো অন্য একজনকে ভালোবাসে।'

'এ সব নিয়ে তুই ভাবিস না। আমার দেশোয়ালি বোন। আমার হাতে ছেড়ে দে। তুই রাজি কী না বল।'

'না, না। এ সব কথা এখন থাক। অনেক রাত্তির হয়ে গেছে, কাল সকালে ভাবা যাবে।'

'এই রে, একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গেছি। বসিরহাট থেকে তাপস বলে তোর সেই বন্ধুটা ফোন করেছিল। মোবাইলে তোকে পায়নি। তোকে কল ব্যাক করতে বলেছিল, যত রাত্তির হোক।'

'ইস, এতক্ষণ বলিসনি?'

'তাপস ফোন করেছিল, মানে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। বসিরহাটে এমন কিছু ঘটেছে, যা ও জানতে চায়। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে, তাপসকে ফোন করল সায়ন, 'কী খবর রে? আমাকে ফোন করেছিলি কেন?'

'ক্যাপ্টেন, সিরিয়াস ব্যাপার। থানার বড়বাবু আজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল। তোর খোঁজখবর নিচ্ছিল। বলল, বাংলাদেশের মেয়েটা নাকি তোর সঙ্গে কলকাতায় গেছে? বাসে এখানকার একজন তোদের দেখেছে। সে-ই এসে পুলিশকে জানিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বাসের সেই চাপ দাড়িওয়ালা লোকটাকে মনে পড়ল সায়নের। ওই লোকটাই পুলিশকে খবরটা দিয়েছে। দম বন্ধ করে ও জানতে চাইল, 'আর কী জিজ্ঞেস করছিল রে?'

'তোর কনট্যাক্ট নাম্বার চাইছিল। আমি দিইনি। সেই মেয়েটার বাবা নাকি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। বড়বাবু আমার কাছে জানতে চাইছিল, আপনার বন্ধু কলকাতায় কোথায় থাকেন। আমি বললাম, জানি না। আমি কোনওদিন যাইনি। পুলিশ এখানে তোদের

pathagar.net

বাড়িতে গেছিল। তোর মা তখন তিতাসদের বাড়িতে। বাড়িতে কাউকে পায়নি বলে, পুলিশের সন্দেহটা আরও বেড়ে গেছে। তোর সব বন্ধুকে ডেকে পাঠাচ্ছে। রোশনিকেও নাকি ডেকেছিল। ক্যাপ্টেন, আমার ভয় করছে। রোসিকে বিশ্বাস নেই। ও আবার তোর নামে উলটো-পালটা কিছু বলে না বসে। একবার তো ও, তোদের লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে গেছিল। যদি ঠিকানাটা বলে দেয়, পুলিশ কালই তোর বাড়িতে পৌঁছে যাবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তোর আর কিছু বলার আছে?'

'আচ্ছা, রঞ্জন বলে কাউকে তুই চিনিস। থানায় এই ছেলেটাকে নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছিল। ওঁদের ধারণা, তুই রঞ্জনের পরিচিত। তোর মাধ্যমেই রঞ্জন ওই মেয়েটাকে কলকাতায় নিয়ে গেছে।'

ফোনটা ছেড়ে সায়ন কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। দু'একদিনের মধ্যে পুলিশ সব জেনে ফেলবে। তখন কী বলবে সায়ন? নিজেকে ডিফেন্ড করবে কী করে? বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখে জল দিয়ে এল ও। ঘরে ঢোকার সময় দেখল, ডাইনিং স্পেসের সোফা কাম বেডে কাঞ্চন শুয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে ঢুকল। আর ঢুকেই বিছানার দিকে তাকিয়ে ও মুগ্ধ হয়ে গেল। দক্ষিণের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে রোশনির ঘুমন্ত মুখে। ওকে পরির মতো লাগছে। অপলক দৃষ্টিতে ও রোশনির দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎই ওর মনে হল, এই মেয়েটির জন্য নিজের জীবনও তুচ্ছ করা যায়। ঘুমের ঘোরে রোশনি পাশ ফিরে শুল। পাছে ও জেগে ওঠে, সেই ভয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল সায়ন। বিছানায় টানটান শুয়ে পড়ল। ও এখন কী করবে, সেটা আজই ভেবে রাখতে হবে। হাতে খুব বেশি সময় নেই। দাদান একবার বলেছিল, 'জীবনে কোনও সমস্যায় পড়লে দাদুভাই, সবার আগে সমস্যার নার্ভ সেন্টারে পৌঁছোনোর চেষ্টা করবে। বাকি সব ছেঁটে ফেলবে। তখন দেখবে, সমাধান বেরিয়ে আসছে।' শুয়ে শুয়ে সায়ন সেই নার্ভ সেন্টারে পৌঁছোনোরই চেষ্টা করতে লাগল।

তিতাসের কথা ও মন থেকে ছেঁটে ফেলেছে। কোনও সন্দেহ নেই, এখন ওর মন জুড়ে রয়েছে রোশনি। ও কি রোশনির প্রেমে পড়ে গেছে? সায়ন গভীর চিন্তায় ডুব দিল। কথাটা সত্যি, রঞ্জনের কাছে রোশনিকে দিয়ে আসতে ওর মন চাইছে না। এটাও সত্যি, ও চায় না, রোশনিকে ওর বাবা জোর করে চট্টগ্রাম নিয়ে যান। তা হলে তো চিরকালের জন্য রোশনি ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। সায়ন ভাবতে লাগল, সত্যিই ও কী চায়? অনেক রাত পর্যন্ত এই চিন্তাটাই ও করতে লাগল। রঞ্জনের কাছে যাওয়ার জন্য রোশনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। না নিয়ে গেলে, বেচারি ভয়ানক হতাশ হবে। এমন কী, ওকে ভুল বুঝতেও পারে। ভাবতে পারে, ওর কোনও ইন্টারেস্ট আছে। দাদান, একমাত্র দাদানই ওকে বুদ্ধি দিতে পারেন। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়ন দেখল, প্রায় এগারোটা। এত রাতে জেগে থাকার কথা নয় দাদানের। সায়ন ঠিক করল, কাল সকালেই হাসনাবাদে

একবার ফোন করতে হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সায়ন এই সব কথাই ভাবতে লাগল। মাঝ রাতে হঠাৎ শুনতে পেল, বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটা কি পুলিশের জিপ? ধড়মড় করে ও উঠে বসল। পুলিশ শেষ পর্যন্ত এসেই গেল?

pathagar.net

বসিরহাটে এস পি-র অফিসের দিকে রওনা হওয়ার সময় আবীর চৌধুরি একটু হালকা বোধ করলেন। না, ইন্ডিয়ান পুলিশ সত্যি সত্যি রোশনিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ঘলঘলিয়া থেকে ওঁর সঙ্গে বসিরহাটে এসেছেন ভায়রাভাই দীপ্তেন, শ্যালিকা রমলা আর ওদের মেয়ে অমলাও। এপারে ওদের এক আত্মীয় থাকেন। সদানন্দ তালুকদার। চায়ের ব্যবসা করেন। তাঁর বাড়িতেই সবাই মিলে উঠেছেন আবীর চৌধুরিরা। দেশভাগের পর থেকেই সদানন্দবাবু বসিরহাটে আছেন। স্থানীয় মানুষজনকে মোটামুটি চেনেন। এসপি রজত কুমারের সঙ্গেও তাঁর জানাশোনা আছে। আবীর চৌধুরিকে তিনিই এসপি-র অফিসে নিয়ে যাচ্ছেন।

রজতকুমারের মুখে আবীর চৌধুরি শুনেছেন, একটা লোকাল ছেলের সঙ্গে নাকি রোশনি কলকাতায় গেছে। সেই ছেলেটার সঙ্গে রোশনির যেভাবেই পরিচয় হয়ে থাকুক না কেন, আবীর চৌধুরির দৃঢ় বিশ্বাস তার কোনও দোষ নেই। আসল কালপ্রিট রঞ্জন তালুকদার। সে-ই মেয়েটাকে ফুঁসলে নিয়ে গেছে। অমলার মুখে রঞ্জনের কথা যেদিন তিনি শোনেন, সেদিনই আবীর চৌধুরির খেয়াল হয়েছিল, মেয়ে আর ছোটটি নেই। বড় হয়ে গেছে। বয়স প্রায় কুড়ি বছর। এই বয়সে প্রেমে পড়তেই পারে। রোশনির মোবাইল ফোনটা অমলা তখন এনে দিয়েছিল। সেই ফোন থেকে পরে বেশ কিছু নাম্বার পেয়েছে খুলনার পুলিশ। জানতে পেরেছে, রঞ্জন ছেলেটি দু'একদিন অন্তর অন্তরই ফোন করত। কথা বলত তিরিশ-চল্লিশ মিনিট ধরে। একেক দিন একেক নাম্বার থেকে ও ফোন করত। তার মধ্যে একটা কমন নাম্বার কলকাতার এক নাইট ক্লাবের। সেই নাম্বারটা খুলনার পুলিশ কলকাতার পুলিশকে দিয়েছে। ওরা কী করল, রজতকুমারের কাছে গেলে আবীর চৌধুরি সেটা জানতে পারবেন।

এস পি-র অফিসে পৌঁছোতেই রজতকুমার হাসিমুখে বললেন, 'আর একটা দিন ওয়েট করুন মিঃ চৌধুরি। আশা করছি, কালকের মধ্যে রোশনিকে আপনার হাতে তুলে দিতে

পারব।'

'লোকাল ছেলেটাকে ধরতে পেরেছেন?'

'না, এখনও পারিনি। সে এখনও কলকাতায়। তবে ওর বন্ধু-বান্ধবদের ইন্টারোগেট করেছি। আমাদের মনে হচ্ছে, আপনার মেয়ের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ড বা অন্য কোথাও পরিচয় হয়েছিল ওর। ও হয়তো জানেও না, আপনার মেয়ে পালিয়ে এসেছে। আপনার মেয়ে হয়তো ওর সাহায্য চেয়েছিল। ছেলেটা সেই কারণেই ওকে সঙ্গ দিয়েছে। তবুও আমরা কোনও চান্স নিচ্ছি না।'

'কলকাতায় ছেলেটা কোথায় থাকে, তা জানতে পারলেন?'

'অ্যাড্রেসটা এই মাত্র পেলাম, ওর এক বন্ধুর কাছ থেকে। ইন ফ্যাক্ট সে এখানেই বসে আছে। আপনার ডান দিকে। এই যে, এ হল রোসি। আর রোসি...ইনি রোশনি চৌধুরির বাবা।'

ঘাড় ঘুরিয়ে আবীর চৌধুরি ছেলেটার দিকে তাকালেন। দেখেই মনে হল, ভালো পরিবারের ছেলে। পরনে দামি জামা প্যান্ট। ব্যবসা-ট্যাবসা করে মনে হয়। ছেলেটাকে হঠাৎ বলল, 'স্যার আপনি বললেন বটে, সানুর সঙ্গে রোশনির হয়তো বাস স্ট্যান্ডে দেখা হয়েছিল। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

এসপি বললেন, 'কেন, এ কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন?'

'স্যার, ভাসানের দিন অনেক রাতে আমি সানুর বাড়িতে গেছিলাম। ও তখন নীচের তলায় বসে ছিল। ওর মা সেদিন ছিলেন না। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন আমার মনে হয়েছিল, বাড়িতে ও একা নেই। দোতলায় আরেকজন কেউ আছে। দোতলার বাথরুমে তখন কেউ স্নান করছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওপরে কে রে? ও তখন থতোমতো খেয়ে, কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমার এখন মনে হচ্ছে, পুলিশের তাড়ায় সানুদের বাড়িতে লুকিয়ে পড়েছিল এই মেয়েটি। আর সানু সেটা জানত। সম্ভবত আমাদের আরেক বন্ধু তাপসও সেটা জানত। পয়েন্ট হচ্ছে, জানা সত্ত্বেও কেন ওরা পুলিশকে ইনফর্ম করেনি। এটাই আমাকে অবাক করছে।'

'তাই নাকি? কিন্তু তাপসবাবু যে বলে গেলেন, উনি কিছু জানেন না। আপনি সিওর, সেই সময় দোতলায় কেউ ছিল?'

'হান্ড্রেড পারসেন্ট স্যার। আমি বিজনেস করে খাই। আমার চোখ ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।'

'রোশনির জন্য সানু কলকাতায় যায়নি স্যার। ও নিজের দরকারেই কলকাতায় গেছে। কারণটা আমি ভালো মতো জানি। বলব?'

'অফকোর্স বলবেন। পুলিশের কাছে কোনও কিছু লুকোবেন না প্লিজ।'

'সানু কলকাতায় গেছে ওর প্রেমিকা তিতাসকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ওর মা-ই ওকে জোর করে ওখানে পাঠিয়েছে। তিতাস বসিরহাটেরই মেয়ে। মনে আছে সার, গতবছর

ডান্স কম্পিটিশনে যে মেয়েটা আপনার হাত থেকে ফার্স্ট প্রাইজটা নিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই সায়ন ভালোবাসে তিতাসকে। দু'বাড়ির গার্জেনরা বিয়ে দিতে রাজি। কিন্তু তিতাস এখনই বিয়ে করতে চায় না। ও অ্যাক্টিং কেরিয়ার পারস্যু করতে চায়। ওর বাবা-মা চাপ দিচ্ছিল। তাই রাগ করে তিতাস কলকাতায় চলে গেছে। ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য সানুর মা সানুকে কলকাতায় পাঠিয়েছে।'

এসপি হাসতে হাসতে বললেন, 'জটিল ব্যাপার। কিছু বুঝছেন মিঃ চৌধুরি? এখনকার ইয়ং ছেলেমেয়েদের সাইকোলজি আমাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল।'

রোসি বলল, 'ঠিক বলেছেন সার। সত্যিই জটিল হয়ে গেছে। তিতাস কলকাতায় গিয়ে ডিসকভার করেছে, সায়নের আরেকজন লাভার আছে। শুধু তাই নয়, সায়ন তার সঙ্গে লিভ টুগেদারও করে।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'তিতাস নিজে আমাকে ফোন করে জানিয়েছে। সায়নের মতো ছেলে যে এরকম করতে পারে, ওকে দেখে বুঝতেই পারবেন না স্যার। আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন।'

হাসতে চাইলেও হাসতে পারলেন না আবীর চৌধুরি। রোসির কথা শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। তা হলে পুলিশের আন্দাজ ঠিক নয়। লোকাল ছেলেটাও ক্যাসানোভা টাইপের। এসপি-কে তিনি বললেন, 'আপনারা রঞ্জন আর এই ছেলেটা দু'জনকেই ফোকাস করুন। আমার মনে হয়, ওদের একজনকে ধরতে পারলেই রোশনিকে পাওয়া যাবে।'

'আমাদেরও তাই মনে হয়। যে নাইট ক্লাবে ছেলেটা চাকরি করে, আজ সন্ধেবেলাতেই আমরা সেখানে রেইড করব। ডিডি-র বেস্ট অফিসারটাকে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি। বরুণ গুহনিয়োগী। আগে আমার আন্ডারে কাজ করেছে। একটা কথা বলি। আপনি বরং আজ কলকাতায় চলে যান। কোথায় থাকবেন, আমাকে তা জানিয়ে দেবেন। আপনার ফোন নাম্বারটা অবশ্য আমি বরুণকে দিয়ে দিচ্ছি। ও আপনার সঙ্গে টাইম টু টাইম যোগাযোগ রাখবে।'

কথাগুলো বলেই রজতকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। এতক্ষণ সদানন্দবাবু কোনও কথা বলেননি। এসপি সাহেবকে উঠতে দেখে, একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে উনি বললেন, 'স্যার, আপনার জন্য একটু চা এনেছি। দার্জিলিংয়ের নতুন ব্যান্ডের চা। যদি খেয়ে বলেন কেমন, তা হলে স্যার বিক্রি শুরু করব।' বলেই উনি হাতজোড় করলেন।

'থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ তালুকদার।' হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে রজতকুমার বললেন, 'কত দাম?'

'সার, দামের কথা পরে হবে। আগে আপনি খেয়ে দেখুন টেস্ট কেমন। আপনার গার্ডদের মুখে শুনেছি, আপনি চা খেতে খুব ভালোবাসেন।'

'না মিঃ তালুকদার।' পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিলেন

রজতকুমার, 'এটা রেখে দিন। দাম কেটে নিয়ে বাকিটা পরে কোনও গার্ডের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।'

ঘটনাটা দেখে আবীর চৌধুরি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ইন্ডিয়ান পুলিশ এতটা সৎ? বাংলাদেশের পুলিশ হলে তো চায়ের প্যাকেট হাতে নিয়ে প্রথমেই বলত, 'ভালো করসেন। মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দিয়েন।' মনে একটা বিশ্বাস নিয়ে আবীর চৌধুরি বেরিয়ে এলেন এসপি সাহেবের বাংলো থেকে। ঠিক করলেন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই রওনা হবেন কলকাতার দিকে। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে পৌঁছোতে। ওখানে গেলে তিনি সাধারণত উঠতেন সদর স্ট্রিটের এক হোটেলে। এর আগে স্ত্রী চপলাকে নিয়ে এসে অনেকবারই তিনি কলকাতায় পুজোর বাজার করেছেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আবীর চৌধুরি আর যাননি। সাংবাদিক বন্ধুরা অনেকবার অনুরোধ করেছেন, তা সত্ত্বেও যেতে মন চায়নি। একেবারে ভিন্ন কারণে এ বার কলকাতায় যেতে হচ্ছে। এস পি-র বাংলো থেকে বেরিয়ে আবীর চৌধুরি গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় রোসি কাছে এসে বলল, 'স্যার, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। কলকাতায় সায়ন যেখানে থাকে, সেই ঠিকানাটা কি আপনার দরকার?'

কে সায়ন? ওহ, সেই লোকাল ছেলেটি? নামটা শুনে থমকে দাঁড়ালেন আবীর চৌধুরি। মন্দ কী? ঠিকানা সঙ্গে থাকলে কলকাতায় গিয়ে তিনি নিজেও ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। তাই আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'দাও।'

একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়ে রোসি বলল, 'এসপি বলছিলেন, আপনি চট্টগ্রামের খুব নামকরা রিপোর্টার। আপনার নাকি গভর্মেন্ট লেবেলে অনেক জানাশুনো। পরে যদি কোনও দরকার হয়, তা হলে কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে?'

চিরকুটটা হাতে নিয়ে আবীর চৌধুরি বললেন, 'কী দরকারে?'

'সেটা এখন বলব না। এখন আপনি খুব ডিসটার্বড। সঙ্গে নেমকার্ড থাকলে দিন। পরে না হয় আপনাকে ফোন করব। আমার নাম রসিকলাল মিত্র। ডাকনাম রোসি। মনে থাকবে তো স্যার আপনার?'

ছেলেটার বলার ভঙ্গিটা ভালো লাগল আবীর চৌধুরির। এই ধরনের একটা ছেলে রোশনির জন্য পেলে খুব ভালো হত। এ-দিককার ছেলে মেয়েরা কত স্মার্ট। ছেলেটার সম্পর্কে সদানন্দবাবুর কাছে পরে খোঁজ নেওয়া যাবে। পকেট থেকে একটা নেমকার্ড বের করে তিনি বললেন, 'মনে থাকবে। নামটা ইতালির বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ারের, মনে থাকবে না?'

রোসি বলল, 'স্যার, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আর একটা কথা বলি। আপনি যদি চান, তা হলে কলকাতায় সায়নের বাড়িতে আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি।'

সঙ্গে কোয়ালিস গাড়ি, স্বচ্ছন্দে আটজন যাওয়া যায়। চারজনের জায়গায় পাঁচজন গাড়িতে গেলে, কী এমন ক্ষতি? ছেলেটার সঙ্গে ভালো করে আলাপটাও সেরে নেওয়া

যাবে তা হবে। ফ্যামিলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাবে। হয়তো দেখা যাবে, ওর বাপ-ঠাকুর্দার কেউ এসেছেন বাংলাদেশের কোনও জায়গা থেকেই। কোনও কিছু না ভেবেই আবীর চৌধুরি বললেন, 'তা হলে তো ভালোই হয়। বেলা দুটোর সময় আমরা রওনা হব। সদানন্দবাবুর বাসায় চলে এসো। চেনো তো?'

রোসি ঘাড় নেড়ে বলল, চেনে।

... বেলা দু'টোর সময় সবাইকে প্রায় তাড়া দিয়ে গাড়িতে তুললেন আবীর চৌধুরি। ড্রাইভারের পাশে তিনি বসেছেন। মাঝের তিন সিটারে দীপ্তেন, রমলা আর অমলা। একেবারে ব্যাক সিটে রোসি। একটু আগেই রোসির সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়েছে, দেশভাগের আগে রোসির দাদু নাকি খুলনার ঘলঘলিয়ায় থাকতেন। দেশভাগ হওয়ার একদিন পর খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনই নাকি রোসির দাদু পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইছামতীর এ পারে চলে আসেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি থাকতে চাননি। রোসি সম্পর্কে ধারণাটা মিলে যাওয়ায় আবীর চৌধুরি মনে মনে খুশি। ছেলেটা গ্রাজুয়েট। সবে ব্যবসা করতে নেমেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। ব্যস, আর কী চাই? ছেলেটাকে একটু মদত দিলে চড়চড় করে উঠে যাবে। সাংবাদিক জীবনে কত ছেলেকে কত রকম সাহায্যই তো তিনি করেছেন। এই ছেলেটাকেও করা যায়। অন্তত রোশনির মুখের দিকে তাকিয়ে।

সদর স্ট্রিটে হোটেলটা চালায় দিলু খোন্দকার বলে একটা ছেলে। বারাসাত পৌঁছোনোর পর তাকে ফোন করলেন আবীর চৌধুরি। দু'টো রুমের কথা আগাম বলে রাখা দরকার। কালীপুজো আর বড়দিনের মাঝে প্রচুর বিদেশি আসে ওই সব হোটেলগুলোতে। তখন ঘর পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। এর আগে একবার হোটেলকে না জানিয়ে, চপলাকে নিয়ে এসে তিনি খুব সমস্যায় পড়েছিলেন। ও প্রান্তে ফোনটা কেউ তুলেছে। আবীর চৌধুরি বললেন, 'দিলু আছে নাহি? আমি চিটাগাংয়ের আবীর চৌধুরি।'

'আরে, ক্যামন আছেন? কোইথেইকা কন?'

'আপনার হোটেলেই আইতাসি। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছামু। দুইডা রুম রাইখ্যা দিবেন। পাওয়া যাইব তো? সঙ্গে ফ্যামিলি আসে।'

'পাওয়া যাইব না মানে? না পাওয়া গেলে আমার বাসায় থাকবেন। মিঞা, আপনের মাইয়ারে পাওয়া গেছে? হুনলাম, কিডন্যাপড হইসে।'

'কার কাসে হুনলেন?'

'দ্যাশের লোকের মুখে। আপনের নামটা শুইন্যা কপাল চাপড়াই। হায় হায়, মানষের এমুন কপাল।'

'মাইয়া কিডন্যাপড হয় নাই। রাগ কইর‍্যা পলাইয়া আইসে।'

'তাই নাহি। পুলিশ কী কয়?'

'আইয়া কইতাসি। আপনে রুম ঠিক কইর‍্যা রাখেন।'

ফোনটা বন্ধ করে আবীর চৌধুরি গুম হয়ে গেলেন। রোশনির ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে, টিভি-তে খুব পাবলিসিটি হয়ে গেছে। কিডন্যাপ হওয়ার কথা রটেছে। এই মেয়েকে বাংলাদেশে এখন বিয়ে দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। মেয়েটা কেন এমন বোকামি করল, তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। আরে, পিসি তোকে দু'টো কটু কথা বলেছে, তাই বলে তুই রাগ করে পালিয়ে আসবি? কেমন মেয়ে রে তুই? আমার কথাটা একবারও ভাবলি না? রঞ্জনের সঙ্গে কেন আমাকে আলাপ করিয়ে দিলি না? তোর যদি ওকে এতই পছন্দ, তা হলে আমাকে বললেই পারতিস। তুই তো এত গোঁয়ার মেয়ে ছিলি না। মনে মনে আবীর চৌধুরি এ সব নিয়েই ভাবতে লাগলেন।

দীপ্তেন কথা বলছে রোসির সঙ্গে। রোসির বাবার নামটা জেনে, দীপ্তেন নাকি তাঁকে চিনতে পেরেছে। ওরা পাশের গ্রামেই থাকতেন। শুনে রোসি খুব উৎসাহ নিয়ে বাবার কথা বলছে। ইতিমধ্যেই ছেলেটা দীপ্তেনকে খুড়ো বলে ডাকতে শুরু করেছে। ওর মুখে বাঙাল ভাষা শুনে ভালো লাগছে আবীর চৌধুরির। না, এখনও শেকড়টাকে এরা উপড়ে ফেলেনি। বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তবুও এ দিকে কান খাড়া করলেন তিনি। রোসির কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে। 'বাবারে আর কাম করতে দি না খুড়া। বয়স হইসে। বাবার ব্যবসা এহন আমি দেহি। বাবারে কইসি, সংসারের টেনশন আর তোমারে নিতে অইব না। অহন রেসপন্সিবিলিটি আমাগো উপর ছাইড়া দাও।'

'বিয়া করস নাহি?' দীপ্তেন জানতে চাইল।

'না খুড়া। কারে ভরসা কইর‍্যা ঘরে আনুম কন? আইয়াই তো বাবা-মারে নেগলেক্ট করব। অশান্তি করব। বাবা-মারে কইসি, তোমরা মাইয়া পছন্দ করো। তোমরা যারে কইব্যা, তারে বিয়া করুম। দেইখো, পরে আমাকে দুষ দিও না।'

আরে বাঃ। এমন ছেলেও তা হলে এখানে আছে? রোসিকে যত দেখতে লাগলেন, ততই মুগ্ধ হতে লাগলেন আবীর চৌধুরি। না, এ ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ছেলেটা যোগাযোগ রাখবে বলেছে। নিশ্চয়ই কোনও সাহায্য চায়। এ ছেলের জন্য কিছু করতে পারলে, তিনি খুব খুশি হবেন। রোশনির ঝামেলাটা মিটে যাক। তারপর নেমতন্ন করে ছেলেটাকে নিয়ে যাবেন চট্টগ্রাম। রোশনির পছন্দ হলে, নিজে এসে রোসির বাবার কাছে তিনি বিয়ের কথাটা পাড়বেন। আবীর চৌধুরি মনে মনে ভাবলেন, সিদ্ধান্তটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত যতগুলো বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সব ক'টাই চটজলদি। পরে দেখেছেন, খুব একটা ঠকেননি।

গাড়ি যখন মধ্যমগ্রামে তখন মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। অচেনা নম্বর, তবুও সুইচ অন করলেন আবীর চৌধুরি। এ কী...ও প্রান্তে কার গলা? রোশনির মা? রোশনি বলছে, 'পাপা, আমারে মাফ কইর‍্যা দিও।' (৮) বলেই ফুঁপিয়ে উঠল। স্থান কাল ভুলে আবীর চৌধুরি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রোশনি, মা, তুই কোথায়।'

দুপুরবেলায় ডাইনিং টেবলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছিল রোশনি। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবলে রেখে, ওর দিকে তাকিয়ে রইল সায়ন। সদ্য স্নান করে এসেছে। পরনে হালকা নীল রঙের সালোয়ার কামিজ। কী সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। কাল থেকে কিচেনের হাল ধরেছে রোশনি। ওদের রান্না করে খাওয়াচ্ছে। এক একদিন একেকটা আইটেম। আজ চিকেন বিরিয়ানি করেছে। গন্ধে ম ম করছে ঘরটা। এতদিন বাইরের খাবার খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছিল। রোশনির জন্য তাও স্বাদ বদলানো যাচ্ছে। সোফায় বসে কাগজ পড়ছিল কাঞ্চন। বিরিয়ানির গন্ধ পেয়ে বলল, 'দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে তো। আজ কী কী করলি রে রোশনি?'

'তেমন কিছু না। চিকেন বিরিয়ানি আর জলপাইয়ের চাটনি।'

শুনে কাঞ্চন জিভ দিয়ে জল টানার শব্দ করল। মনে মনে হাসল সায়ন। কাঞ্চনের ট্রেনিং কাজে দিচ্ছে। এখানকার ভাষা রোশনি অল্প অল্প করে বলতে পারছে। প্লেট এগিয়ে দেওয়ার সময় রোশনি হঠাৎ ওর দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়েই রইল। কাল সকাল থেকে সায়ন টের পাচ্ছে, রোশনি মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে থাকছে। রাতে সায়ন যখন ফ্রিজ থেকে জলের বোতল নেওয়ার জন্য পাশের ঘরে ঢুকেছিল, তখন কেন জানে না ওর মনে হয়েছিল, রোশনি ঘুমোয়নি। ও চোখ খুলে রেখেছিল। দেখছিল, সায়ন কী করে। অন্ধকারের মধ্যেও সায়ন এটা অনুভব করেছিল তখন। কিন্তু এখন রোশনির দিকে তাকিয়ে বুকটা শিরশির করছে সায়নের।

চোখের ভাষায় রোশনি কি কিছু বলতে চাইছে? সেটা বোঝার জন্য এ বার সায়ন চোখ সরাল না। চোখের ভাষাতেই ও বলতে চাইল, 'তোমাকে ছাড়তে মন চাইছে না রোশনি।'

কী আশ্চর্য, রোশনি যেন বলল, 'আমারও তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না গো।'

'রঞ্জনকে ছেড়ে আসা তোমার পক্ষে কি একেবারে অসম্ভব?'

pathagar.net

'রঞ্জন যে আমাকে ভালোবাসে সায়ন।'

'ওর থেকে আমি যদি তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসি, তা হলে?'

'কিন্তু আমি যে তোমার যোগ্য নই। আমি লেখাপড়া শিখিনি। তোমাদের সমাজে আমি অচল। তুমি খুব ভালো ছেলে সায়ন। এই ক'দিন তো তোমাকে দেখলাম। তোমার মতো ছেলে পাওয়া মুশকিল।'

'লেখাপড়াটাই কি সব? কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না সোনা।'

'কিন্তু তিতাস? কাঞ্চনদার কাছে তিতাসের সব কথা আমি শুনেছি। তার কী হবে?'

'তিতাস তো আমাকে কোনওদিন ভালোবাসেনি। ভালোবাসা কি কখনও একতরফা হয়? তুমি বুঝতে পারছ না? তুমি জানো না রোশনি, সবার সামনে ও আমাকে কী ভাবে অপমান করেছে।'

'আমি জানি, সেদিন তোমার চোখমুখ দেখে আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। তোমাকে কবে থেকে আমার ভালো লাগতে শুরু করল জানো? যেদিন আমার জ্বর হয়েছিল। তুমি সারা রাত আমার সেবা করেছিলে। সেদিনই তোমাকে আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম।'

'তুমি কি জানো, সেদিন আমি কী রকম ভয় পেয়ে গেছিলাম?'

'জানি। তোমার চোখ দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি, না রঞ্জন কার দিকে যাব, আমি বুঝতে পারছি না। আমি এখন কী করব সায়ন, তুমিই বলে দাও।'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

কাঞ্চন গলা খাঁকরি দেওয়ায় রোশনি চোখ নামিয়ে নিয়েছে। দু'জনের নীরব সংলাপ বিনিময়ে ছেদ পড়ল। ঠিক সেই সময় সায়নের মোবাইল ফোনটা বিশ্রীভাবে বেজে উঠল। সুইচ অন করে ফোনটা কানে দিতেই ও প্রান্ত থেকে মা রাগি রাগি গলায় বলল, 'সানু এ সব কী শুনছি রে? বাপ-ঠাকুর্দার সম্মানটা তুই এ ভাবে ধুলোয় মিলিয়ে দিবি?'

শুনে ধক করে উঠল সায়নের বুক। মা কি তা হলে সব জেনে গেছে? দুর্বল গলায় ও বলল, 'কেন মা, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে? শয়তান ছেলে। ছি ছি, তোর জন্য কি শেষ পর্যন্ত আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে? পুলিশ এসে বলে গেল, তুই নাকি কোন মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় গেছিস? ক'দিন আমি বাড়িতে নেই। আর এর মধ্যে তুই এ সব কাণ্ড...এ কী রে?'

মায়ের গলাটা কাঁদোকাঁদো। মুহূর্তে মনস্থির করে নিল সায়ন। বলল, 'পুলিশকে তুমি কী বললে মা?'

'কী বলব। বললাম, আমার ছেলে এ কাজ করতেই পারে না। আর যদি করে থাকে, তা হলে বঁটি দিয়ে কেটে ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। আপনাদের কাছে কী প্রমাণ আছে?'

'তুমি ঠিক বলেছ মা। লেক গার্ডেন্সে আমি একজন এনে রেখেছি, কথাটা সত্যি। তবে

সে মেয়ে নয়। ইচ্ছে করলে তুমি তনিমাবউদিকে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

'কিন্তু সে যে সেদিন বলল, বোরখা পরা একটা মেয়েকে তোর সঙ্গে ঢুকতে দেখেছিল?'

'সে তো কাঞ্চনের ভাই রোশন। বউদি তার কথা তোমায় বলেনি?'

'বলেছে, তবে কই, আগে তো কাঞ্চনের মুখে কখনও শুনিনি, ওর ভাই-টাই আছে? কাঞ্চন কোথায়? ফোনটা দে তো তাকে?'

মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঞ্চন সবই শুনছিল। ফোনটা হাতে নিয়ে ও বলল, 'বলুন মাসিমা।'

মায়ের সঙ্গে কাঞ্চন কথা বলতে লাগল। টুকরো টুকরো উত্তর শুনে সায়ন বুঝতে পারল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মা সব জিজ্ঞেস করছে। মা প্রচণ্ড রেগে আছে। রাগাটাই স্বাভাবিক। বসিরহাটের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। রোশনি সম্পর্কে মা কিছুই জানে না। তাই আকাশ থেকে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, পুলিশ যে কোনও সময় লেক গার্ডেন্সের বাড়িতেও চলে আসতে পারে। এ বাড়িতে এলে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। রোশনির আসল পরিচয়টা বেরিয়ে পড়বেই। সায়ন দ্রুত ভাবতে লাগল রোশনিকে নিয়ে কী করা যায়।

এক, রোশনিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায়। দুই। পুলিশের হাতে না দিয়ে, অন্য কোথাও সরিয়ে রাখা যায়। যাতে পুলিশ খুঁজে না পায়। তিন, রোশনিকে এখুনি রঞ্জনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। চার, কোনও কিছু না করে, রোশনির বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়। পুরো ঘটনাটা ওঁকে খুলে বলে, রঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায়। কী করলে, কী হতে পারে, সায়ন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। এই মুহূর্তে যদি ও রোশনিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, তা হলে মেয়েটা কোনওদিন ওকে ক্ষমা করবে না। বিট্রেয়ার ভাববে। সেক্ষেত্রে কোনও দিনই আর রোশনিকে ও নিজের মতো করে পাবে না। দুই , রোশনিকে যদি এই মুহূর্তে ও কোথাও সরিয়ে দেয়, ধরা যাক, কস্তুরীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখে, তা হলে পুলিশ ওকে ছাড়বে না। নানাভাবে ওকে হ্যারাস করবে। খবরের কাগজে বা টিভিতেও দেখাতে পারে, একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করার জন্য পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছে। সায়ন তা হলে লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে রোশনিকে সরিয়ে দেওয়া উচিত না। তিন নম্বর উপায় হল, পুলিশ আসার আগেই রোশনিকে রঞ্জনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দায়িত্ব খানিকটা সায়ন এড়াতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল, রঞ্জনকে ও এখন কোথায় পাবে? কস্তুরী বলল, রঞ্জনের জন্য কাল অনের রাত্তির অবধি ও নাইট ক্লাবে বসে ছিল। কিন্তু রঞ্জনকে সেখানে পায়নি। তবে একটা কাজ কস্তুরী করে এসেছে। সায়নের ফোন নাম্বারটা রঞ্জনের এক বন্ধুকে দিয়ে এসেছে। ক্লাবে এলে রঞ্জন যাতে সায়নের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে।

কস্তুরীর মুখে এ সব কথা শুনে সায়নের ধারণা হয়েছে, নাইট ক্লাবে গিয়ে পুলিশ

সম্ভবত রঞ্জনকে খুঁজেছে। আর রঞ্জন সেটা জানে। সেই কারণেই ও ক্লাবে যায়নি। ক্রমেই জটিল হয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতিটা। রোশনিকে নাইট ক্লাবে নিয়ে গিয়ে এখন আর রঞ্জনের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। কেননা, পুলিশের ভয়ে রঞ্জন কয়েকদিন নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। মুশকিল হল, রঞ্জনের আর কোনও কনটাক্ট নাম্বার নেই। যতক্ষণ না নিজে থেকে ও যোগাযোগ করবে, ততক্ষণ সায়নকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। হঠাৎই একটা কথা সায়নের মনে হল, কাঞ্চন আসার পর থেকে রোশনি কিন্তু রঞ্জনের প্রসঙ্গ একবারও তোলেনি। একবারও তাগাদা দেয়নি, রঞ্জনের কাছে আমাকে নিয়ে চলো। কথাটা মনে হতেই, সায়ন একটা আশার আলো দেখতে পেল। তবে কি রঞ্জন সম্পর্কে ও খানিকটা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে?

হতে পারে, নাও হতে পারে। এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত, বড় সমস্যা পুলিশ। তাপস বলেছিল, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। সত্যিই তাই। কাল রাতে সায়ন হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝতে পেরেছে। অনেক রাতে বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। ও ভেবেছিল, বোধহয় পুলিশের গাড়ি। তখন বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল। দম বন্ধ করে, অনেকক্ষণ ও ডোর বেলের শব্দ শোনার প্রতীক্ষায় শুয়ে ছিল। কম্পাউন্ডে হাঁটা-চলার শব্দ, ফিসফাস কথাবার্তা। খানিক পরে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই, একটা অদ্ভুত দৃশ্য ওর চোখে পড়ে। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় কাকে যেন গুডবাই জানাচ্ছে চারতলার কেকা। হঠাৎ গাড়ির জানলা দিয়ে কে যেন ওর মুখটা টেনে নিয়ে চুমু খেতে লাগল। তা হলে পুলিশ নয়। দেখে সায়ন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। কেকা ডিস্কো থেকে ফিরল।

ওই দৃশ্যটা ফের চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল কাঞ্চনের জন্য। ফোনটা এগিয়ে দিয়ে ও বলল, 'এই নে, মাসিমা তোর সঙ্গে কথা বলবে।'

ফোনটা হাতে নিয়ে সায়ন গম্ভীর গলায় বলল, 'হুঁ বলো।'

'এই শোন, কাল সকালেই আমি লেক গার্ডেন্সে যাচ্ছি। তোর দাদান আর দিদাই আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বসিরহাটে এসেছে। কাল ওদেরও কলকাতায় নিয়ে যাব। দাদান এখন এসপি-র সঙ্গে কথা বলতে গেছে। বোধহয় পরে তোকে ফোন করবে। সব কথা খুলে ওকে বলিস।'

'ঠিক আছে মা। আর কিছু বলবে?'

'টাকা পয়সা কি কিছু লাগবে? লাগলে ব্যাংক থেকে তুলে নিস। আর হ্যাঁ, তিতাসের কী খবর রে?'

'জানি না মা। কয়েকদিন খবর নিতে পারিনি। বোধহয় কলকাতায় নেই।'

'থাক, ওর খবর নেওয়ার দরকার নেই। বাঁদর মেয়ে। তোর অরূপকাকা ধরেই নিয়েছে, ও মরে গেছে। ভাবলাম এক, আর হল আর এক। কী আর বলব।'

'আক্ষেপ কোরো না মা। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য।'

'হয়তো তাই। যাক বাবা, পুলিশ যদি তোর কাছে যায়, তা হলে দাদানকে অবিশ্যি একবার ফোন করে জানাবি। আর শোন, পুলিশের কাছে কিন্তু উলটো-পালটা মেজাজ দেখাস না। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ মা, মনে থাকবে।'

'আহা রে, কাঞ্চনের ভাইটার কথা শুনে সত্যিই মন খারাপ হয়ে গেল। তুই যা করেছিস, ঠিক করেছিস। তোর বাবা বেঁচে থাকলে একই জিনিস করত।'

শুনে মারাত্মক হাসি পেয়ে গেল সায়নের। কাঞ্চন মাকে কী গুলগাপ্পা মেরেছে, তা শোনার সুযোগ পায়নি ও। তখন রোশনিকে নিয়েই ও ভাবছিল। মনে হয়, কাঞ্চন একটা সলিড বাউন্সার দিয়েছে। মা তাতেই বোল্ড আউট হয়ে গেছে। না হলে অনেকক্ষণ ধরে ফেলুদাগিরি করত। ভালো ছেলের মতো সায়ন বলল, 'তা হলে ছাড়ি মা।'

'ঠিক আছে, ছাড়। কী হল না হল, বিকেলে ফের ফোন করে জেনে নেব।'

মায়ের ফোন ছাড়ার পর হাঁফ ছাড়ল সায়ন। মারাত্মক খিদে পেয়েছে। বিরিয়ানি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে দেখে ও চুপচাপ খেতে শুরু করল। এক্সেলেন্ট টেস্ট। 'ক্লাসিক তন্দুর'-এর বিরিয়ানির থেকে দু'গুণ ভালো। কাঞ্চন সেদিন ঠিকই বলেছিল, 'চাকরি করার জন্য দিল্লি-ফিল্লিতে যাওয়ার দরকার নেই বুঝলি। মাসিমার কাছ থেকে লাখ পাঁচেক টাকা তুই চেয়ে নে। চল, আমরা তিনজন মিলে লর্ডসের মোড়ে একটা রেস্টুরেন্ট খুলি। চিফ শ্যেফ রোশনি। আমি ক্যাশ কাউন্টারে মাল-ফাল গুনব। আর তুই ওভারঅল সুপারভাইজ করবি। তোকে দেখে মেয়েরা আসবে। আইডিয়াটা কী রকম বল তো?' শুনে রোশনি খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল। সে সময় ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সায়ন তখনই নিশ্চিত হয়ে গেছিল, রোশনিকে দেখলে মা অপছন্দ করবে না। তিতাসের থেকেও সুন্দরী, এমন একজনকে এখন মায়ের দরকার।

পাশের ঘরে রোশনি কথা বলছে কাঞ্চনের সঙ্গে। বোধহয় মায়ের সঙ্গে ওর কী কথা হল, জানতে চাইছে। কাঞ্চন কী যেন ওকে বোঝাচ্ছে। রোশনি মানতে চাইছে না। সায়ন হাঁক পাড়ল, 'বিরিয়ানি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে রে। আগে খেতে আয়। তারপর যত ইচ্ছে কথা বল।' শুনে দু'জনেই কথা বলতে বলতে ডাইনিং স্পেসে এল। কাঞ্চন তখন বলল, 'এই দ্যাখ সায়ন, পাগল মেয়েটা কী বলছে।'

সায়ন জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছে রে?'

'বলছে, আমার জন্য তোমরা কেন পুলিশের ঝামেলায় পড়বে? ফোনটা দাও, বাবার সঙ্গে কথা বলব। সব দোষ আমার ঘাড়ে নেব। হঠাৎ সিস্টার নিবেদিতা হওয়ার কোনও মানে আছে?'

মায়ের ফোনটা পাওয়ার পর থেকেই আইডিয়াটা ওর মাথায় ঘুরছিল। সায়ন বলল, 'কথাটা কিন্তু ও মন্দ বলেনি। ফোনটা ও আরও আগে করলে ভালো করত। আফটার অল, ভদ্রলোক তা হলে দুঃচিন্তায় থাকতেন না।'

'তার মানে? তুই কী বলছিস সায়ন? তা হলে কী হত, ভাবতে পারছিস? ওর বাবা যদি জানতে পারেন, ও আমাদের কাছে আছে, তা হলে কি ও কোনওদিন রঞ্জনের কাছে পৌঁছোতে পারবে?'

'আমার তো মনে হয়, রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে ওর উচিত, বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।'

মুখ নিচু করে রোশনি দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। তা দেখে কাঞ্চন বলল, 'এটা প্রথম কান্না নয়। সকালে একপ্রস্থ হয়ে গেছে। কী হয়েছে জানিস, ভোরবেলায় বাবাকে ও স্বপ্নে দেখেছে। তারপর থেকেই মনটা খারাপ। আমি বললাম, বাবাকে যদি এতই ভালোবাসিস, তা হলে রঞ্জনের জন্য পালিয়ে এলি কেন? বাবার কথা তখন তোর মনে হয়নি? কথাটা শুনে তখন কেঁদে ফেলল। মাইরি, সকাল থেকেই আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে, বাবাকে একটা ফোন করব। তোমাদের মোবাইল থেকে করব না। তুমি আমাকে কোনও পাবলিক বুথে নিয়ে চলো। এতক্ষণ ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। পুলিশ তোকে খুঁজছে জানার পর জেদ ধরেছে, এখুনি বাবার সঙ্গে কথা বলবে। কী করি বল তো?'

'ঠিক আছে, নিয়ে যা। লর্ডসের মোড়ে ফোনের বুথ আছে। কিন্তু সাবধান কাঞ্চন। কেউ যাতে শুনে না ফেলে। বুঝতে না পারে।'

নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে, রোশনির দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঞ্চন বলল, 'চোখের জল আর নাকের শিকনি মুছে নাও মা। বুথে গিয়ে ফোনটা কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করো। বাপের সঙ্গে বেশি ডায়লগ মারতে যেয়ো না। বাই দ্যাট টাইম, পুলিশের হাতে আমরা অ্যারেস্ট হয়ে গেলে, তোমার রান্না করা অত সুন্দর বিরিয়ানিটা খাওয়ার সুযোগ আর পাব না।'

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, খাওয়া শেষ করে সায়ন টিভি দেখার জন্য বসল। আর তখনই ওর মোবাইলটা বেজে উঠল। নিশ্চয়ই হাসনাবাদ থেকে দাদান। ও প্রান্ত থেকে কেউ কিছু বলার আগেই সায়ন বলে উঠল, 'দাদান, তোমার কথাই ভাবছিলাম। টার্গেট ফিক্স করা হয়ে গেছে। প্যারাগন অব বিউটি। দেখলে তোমার পছন্দ হবেই। এ বার তোমার সাহায্য দরকার।'

ও প্রান্ত থেকে কেউ কোনও কথা বলছে না দেখে সায়ন একটু অবাক হল। ও এবার জিজ্ঞেস করল, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

ও প্রান্ত থেকে পালটা প্রশ্ন, 'সায়ন দাশগুপ্ত?'

'বলছি। আপনি?'

ভয়ঙ্কর গলায় লোকটা বলল, 'শুয়ারের বাচ্চা। রোশনি চৌধুরি বলে একটা বাংলাদেশি মেয়েকে তুই কিডন্যাপ করেছিস। পুলিশের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাস, তা হলে এক লাখ টাকা নিয়ে সাউথ সিটি মল-এ চলে আয়। মেয়েটাকে তোরা কোথায় রেখেছিস, আমরা সবই জানি। তোকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। ঠিক দশ মিনিট আগে

রিমাইন্ডার দেব। না এলে মারাত্মক বিপদে পড়বি।'

কথাগুলো বলেই লোকটা লাইন কেটে দিল। শুনে সায়নের শরীর দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নামতে লাগল।

'বিপদ, সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ তোমার। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।'

pathagar.net

কথাগুলো বলে চোখ বুজে রইলেন দিবাকর শাস্ত্রী। হঠাৎই চুপ করে গেলেন। জোড়া কালীমন্দিরে তখন আর কেউ নেই। বসিরহাটের বাজার থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই মন্দির। ভরদুপুরে কেমন যেন ছমছম করে জায়গাটা। দু হাত দূরে ইছামতী নদী। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। নদীর বুকে একটা নৌকোও তখন নেই। ওই পরিবেশে শাস্ত্রীমশাইয়ের কথাগুলো শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন আভা।

শাস্ত্রীমশাইয়ের কাছে আসার পরামর্শটা দিয়েছিল কুন্তী। বাড়িতে পুলিশ ঘুরে যাওয়ার পর। বলেছিল, 'মা। আমি সুবিধের বুঝছি না। তুমি এখুনি জোড়া কালীমন্দিরে যাও। শাস্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে এসো। আমি গণেশ ভ্যানওয়ালাকে বলে দিচ্ছি।'

পরামর্শটা যখন দিয়েছিল, তখন বেলা বারোটা। আভা ভেবেছিলেন, ভ্যানে করে মন্দিরে গেলে, কথা বলে ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগবে না। বংশে পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, সানু একমাত্তর ছেলে। তার বিপদে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। তাই শাড়ি বদলে, সঙ্গে সঙ্গে কালীমন্দিরে চলে এসেছেন। কিন্তু পুজো-আচ্চা করে, শাস্ত্রীমশাই ফাঁকা হলেন এই একটু আগে। মন্দিরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। পরনে লাল কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে লাল সিঁদুরের টান। লোকে বলে, পুজো করার সময় দরজা বন্ধ করে উনি নাকি কালীঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বেরিয়েই শাস্ত্রীমশাই যা বলেন, মিলে যায়। সেই সুযোগটাই নেওয়ার জন্য এতক্ষণ বসেছিলেন আভা। সব শুনে-টুনে শাস্ত্রীমশাই খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর 'দাঁড়া, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি' বলে মন্দিরের ভেতর ঢুকে ফের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ছিলেন।

তান্ত্রিক দিবাকর শাস্ত্রীর ওপর বসিরহাটের মানুষদের অগাধ বিশ্বাস। যা বলেন, তাই ফলে যায়। সানুর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে, উনি বলেই দিয়েছিলেন, শুধু ফার্স্ট ডিভিশনে নয়, তোর ছেলে এমন রেজাল্ট করবে দেখিস, বসিরহাটের লোক ধন্য ধন্য

করবে। তবে সরস্বতী যজ্ঞ করতে হবে তোকে। তাতে একটু খরচা হবে। সত্যিই, সানু ভালো রেজাল্ট করেছিল। সেবার জেলায় ফার্স্ট হয়েছিল। শাস্ত্রীমশাইয়ের কথামতো আভা অবশ্য যজ্ঞটা করেছিলেন। প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করে।

'তুই এক কাজ কর মা।' চোখ খুলে শাস্ত্রীমশাই বললেন, 'কালরুদ্র যজ্ঞ কর। তোর ছেলের ওপর রাজরোষ পড়েছে মা। এড়ানোর জন্য যজ্ঞটা তোকে করতেই হবে।'

'কত খরচ হবে বাবা?'

'হাজার পঁচিশ তো লাগবেই। এ যে সে যজ্ঞ তো নয় মা। অঙ্গহানিকারক। তোদের একেকজনের জন্য কালরুদ্র যজ্ঞ করি। আমার একেকটা অঙ্গ অকেজো হয়ে যায়। তোরা জানতেও পারিস না। তাও করি মা, তোদের মুখ চেয়ে।'

'আপনি করুন বাবা। টাকা পয়সার কথা ভাববেন না।'

'ভেবে বল মা। এ যজ্ঞের অনেক হ্যাপা। অনেক কিছু জোগাড়যন্তর করতে হয়। তার আগে তুই বল, ঠিক কী চাস? আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোর ছেলের জেল অনিবার্য। পাঁচ-ছ' বছর তো বটেই।'

অ্যাঁ, পাঁচ-ছ'বছর? আঁতকে উঠলেন আভা। বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। কী কুক্ষণেই যে তিনি সানুকে কলকাতায় যেতে বলেছিলেন। সব দোষ ওই মেয়েটার...তিতাস। ও কলকাতায় চলে না গেলে সানুকে পাঠানোর দরকারই হত না। অনুনয়ের ভঙ্গিতে আভা বললেন, 'শাস্ত্রীমশাই, যেভাবেই হোক, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। ছেলের কিছু হলে, আমি বাঁচব না।'

'বেশ, তুই যখন বলছিস, তখন যজ্ঞের আয়োজনটা না হয় শুরু করে দিই। অমাবস্যার আর দিন পাঁচেক বাকি আছে। সেদিনই করা যাবে। তবে পুরো টাকাটা আগে দিয়ে যাস।'

'এই পাঁচদিনের মধ্যে যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তা হলে?'

'গিঁট দিতে হবে। যাতে কিছু না হয়। দশ-পাঁচেক টাকা রেখে যা। আজ সন্ধের মধ্যে, যা কিছু করার, আমাকে করে ফেলতে হবে।'

আঁচলের গিঁট খুলে, পাঁচখানা একশো টাকার নোট বের করে শাস্ত্রীমশাইয়ের পায়ের কাছে রাখলেন আভা। তারপর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'ভেবেছিলুম এক, হয়ে গেল আরেক। কী কপাল আমার দেখুন। ভাবলুম, ছেলের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। সব চৌপাট হয়ে গেল।'

'সব হবে, সব হবে। ভাবিস না। আমি তো আছিরে।'

'আপনার ভরসাতেই তো আছি। কাল সকালে আমি কলকাতায় যাচ্ছি। আপনি আশীর্বাদ করুন বাবা, ছেলেকে নিয়ে যেন পরশু ফিরে আসতে পারি।'

কথাগুলো বলেই উঠে পড়লেন আভা। মাথাটা হঠাৎ টলে গেল। প্রেসার-ট্রেসার বাড়ল নাকি? দেওয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলালেন আভা। না, এই সময়ে দুর্বল হলে চলবে না। শক্ত থাকতে হবে। তিনি আর্মি অফিসারের মেয়ে। স্বামী মারা যাওয়ার পরও ভেঙে

পড়েননি। একটা সময় কড়া হাতে ব্যবসা সামলেছেন। সম্পত্তি রক্ষা করেছেন। আভা জানেন, তাঁর মাথার ওপর একটা বটগাছ আছে। সানুর দাদান, উইং কম্যান্ডার শচীন বসু। যে বিপদই আসুক না কেন, বাবা আগলে রাখবেন।

মন্দির থেকে বেরিয়ে ভ্যান রিকশায় ওঠার সময় আভা দেখতে পেলেন, ইরা আসছে। রোসির মা। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু, সামনাসামনি দেখা হলে তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তিনি কথা বলতে যাওয়ার আগেই ইরা বলে উঠলেন, 'কি বললেন শাস্ত্রীমশাই?'

প্রশ্নটা শুনে আভা একটু অবাকই, 'কী ব্যাপারে গো?'

'কেন, সানুর ব্যাপারে। রোসি বলছিল, কলকাতায় পুলিশ নাকি সানুকে ধরেছে। জেলও হয়ে যেতে পারে। খবরটা শোনার পর রোসি তো পড়িমড়ি করে কলকাতায় দৌড়েল। আমায় বলল, মা, যে করেই হোক সানুকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে। আমি বললাম, যা বাবা। বিপদের সময় বন্ধু যদি বন্ধুর জন্য না করে, তা হলে আর বন্ধুত্বের কী রইল।'

শুনে বুকটা ধক করে উঠল আভার। পুলিশ তা হলে সানুকে ধরেছে। এই তো দুপুরবেলায় ঘণ্টা দুয়েক আগে তিনি সানুর সঙ্গে কথা বললেন। এর মধ্যেই পুলিশ পৌঁছে গেল? দম বন্ধ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রোসি তোমায় কখন বলল কথাটা?'

'তা, বেলা এগারো-সাড়ে এগারোটা হবে। থানা থেকে ফিরে, বেচারি নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত পেল না গো। সানু যার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে, সেই ভদ্দরলোক তো থানায় হাতে পায়ে ধরেছেন রোসির। বাবা, তুমি আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলো। কথা দিচ্ছি, তোমার বন্ধুর এগেনস্টে অ্যাকশন নেব না। মেয়েকে পেলেই আমরা চিটাগাং চলে যাব। থানার বড়বাবুও তখন বললেন, যাও রোসি, ভদ্দরলোক যখন এত করে বলছেন, তোমার উচিত ওকে সাহায্য করা। সানু তো এমন ছিল না আভাদি। কেন এমন করল?'

বলার ভঙ্গি দেখে গা পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল আভার। যেন বিষ উগরে দিচ্ছে। যেমন ছেলে, তার তেমন মা। রোসিটা একনম্বরের মিথ্যেবাদী। ওর মা তো সে রকমই হবে। এই বেলা দেড়টার সময়ই সানুর সঙ্গে কথা হল। আর রোসি এখানে রটিয়ে দিল, পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে। শয়তান কোথাকার। পালটা বিষ ঝাড়লেন তিনি, 'সানুটা সত্যিই এমন ছিল না ইরা। বন্ধুদের সঙ্গে মিশেই গোল্লায় গেল। কে শোনে কার কথা? কী কুক্ষণেই না ওকে পুজোয় এখানে আসতে বলেছিলাম। ভুল আসলে আমার।'

কথাগুলো বলেই পাশ কাটিয়ে ভ্যান রিকশায় উঠে বসলেন আভা। ইরা কী বলল, তা পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই। ওরা মায়ে-পোয়ে যা ইচ্ছে রটাক, তাতে কিছু আসে যায় না। সানুর ওপর আস্থা আছে, থাকবে। ময়লাখালির দিকে ভ্যান রিকশা এগোচ্ছে। মাথার ওপর গনগনে রোদ্দুর। ইরার কথা মাথা থেকে মুছে ফেলে শাস্ত্রীমশাইয়ের কথাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন আভা। নিশ্চয়ই গ্রহের ফের। না হলে সানুর মতো ছেলে এই

ঝামেলায় পড়ে? পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। এর আগে সেটা আভা টের পেয়েছেন একবার। সেবার সানুকে বের করে নিয়ে এসেছিল ওর দাদান। এবারে ওর কপালে কী লেখা আছে কে জানে? বসিরহাটে পৌঁছেই সানুর দাদান গিয়েছে এস পি-র বাংলোয়। এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরে এসেছে। বাড়ি ফিরে কী শুনতে হবে, ঈশ্বরই জানেন।

বাড়ির দিকে আসতে আসতে আভা ঠিক করে নিলেন, অঘ্রান মাসের মধ্যে সানুর বিয়েটা দিতেই হবে। ঠিক বয়সে বিয়ে না-দিলে ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যায়। বসিরহাটে অনেক ছেলেমেয়েকেই তো দেখলেন। লজ্জা-টজ্জা বলে কিছু নেই। রাস্তাঘাটেই প্রেম করে বেড়াচ্ছে। বাপ-মাকেও মানে না। মেয়েগুলোরই দোষ বেশি। স্কুল কলেজে ছেলেদের সঙ্গে এত মেশামেশি, ক'টা মেয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারে? সেদিন সংগ্রামপুরে গিয়েছিলেন আভা, কালীমন্দিরে পুজো দিতে। ফেরার পথে সন্ধেবেলায় দেখেন, ব্রিজের ওপর গোপালবাবুর ছেলে বিভাস একটা মেয়ের গালে হাত দিয়ে আদর করছে। কতই বা বয়স বিভাসের, উনিশ-কুড়ি হবে। বলতে গেলে, এই সেদিন ওকে জন্মাতে দেখেছেন আভা। ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে দেখে অবাক হয়ে যান তিনি। কুন্তীদের বস্তিতে থাকে, স্বপ্না।

মনে ভয় ধরে গিয়েছিল সেদিন আভার। সানু যদি কোনওদিন এই রকম একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে। তা হলে তো মিত্তিরবাড়ি মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশে যাবে। সানুর বয়স এখন সাতাশ। এই সময়টায় পুরুষদের একটা খিদে থাকেই। এটাই বিয়ের উপযুক্ত সময়। সানুর বাবা বিয়ে করেছিলেন একুশ বছর বয়সে। আভার তখন উনিশ। তখন ওই বয়সটাই ছিল তেল-জলে মিশ খাওয়ার সময়। এখনকার দিনে অবশ্য অত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা বাপ-মায়েরাও কেউ ভাবতে পারেন না। তাই অ্যাদ্দিন সানুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন আভা। কলকাতায় কোনও মেয়ের সঙ্গে মেশামেশি করছে কী না, নিয়মিত খবর রেখেছেন তনিমার কাছ থেকে। তনিমা অবশ্য কোনও খারাপ রিপোর্ট এখনও দেয়নি। তবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা মহা বুদ্ধিমান। হয়তো মেয়েটাকে বাড়িতে আনছে না। কলকাতায় কফি শপ, শপিং মল-টল কত কী হয়েছে। কে জানে, ওখানে দেখাসাক্ষাৎ করে কী না? বসিরহাটে সবাই বলে, সানুর মতো ছেলে হয় না। আভারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু মেয়েরা যে ওকে ভালো থাকতে দেবে, তার গ্যারান্টি কী? এই তো...স্কুলে ওদের ক্লাসেরই একটা মেয়ে ঐন্দ্রিলা একটা সময় নাকি সানুর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। ফোনে প্রায়ই বিরক্ত করত। ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। কিন্তু আভার মন সায় দেয়নি তখন, মেয়েটা ভালো দেখতে নয় বলে। বংশের একটা মাত্তর ছেলে, আভা এমন মেয়েকে বউ করে আনতে চান যাতে পাঁচটা লোক ভালো বলে। আভার মাথায় তখন তিতাসের কথা ঘুরছে। ঐন্দ্রিলাকে তাই ফোনে খুব বকুনি দিয়েছিলেন একদিন। ও মা, এমন ডাকাবুকো মেয়ে, বকুনি খেয়ে সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ভয়ে আভা গুটিয়ে ছিলেন কয়েকটা দিন।

ময়লাখালির কাছে ভ্যান রিকশা পৌঁছোতেই, হঠাৎ আভার মনে হল, সানু যদি অত

ভালো ছেলেই হয়, তা হলে চিটাগাংয়ের এই মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিল কেন? বাসে তোর সঙ্গে দেখা হল, অমনি পিরীত শুরু করে দিল? এ কিরকম কথা। মাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করবি না? মেয়েটার সঙ্গে সানু নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়েছে। না হলে পুলিশ ওকে খুঁজবে কেন? পুলিশের লোক অত কাঁচা কাণ্ড করবে বলে তো মনে হয় না। তা ছাড়া, শাস্ত্রীমশাই তো একটু আগে বলেই দিলে, সানুকে জেলে যেতে হবে। উনি তান্ত্রিক, সব কিছু আগাম জানতে পেরে যান। মা কালীর উদ্দেশে আভা বললেন, 'মা, মা গো, মেয়েটার হাত থেকে আমার ছেলেকে তুমি বাঁচাও মা। তোমায় আমি জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব।'

বাড়ির সামনের গেটে ভ্যান রিকশাটা নিয়ে গেলেন না আভা। পিছনের গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই দাদান বলল, 'এলি? সানু আমাকে ফোন করেছিল। তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। তুই গেছিলি কোথায় রে? জোড়া কালীমন্দিরের সেই ভণ্ডটার কাছে?'

সত্যি কথা বললে বাবা চটে যাবে। প্রশ্নটা এড়ানোর জন্যই আভা বললেন, 'সানু কী বলল বাবা?'

'বিন্দাস আছে। মিগ বিমানে ফ্লাই করছিল। আমায় বলল, সেফ ল্যান্ডিং করেছে।'

'হেঁয়ালি করে কথা বোলো না তো। তোমাদের দাদু-নাতির অর্ধেক কথাই আমি বুঝতে পারি না। এসপি সাহেব কী বলল, আগে সেটা বলো।'

'আরে, সামান্য একটা ব্যাপার, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সেটা বিরাট হয়ে গেছে। পিসির ওপর রাগ করে চিটাগাংয়ের একটা মেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে বোধহয় মেয়েটা বসিরহাটে এসেছিল। সানু যেদিন কলকাতায় যায়, বাসে মেয়েটার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। দু'জনে কথা বলতে বলতে কলকাতায় গেছিল। সুন্দরী মেয়ে, প্যারাগন অব বিউটি। তার ওপর সমবয়সি, ইন্টিমেসি তো হতেই পারে। শুনলাম, মেয়েটা নাকি দারুণ গান গায়। ভালো রান্না করে। ঠিক যেমন মেয়ে...তুই বউ হিসাবে চাস আর কী।'

'এত কথা তুমি জানলে কী করে বাবা? সানু হতচ্ছাড়াটা বলল বুঝি?'

'ও বলবে কেন? মেয়েটাকে তো আমি দেখেছি। বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে রোজ দেখাচ্ছে। একটু আগেই ওকে দেখাল। নিখোঁজ সংবাদে। কী সুন্দর দেখতে তুই ভাবতেও পারবি না আভা। তোদের ওই অরূপ চৌধুরির মেয়ে, এই মেয়ের নখের যুগ্যি নয়। বি টিভি চ্যানেলটা খুলে রাখ, তোকে দেখাচ্ছি। বসিরহাটে কেন, পুরো জেলায় এমন মেয়ে পাওয়া মুশকিল।'

'কিন্তু বাড়ি থেকে পালাল কেন?'

'ওই যে বললাম, পিসির ওপর রাগ করে। কেমন আদরে মানুষ, বুঝতেই পারছিস। আরে, আসল কথাটাই তো তোকে বলা হয়নি। মেয়েটার বাবা আবীর চৌধুরিকে আমি ভালোমতো চিনি। এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ পরিচয়টা বেরিয়ে গেল। ভদ্রলোক চিটাগাংয়ের নামকরা সাংবাদিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি

যখন চিটাগাং ফ্রন্টে, উনি তখন প্রায়ই আসতেন কান্টনমেন্টে। যুদ্ধের খবর নেওয়ার জন্য। বাড়িতে একদিন নেমতন্ন করেও খাইয়ে ছিলেন। ওঁর স্ত্রীর নামটা আমার এখনও মনে আছে...চপলা। তখন সদ্য সদ্য বিয়ে হয়েছে ওদের। আমি যখন বললাম, আবীর চৌধুরিকে চিনি, এসপি সাহেব তখন বললেন, দাঁড়ান আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিচ্ছি।'

'অ্যাদ্দিন পর তোমায় চিনতে পারল?'

'চিনবে না মানে? ভদ্রলোক তো সানু সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। বারবার বললেন, আমার মেয়েটা বেঁচে গেল আপনার নাতির জন্য। খারাপ লোকের পাল্লায় পড়লে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। মেয়েটা এখন কোথায় বলো তো?'

'পুলিশ তো সেটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এসপি সাহেব কী বলল জানিস? মেয়েটা এমন বুদ্ধিমতী, একেবারে ছেলে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখলে নাকি চেনার উপায় নেই। সেই কারণেই নাকি ওকে ধরা যাচ্ছে না। আরে, সানু তো বলল, বাসে যার সঙ্গে ও কথাবার্তা বলেছে, সে যে মেয়ে তা নাকি ও বুঝতেই পারেনি। পরনে ছেলেদের পোশাক ছিল। সবথেকে বড় কথা, সরু গোঁফ ছিল। যে মেয়ে পুলিশকেই ঘোল খাওয়াচ্ছে, সানু তাকে কমব্যাট করবে কী করে, বল?'

আভা একমত হলেন, 'আমার ছেলেটা হাঁদা গঙ্গারামই রয়ে গেল বাবা।'

'আমি বলি কী, ওর কাঁধে এই রকম একটা চালাকচতুর মেয়েকে চাপা। না হলে প্রতি পদে পদে ঠোক্কর খাবে। আমি আর তুই তো চিরদিন থাকব না।'

ঝোঁকের মাথা আভা বলে ফেললেন, 'কিন্তু শাস্ত্রীমশাই যে বললেন, সানুর জেল হবে।'

'বললেন বুঝি। দাঁড়া, ওকেই আমি জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। নিশ্চয়ই যজ্ঞ করার কথা বলেছে। তোরও...বলিহারি যাই আভা। একজন আর্মি অফিসারের মেয়ে হয়ে,তুই কী করে এ সব ভণ্ড লোকেদের কথা বিশ্বাস করিস বল তো মা? আরে, আইনটা তো আমি জানি রে বাবা। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারছিস না? এই চল, আজই কলকাতায় যাব। দেখি, আমার দাদাভাইকে, পুলিশ কী করে।'

ধরা পড়ে আভা চুপ করে গেলেন। বাবার কথা শুনে বুক থেকে যেন বড় একটা পাথর নেমে গেল। সত্যিই তো, তিনি আর্মি অফিসারের মেয়ে পুলিশকে ভয় পাবেন কেন? হাতজোড় করে আভা কপালে ঠেকালেন। ফের মা কালীর উদ্দেশে মনে মনে বললেন, 'ছেলেটাকে তুমি দেখো মা।'

১৯

রঞ্জনের কাছে যাচ্ছে বটে, কিন্তু রোশনির মনে কোনও আনন্দ হচ্ছে না। ট্যাক্সির পিছনের সিটে ওর বাঁ পাশে বসে আছে সায়ন। কাঞ্চন সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে। মাঝে মাঝে মুখটা ঘুরিয়ে কথা বলছে। ওকে কলকাতা চেনাচ্ছে। 'এই হচ্ছে গড়িয়াহাটের মোড়। শপিং করার জায়গা। চিটাগাংয়ে আমাদের বাইতুল মোকাররমের মতো।' 'এই জায়গাটাকে বলে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি। এখানে একটা ধাবা আছে, সুন্দর খাবার পাওয়া যায়।'

সাত দিন আগে সায়নের সঙ্গে রোশনি লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে এসেছিল। তার পর আজই প্রথম বেরোল। রঞ্জনের মুখে কলকাতার অনেক গল্প শুনেছে ও। শহরটা যে এত বড়, ভাবতেই পারেনি। এখানে শেষ পর্যন্ত ও থাকতে পারবে কী না, জানে না। দুপুরে বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে। বাবা কী স্টেপ নেবে, রোশনি তা বুঝতে পারেনি। তবুও বাবার সঙ্গে কথা বলতে পেরে, আজ ওর বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেছে। পাবলিক বুথ-এ যখন বাবার গলাটা ও শোনে, তখন প্রচণ্ড কান্না পেয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম ও বুঝতে পারে, না-বলে চলে এসে বাবাকে কতটা দুঃখ দিয়েছে।

বাবার সঙ্গে মিনিট তিনেকের বেশি ও কথা বলতে পারেনি। কাঞ্চনদা তাড়া দিচ্ছিল। বুথ-এ আরও একটা লোক ফোন করবে বলে খ্যাচখ্যাচ করছিল। ট্যাক্সিতে বসে বাবার কথাগুলোই রোশনি ভাবতে শুরু করল।

বাবা প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই কোথায় মা? আগে বল। আমি এখন কলকাতায়। আমার সঙ্গে তোর মাসি-মেসো আর অমলাও এসেছে।' (চ)

রোশনি তখনও কাঁদছে। কোনও রকমে ও বলেছিল, 'আমাকে তুমি মাফ করো।' (চ)

ছোটবেলায় বাবা যেমন বুকে জড়িয়ে আদর করার সময় যে ভাষায় কথা বলত, ফোনেও সে সব বলতে লাগল, 'তুই আমার নয়নের মণি, আদরের ধন। তুই কোথায় মা, আমার বুক যে খালি হয়ে গেছে। তোর পিসি তোকে কী আবোল-তাবোল বলল, আর তুই তা বিশ্বাস করে নিলি? বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছি তোর পিসিকে। তুই মা ফিরে

আর।' (চ)

ফিরে যাওয়ার জন্য তো রোশনি ফোনটা করেনি। তাই চুপ করে বাবার কথা শুনছিল। তখন ও প্রান্ত থেকে বাবা বলছিল, 'তুই যাকে বিয়ে করতে চাস, তার সঙ্গেই আমি বিয়ে দেব। রঞ্জনের কথা তুই আমাকে আগে বলিসনি কেন মা? ছেলেটাকে আমার কাছে নিয়ে এলি না কেন? তুই চাইলে আমি না করতাম? তোর কোন আবদারটা আমি রাখিনি, বল।' (চ)

বুকটা তখন ফেটে যাচ্ছিল বাবার কথাগুলো শুনে। কিন্তু যা বলতে এসেছে, সেটা আগে বলে নেওয়া দরকার ভেবে, রোশনি বলল, 'সায়ন খুব ভালো ছেলে বাবা। তুমি দেখো, পুলিশ যাতে ওকে ঝামেলায় না ফেলে।' (চ)

'কে সায়ন মা? বসিরহাটের সেই ছেলেটা? যার সঙ্গে তুই কলকাতায় এসেছিস। তুই কি ওর কাছেই আছিস? তা হলে থাক মা। আমরা ওর কাছেই যাচ্ছি। শোন মা...' (চ)

বাকি কথাগুলো না শুনেই রোশনি ফোনটা কেটে দিয়েছিল। হায় ভগবান, লেক গার্ডেন্সের ঠিকানাটা তা হলে বাবা পেয়ে গেছে। তার মানে যে কোনও সময় চলে আসতে পারে। তার আগেই ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ফোনটা ছেড়ে কাচের ঘরে দাঁড়িয়ে ও তখনই ঠিক করে ফেলেছিল, আর কোনও উপায় নেই। ও নিজেই রঞ্জনকে ফোন করবে।

ইন্ডিয়ায় আসার পর থেকেই অবশ্য রঞ্জন সম্পর্কে ওর মোহ ভঙ্গ হতে শুরু করেছে। একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে। টাকিতে আসতে বলে এল না। পরে ফোন করে আর যোগাযোগই করল না। তাই রোশনির রাগ ক্রমশ বাড়ছে। টাকি আর বসিরহাট থেকে রোশনি অনেক বার রঞ্জনকে ফোন করেছিল। কিন্তু পায়নি। মিসড কল দেখেও, পরে রঞ্জন কেন ওকে ফোন করেনি, তাতেই মনে মনে ভীষণ আহত রোশনি। কলকাতায় আসার পর, ভেতরের সেই রাগ থেকেই রঞ্জনকে ও ফোন করার কথা ভাবেনি। ওকে ফোন করার জন্য সায়ন বা কাঞ্চনদাকেও অনুরোধ করেনি। অনেক ভাবা সত্ত্বেও রোশনি বুঝতে পারছে না, আসলে রঞ্জন কী চায়?

ট্যাক্সিতে বসে জানলার দিকে তাকিয়ে রোশনির মনে হঠাৎই প্রশ্নটা জাগল, রঞ্জনের কাছে যাওয়ার জন্য ও বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু রঞ্জন যদি ওকে নিতে না-আসে? তা হলে কী হবে? কথাটা ভাবতেই ভয়ে ওর শরীরটা কুঁকড়ে গেল। রঞ্জনের পক্ষে সবই সম্ভব। ওর জন্যই এ দেশে, এক সপ্তাহ ধরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে রোশনিকে। সিটের পিছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে ও ফের ভাবতে লাগল, বুথ থেকে ফোনে আজ কথা বলার সময় রঞ্জন ওকে ঠিক কী বলেছিল। সময় নষ্ট না করে রোশনি প্রথমেই বলেছিল, 'কলকাতায় এসে গেছি। এখুনি এসে আমাকে নিয়ে যাও।'

ও প্রান্তে রঞ্জনের গলায় উচ্ছ্বাস, অন্তত রোশনির তাই মনে হয়েছিল, 'কবে এসেছ সোনা? কার কাছে আছ?'

শুনে দপ করে মাথায় রাগ চড়ে গেছিল রোশনির। কবে ওর আসার কথা, রঞ্জনের

সেটা না-জানার কথা নয়, তবুও জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু রাগ দেখানোর সময় এখন নয়। তাই ও বলেছিল, 'এক দাদার কাছে আছি। তুমি কখন আসবে আগে বলো?'

'এখনই যেতে হবে নাকি? এখন তো যেতে পারব না সোনা। আমি এখন রিহার্সালে। আমার পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া মুশকিল।'

'তার মানে?'

'আমাদের ব্যান্ড মরিশাস যাচ্ছে। আজই শেষ রিহার্সাল। বুঝতেই পারছ, আমি কী রকম ব্যস্ত।'

'তা হলে তুমি রিহার্সাল নিয়েই থাকো। আমাকে পাওয়ার চেষ্টা আর কোরো না।'

'রাগ করছ কেন সোনা? তুমি যে আসবে, আমাকে খবর দাওনি কেন?'

'বলতে লজ্জা করছে না তোমার। তুমিই তো আমাকে চলে আসতে বলেছিলে।'

'বলেছিলাম বুঝি। ইস, একদম আমার মনে নেই। পুজোর সময়, এত জায়গায় ফাংশান, সব মনে রাখা মুশকিল...'

রঞ্জনকে থামিয়ে দিয়েছিল রোশনি, 'তোমার রিহার্সাল শেষ হবে কখন?'

'রাত আটটা হয়ে যাবে এখান থেকে বেরোতে।'

শুনে তখন রাগ চাপতে পারেনি রোশনি। বলেছিল, 'এখনই যদি আসো, তা হলে আমাকে পাবে। নইলে নয়। আমার খোঁজে বাবা এখানে এসে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওরা দাদার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। আমাকে জোর করে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবে বলছে। এখন তোমার যা ইচ্ছে, করো।'

'আরে রাগ করছ কেন সোনা। এক কাজ করো, তোমার দাদাকে বলো, পার্ক সার্কাসের মোড়ে একটা হোটেল আছে। আলিবাবা। সেখানে তোমাকে নিয়ে আসতে। আমি ওখানেই আছি। কখন আসতে পারবে, বলো।'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।'

'ঠিক আছে, চলে এসো।' গলার সুর বদলে গিয়েছিল রঞ্জনের। আগের মতো আবেগ ঢেলে বলেছিল, 'উফ, আমি ভাবতেও পারছি না সোনা, তুমি এখানে। এসো, তোমার জন্য ওয়েট করব। চুমু নিও।'

অন্য সময় হলে, রঞ্জনের শেষ কথাটায় রোশনি শরীরে শিহরন অনুভব করত। আজ করেনি। ট্যাক্সিতে পার্ক সার্কাস বলে জায়গাটার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ওর মনে হল, আচ্ছা, রঞ্জন কি ওকে আলিবাবা হোটেলের কথা বলেছিল, না কি আলাদিন হোটেল? ওর স্মৃতিশক্তি এমনিতে খুব ভালো। অন্তত লোকে তাই বলে। তবুও রোশনি একটু দ্বিধায়। মনে হচ্ছে, আলিবাবা হোটেলই। আসলে সবকিছু ওর গুলিয়ে যাচ্ছে। চিটাগাংয়ে একবার মা ওকে একটা কথা বলেছিল, বিপদে পড়লে মাথাটা খুব ঠান্ডা রাখবি। কখনও মনে করবি না, বেরিয়ে আসার কোনও রাস্তা নেই। ভগবান আমাদের বিপদে ফেলেন কেন, জানিস? পরীক্ষা করার জন্য, কার মাথা কত সাফ। একটা না একটা রাস্তা উনি বের করে

Bhagarati

রাখেন। সেই রাস্তাটা আমরা ঠিক বেছে নিচ্ছি কী না তা দেখেন। মায়ের কথা অনুযায়ীই, রোশনি চোখ বুজে, ঠিক রাস্তাটা খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। বারবার ওর মনে হতে লাগল, রঞ্জনকে বিশ্বাস নেই। যদি ওকে নিতে না আসে, তা হলে সায়নকে রোশনি আর মুখ দেখাতে পারবে না। ভগবান, এই পরিস্থিতি যেন না আসে।

আড়চোখে ও একবার সায়নের দিকে তাকাল। মুখটা গম্ভীর করে বসে আছে। টেলিফোন বুথ থেকে ফিরে আসার পরই ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করেছে রোশনি। যেন ওর উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। কাঞ্চনদা হলে ও অবশ্যই জিজ্ঞেস করত, মন খারাপ করে বসে আছ কেন? কিন্তু সায়নের সঙ্গে ওর সেই সম্পর্কটা গড়ে ওঠেনি। ভাষার দূরত্ব একটা কারণ তো বটেই, অন্য কারণটা হল, ওর অপরাধবোধ। সায়নের কোনও স্বার্থ নেই, কোনও আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, এমন কী সাতদিন আগে জানাশোনাও ছিল না। তবুও ওর জন্য সায়ন নানা ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে।

কাঞ্চনদা সেদিন বলল, সায়ন নাকি বলেছে, ভালোবাসা কাকে বলে, সেটা নাকি রোশনির কাছ থেকে শেখা উচিত। শুনে লজ্জা পেয়েছিল ও। রঞ্জনকে ও ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা অপাত্রে দান করেছে। উলটে, ভালোবাসা কাকে বলে, সেটা ও নিজে সায়নকে দেখে শিখল। সত্যিকারের ভালোবাসে বলেই না, সায়ন আটকানোর কোনও চেষ্টা করেনি তিতাসকে। আর... মেয়েটা কী বোকা? এমন একটা ছেলেকে ফিরিয়ে দিল? রোশনির জীবনে এমন ছেলে এলে, ও কিন্তু মাথায় করে রাখত।

'দাদা, বেকবাগান এসে গেছি। পার্ক সার্কাসে কোথায় নামবেন?'

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা জানতে চাইছে। চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল রোশনি। আর কয়েক মিনিট মাত্র। রঞ্জনের সঙ্গে ওর দেখা হবে। প্রায় ছ'মাস দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। ওর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। পুজোর আগে ফোনে রঞ্জন বলেছিল, পেটের অসুখে ভুগে ও নাকি রোগা হয়ে গেছে। হওয়ার কথাই। যত্ন করার কেউ নেই। এত বাইরের রান্না খেলে কারওর পেট ভালো থাকে। নাহলে এ বার থেকে রোশনি খুব যত্ন নেবে। ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াবে। এমন আনন্দে ওকে রাখবে, যাতে ওর জীবনটা ভরে যায়।

কাঞ্চনদা হঠাৎ বলে উঠল, 'ওই তো আলিবাবা হোটেল। বাঁ দিকে। দেখতে পাচ্ছিস সায়ন। হোটেলটা নতুন বলে মনে হচ্ছে। থ্রি স্টার তো হবেই। বাব্বা, তোর রঞ্জন কত রোজগার করে রে রোশনি?'

রোশনি খুশি হয়ে বলল, 'তুমি জিজ্ঞেস কোরো ওকে।'

ট্যাক্সি থেকে নেমেই রঞ্জনকে দেখতে পেল রোশনি। পরনে রঙিন পাঞ্জাবি আর পায়জামা। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে ওর ভালো লাগল। ঘলঘলিয়ায় যখন কোথাও ওরা দেখা করত, রঞ্জন আগে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। মুহূর্তের মধ্যে ওর রাগ উধাও হয়ে গেল। নাহ, রঞ্জন তা হলে আগের মতোই আছে। ওর দিকে হাসি হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে রোশনি বলল, 'কেমন আছ?'

'ভালো। কার সঙ্গে এসেছ?'

কাঞ্চনকে দেখিয়ে রোশনি বলল, 'এই আমার কাঞ্চনদা। আর এ দাদার বন্ধু সায়ন।'

রঞ্জন হাতজোড় করে দু'জনকেই নমস্কার জানাল। তারপর বলল, 'চলো, ভিতরে চলো। দাও, তোমার ব্যাগটা আমার হাতে দাও।'

আন্তরিকতা দেখে রোশনি আরও একবার খুশি হল। ইস, এতক্ষণ রঞ্জন সম্পর্কে কী বিশ্রী চিন্তাই না ওর হচ্ছিল। সবাই মিলে দোতলার একটা ঘরে ঢোকার পর কাঞ্চনদা ফিসফিস করে বলল, 'জিজ্ঞেস করো তো, এই হোটেলেই থাকে নাকি?'

আহ্লাদে গলে গিয়ে রোশনি বলল, 'তুমিই জিজ্ঞেস করো না।'

কথাটা শুনে ফেলেছিল রঞ্জন। বলল, 'এই হোটেলে আপাতত কয়েকটা দিন আছি। এই কাছেই...পার্ক সার্কাস ব্রিজের কাছে রিসেন্টলি একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করাচ্ছি। আসলে একা মানুষ, কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই, বুঝলেন। রোশনি এসে গেছে। এখন থেকে পাকাপাকি ওই ফ্ল্যাটেই থাকতে হবে।'

সায়ন এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এ বার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাইট ক্লাবটা তো কাছেই, তাই না?'

'ওই ক্লাবে গেলে এখন আর আমাকে পাবেন না। কালই আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

চা-টা খেয়ে, খানিকক্ষণ কথা বলে, সায়ন আর কাঞ্চনদা চলে যাওয়ার পর রোশনি বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল। ও ঘরে ফিরতেই রঞ্জন বলল, 'আমাকে এখুনি রিহার্সালে ফিরে যেতে হবে সোনা। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। এর মধ্যে যদি তোমার কোনও দরকার লাগে, তা হলে রুম সার্ভিসে ফোন কোরো।'

'কোথায় তোমার রিহার্সাল?'

'এই হোটেলেই...চার তলার ব্যাঙ্কোয়েট রুমে। আমি না-ফেরা পর্যন্ত কোথাও তুমি বেরোবে না। কেউ ফোন করলেও ধরবে না। ততক্ষণ রেস্ট নিতে পারো, অথবা টিভি দেখো।' গালে আলতো একটা চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল রঞ্জন। তখনই ওর মুখে বিশ্রী একটা গন্ধ পেল রোশনি। এই দিন দুপুরে ড্রিঙ্ক করেছে নাকি? তবে যে বলল, রিহার্সালে ব্যস্ত ছিল। বাজানোর সময় কেউ কি ড্রিঙ্ক করে? না, না— মদ-টদ ও একেবারে বরদাস্ত করবে না। রঞ্জনকে মানা করতে হবে। চিটাগাংয়ে ওর বাবাও ড্রিঙ্ক করত রোজ। তবে রাতে অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে ডিনার করার আগে মাত্র দু'পেগ। বাবাকেও ও বারণ করত। পরে ডাক্তারকাকু বলেছিল, সিগারেট খাওয়ার থেকে, দু'এক পেগ ড্রিঙ্ক করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। ওর কথায় বাবা শেষ পর্যন্ত সিগারেট ছেড়েছিল। রঞ্জনকেও মদ ছাড়তে বলবে ও। তখনই বুঝতে পারবে, রঞ্জন কতটা ওকে ভালোবাসে।

পোশাক বদলে, বিছানায় শুয়ে রোশনি টিভি চালিয়ে দিল। বাংলা চ্যানেলে একটা সিনেমা দেখাচ্ছে। বাসরঘরে খাটের ওপর সেজেগুজে বসে আছে নায়িকা। ঘরের ভেতর ঢুকে নায়ক দরজায় খিল দিয়ে দিল। তার পর খাটের কাছে গিয়ে, ঘোমটা সরিয়ে নায়িকার

মুখটা দেখার সময় লক্ষ করল, জানলায় কয়েকটা কৌতূহলী মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে। হি হি করে হাসছে। নায়ক উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল। বিয়েবাড়িতে এই মজাগুলোতেই আসল আনন্দ। রোশনির মনে পড়ল, মাসকয়েক আগে মাসতুতো দাদার বউভাতের দিন ঘলঘলিয়াতেও ওরা এ সব দুষ্টুমি করেছে। ঘলঘলিয়া থেকে মনটা সরিয়ে এনে রোশনি ফের টিভির দিকে তাকাল। নায়ক দু'হাতে নায়িকার মুখটা তুলে ধরেছে। কী সব বলতে বলতে নায়িকার ঠোঁটে চুমু খেল। তার পর বাঁ হাত দিয়ে আলোটা নিভিয়ে, নায়িকাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

চোখ বুজে রোশনি ভাবতে লাগল, বিয়ের দিন এই সুন্দর মুহূর্তগুলো ওর জীবনে কখনই আসবে না। আত্মীয়স্বজনের সামনে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে, ওর জীবনে হবে না। ওর নিজের কে-ই বা আছে? যাকে বাবা বলে ডাকে, সে তো নিজের বাবা নয়। এই বাবা কোনও দিন ওকে বলেওনি, কোত্থেকে ওকে তুলে এনেছে। ওর মতো মেয়ের সামাজিক বিয়ের স্বপ্ন দেখাই উচিত নয়। ফোনে রঞ্জন বলেছিল, কলকাতায় এলে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে ওরা বিয়ে করবে। বিয়েটা কালই সেরে নিতে হবে। না, না, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত রঞ্জনকে ও কাছে ঘেঁষতে দেবে না। পুরুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই। সবাই তো আর সায়নের মতো নয়। বেশ কয়েকটা রাত ওরা একই ছাদের তলায় কাটিয়েছে, অথচ সায়নের চোখে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি।

সায়নের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রোশনি। হঠাৎ ডোর বেলের শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ক'টা বাজে, বোঝার কোনও উপায় নেই। দরজা-জানলা সব বন্ধ, এসি মেশিনটা চলছে। টেবিলের ওপর থেকে হাতঘড়িটা টেনে নিয়ে রোশনি দেখল, সোয়া আটটা। রঞ্জন তা হলে এতক্ষণে এল। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে ও দেখল, স্যুটপরা লম্বাচওড়া একটা লোক দাঁড়িয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে লোকটা হাসল। তারপর প্রায় ধাক্কা দিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকে এল। লোকটার চোখ লাল। দেখেই ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল রোশনির। বুকের ভেতরটা ধকধক করতে লাগল। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ও বলল, 'কে আপনি? রঞ্জন কোথায়?'

প্রশ্নগুলো লোকটা বুঝল বলে মনে হল না। প্রথমে দরজা লক করে দিল, তারপর কোট খুলে সোফায় ছুড়ে দিয়ে বলল, 'রঞ্জননে মুঝকো ভেজা। তুমহারা নাম রোশনি হ্যায়, না? আও, থোড়া মস্তি করে।'

কথাটা বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল লোকটা। তার পর জামার বোতাম খুলতে লাগল।

সাউথ সিটি শপিং মলের চারতলায় একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছে সায়ন। ছ'টা বাজতে আর মিনিট পনেরো বাকি। রোশনিকে নিয়ে ফোনে যে লোকটা হুমকি দিয়েছিল, তার জন্য ও অপেক্ষা করছে। লোকটা বলেছিল, ছ'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে একটা রিমাইন্ডার দেবে। কল যাতে কোনওভাবে মিস না করে, সেজন্য ফোনটা হাতেই ধরে রেখেছে সায়ন। লোকটা এক লাখ টাকা সঙ্গে আনতে বলেছিল। সায়ন সঙ্গে একটা অ্যাটাচি কেস নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার ভেতর রয়েছে পুরোনো খবরের কাগজ। রোশনিকে আলিবাবা হোটেলে ছেড়ে দিয়ে আসার পর থেকে এমনিতেই ওর মনটা খিঁচড়ে আছে। যে লোকটা হুমকি দিয়েছে, সায়ন ঠিকই করে রেখেছে, রাগটা তার ওপর ঝাড়বে।

পার্ক সার্কাস থেকে লেক গার্ডেন্সে ফিরে বেলা তিনটের সময় ওরা দেখে, অ্যাপার্টমেন্টের লনে অনু, তাপস আর লালি দাঁড়িয়ে গল্প করছে। তাপস আর লালিকে দেখে সায়ন অবাক হয়ে যায়। পরে তাপস বলল, দুপুরে গড়িয়ায় ওর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গৃহপ্রবেশের নেমতন্ন ছিল। বসিরহাট থেকে তাই পৌনে দশটার ট্রেনে ওরা কলকাতায় এসেছে। লালি আগে কখনও এ বাড়িতে আসেনি। নেমতন্ন সেরে ফেরার পথে ও-ই তাপসকে নিয়ে এসেছে লেক গার্ডেন্সে। সন্ধেবেলার ট্রেনেই ওদের ফিরে যাওয়ার কথা। অনু অবশ্য প্রায় শনিবার অফিস থেকে ফেরার পথে এ বাড়িতে আসে। গল্প-টল্প করে সন্ধেবেলায় গল্ফ গ্রিনে যায়। আজও এসে অনু পাশের ঘরে গল্পে মেতেছে কাঞ্চনের সঙ্গে। দু'জনের সম্পর্কটা জানার পর লালিও ঠাট্টা ইয়ার্কি মারছে ওদের নিয়ে। ফাঁক পেয়ে সেই সময় তাপস এ ঘরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ নিচু গলায় বলেছিল, 'রোসির খবর কিছু শুনেছিস নাকি?'

'কী খবর রে?'

'রুশাতি তো ওকে ল্যাং মারল।'

'তার মানে?'

pathagar.net

'আরে, বারাসাতে যে ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে রুশাতি পড়তে যেত, তার এক টিচারকে ও বিয়ে করে ফেলেছে।'

'কী বলছিস তুই। রোসি ওর জন্য এত করল, অথচ...'

'তুই কি ভাবছিস, ওকে রোসি বিয়ে করত? মোটেই না। ও তো রুশাতির শরীরটাকে ভালোবাসত। রুশাতি নিজের মুখে লালিকে এ কথাটা বলেছে। নিজের স্বার্থের জন্য রোসি যা খুশি তাই করতে পারে। এই দ্যাখ না, বাস্টার্ডটা আমাকেও কী ঝুলিয়েছে। থানার বড়বাবু আজ আমার মোবাইলে ফোন করেছিল। কী বলল, জানিস? সায়নবাবু যে লেক গার্ডেন্সে থাকেন, সেটা জানা সত্ত্বেও কেন বলেননি তাপসবাবু? এটা কি ভালো করলেন? আপনাদের আরেক বন্ধু রোসি থানায় এসেছিল। ওঁর মুখে শুনলাম, আপনি নাকি বেশ কয়েকবার লেক গার্ডেন্সে গেছেন! শালা, রোসির জন্য পুলিশের কাছে আমি মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম। বড়বাবু আরও বলল, রোশনি চৌধুরির বাবাকে তোর বাড়িটা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য রোসিও নাকি কলকাতায় আসছে। তার মানে, আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা তোর এখানে আসবে। তোকে ফরনাথিং হ্যারাস করবে। সে কথা জানাতেই তোর বাড়িতে এলাম।'

এ সব কথা শুনে রোসির ওপর মারাত্মক রাগ হয়েছে সায়নের। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার আগে তাপস আর লালিকে ও বলে এসেছে, আজ রাত্তিরটা থেকে যেতে। আসুন না রোশনির বাবা। সায়ন মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। রোশনিকে ও কিডন্যাপ করেনি। ওর প্রেমিকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে মাত্র। তা ছাড়া রোশনি নাবালিকা নয়। ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছের একটা প্রশ্ন আছে। সায়ন নিশ্চিত, ও কোনও বেআইনি কাজ করেনি, উলটে, রোশনি যাতে কোনও খারাপ লোকের পাল্লায় না পড়ে, সে ব্যাপারে খেয়াল রেখেছে। এর পরও রোশনির বাবা যদি কোনও কড়া স্টেপ নেন, তা হলে দেখা যাবে। তাপসকে ও থেকে যেতে বলেছে একটাই কারণে। যাতে বসিরহাটে ফিরে গিয়ে রোসি ওর নামে উলটো-পালটা কিছু রটাতে না পারে। সায়ন তখনই ঠিক করে, ফোনে হুমকি দেওয়া লোকটাকে আগে ও শাস্তি দেবে। তারপর রোশনির বাবাকে নিয়ে ভাববে।

আজ সকালে বাইরে বেরিয়ে দাদানকে ফোন করেছিল সায়ন। তার পর থেকেই ওর সাহসটা বেড়ে যায়। পুরো ঘটনাটা শোনার পর দাদান বলল, 'পুলিশকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না দাদাভাই। রজতকুমারের সঙ্গে আমি কথা বলছি। তুমি বরং অপারেশন রোশনি শুরু করে দাও। তোমার মা জননীর পছন্দ হবে তো দাদাভাই?'

'মনে তো হয়, হবে।'

'দেন মার্চ অ্যাহেড। ব্যাক আপ সাপোর্টের জন্য আমি লেক গার্ডেন্সে আসছি।'

ছ'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে, ফোনটা বেজে উঠতেই সায়ন বলল, 'কে বলছেন?'

ও প্রান্ত থেকে লোকটা বলল, 'তোর বাপ। টাকা পয়সা এনেছিস?'

'এনেছি। শপিং মলের চার তলায় টয়লেটে চলে আসুন। আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, আয়। চালাকি করার চেষ্টা করবি না কিন্তু। তা হলে গুলি করে দেব।'

'আপনাকে চিনব কী করে?'

'আমাকে চেনার দরকার নেই। তোকে আমি চিনে নেব। কী রঙের জামা পরে আছিস বল।'

'সবুজ রঙের টি শার্ট।'

'ঠিক আছে। চলে আয়।'

ফোনটা ছেড়েই টয়লেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সায়ন। শপিং মল-টা ওর খুব ভালো করে চেনা। বহু দিন ও আর কাঞ্চন বাড়ি ফেরার পথে রেস্তোরাঁয় আড্ডা মারতে এসেছে। ও ভালোমতোই জানে, এই সময়টা টয়লেটের দিকটায় লোকজন বিশেষ থাকে না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ও টয়লেটে পৌঁছে দেখল, অল্পবয়সি দুটো ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। সময় কাটানোর অছিলায়, সায়ন অ্যাটাচি কেসটা মেঝেতে রেখে, বেসিনের সামনে গিয়ে চোখমুখে জল দিতে লাগল। মিনিট খানেক পরে, ছেলে দুটো বেরিয়ে যেতেই কালো রঙের হেভি জ্যাকেট, সান গ্লাস পরা মাঝবয়সি একটা লোক ভেতরে ঢুকে ওকে দেখে দরজাটা লক করে দিল। আয়নায় লোকটাকে দেখে সায়নের মনে হল, লোকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং যে কোনও সময় যে কোনও মানুষকে খুন করে দিতে পারে।

জ্যাকেট থেকে হঠাৎ একটা পিস্তল বের করে লোকটা বলল, 'অ্যাটাচি কেসটা দে। পুরো টাকাটা আছে তো? না হলে কিন্তু তোর খুলি উড়িয়ে দেব।'

লোকটার হাতে পিস্তল দেখে সায়ন একটু অবাকই হল। মেন গেটে মেটাল ডিটেক্টর লাগানো রয়েছে, তা সত্ত্বেও লোকটি পিস্তল নিয়ে ঢুকল কী করে? এখন ভয় পেলে চলবে না। খুব নির্লিপ্তভাবে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সায়ন বলল, 'পাঁচ হাজার কম আছে। আর জোগাড় করতে পারলাম না।'

'জানতাম, তুই খচরামি করবি। দে শালা, তোর হাতড় আর গলার সোনার চেনটা। আমার পুষিয়ে যাবে। তার আগে দাঁড়া, দেখে নিই, অ্যাটাচি কেস-এ টাকাটা ঠিক আছে কী না।'

লোকটা নিচু হয়ে অ্যাটাচি কেসটা তুলতে যেতেই, সুযোগটা নষ্ট করল না সায়ন। টেনে লাথি মারল লোকটার কোমরে। মুখে 'অ্যাক' শব্দ করে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেসিনের ওপরে। আয়নার কাচে মাথা ঠুকে গেছিল। মুহূর্তে সাদা বেসিনটা লাল হয়ে গেল। হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। নাগালের মধ্যে পেয়ে পিস্তলটা দ্রুত কুড়িয়ে নিল সায়ন। তার পর বক্সারদের মতো কুঁজো হয়ে লোকটার গতিবিধি আন্দাজ করতে লাগল। দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ওকে সময় দিলে টয়লেট থেকে আর বেরোনো যাবে না। আরেকবার মোক্ষম আঘাত করা দরকার। সেটা বুঝেই, ওর চোয়াল লক্ষ্য করে সায়ন একটা জোরালো ঘুসি মারল। আর মেরেই ও দেখল,

চোয়ালে হাত দিয়ে, মুখ হাঁ করে লোকটা বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে গিয়ে মুখের ভেতর পিস্তলের নলটা ঢুকিয়ে সায়ন বলল, 'এ বার তোর নামটা বল। না হলে গুলি করে দেব।'

লোকটা ধপাস করে মেঝেতে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'বলছি, বলছি। ছোটা খটিক।'

'তোকে কে পাঠিয়েছে, আগে বল?'

'রঞ্জন তালুকদার। ক্যালকাটা নাইট ক্লাবে গিটার বাজায়।'

বিস্ময়ে সায়ন বলে উঠল, 'রঞ্জন তালুকদার! তুই ওকে চিনলি কী করে?'

'ক্লাবেই সাব। আমাদের সঙ্গে ধান্ধা করে। আজ দুপুরেই ক্লাবে আমাকে ও বলল, কিছু ফালতু কামাইয়ের ইচ্ছে থাকলে বল। তুই আর আমি ফিফটি ফিফটি বেঁটে নেব। বলেই ও আপনার নাম্বারটা দিল।'

'তার মানে ... এক লাখ টাকা তুই নিয়ে গেলে পঞ্চাশ হাজার ও রেখে দিত? রঞ্জন এই সব ধান্ধাও করে নাকি?'

'জী সাব।'

'ওর সম্পর্কে তুই আর কী জানিস, বল।'

'বাংলাদেশে থাকে। ওর কাজ হচ্ছে আসিফভাইকে চিড়িয়া সাপ্লাই দেওয়া। বাংলাদেশ থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে চিড়িয়াদের ও এখানে নিয়ে আসে। তার পর আসিফ ভাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়।'

'চিড়িয়া মানে?'

'ছোকরি। নাইট ক্লাবের বেশিরভাগ ছোকরিকে রঞ্জনই নিয়ে এসেছে সাব।'

'যে মেয়েটার জন্য তুই আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিস, তাকেও কি ও বিক্রি করে দেবে?'

'জী সাব। ওকে আলিবাবা হোটেলে রাখবে। আজ রাত আটটার সময়ই রঞ্জন কাস্টমার পাঠাবে ওই মেয়েটার কাছে। আমি জানি। আমার সামনেই রঞ্জন পার্টি ফিট করল। তিরিশ হাজার টাকায়। লোকটার নাম ব্রজেশ জাজোদিয়া। প্রচুর পয়সার মালিক। সব সময় ফ্রেশ চিড়িয়া পছন্দ করে। থাকে কারনারি ম্যানসনে। এই টাকা রঞ্জন আধাআধি বাঁটবে আসিফ ভাইয়ের সঙ্গে।'

'রঞ্জন কোথায় থাকে, তুই জানিস?'

'বললে আসিফভাই আমাকে খুন করবে সাব।'

'না বললে আমি কিন্তু খুন করব তোকে। আমি তিন গোনার মধ্যে বলবি। না হলে...'

আঁতকে উঠল ছোটা খটিক। হাত তুলে বলল, 'আমাকে যদি পুলিশের হাতে না দেন, তা হলে বলতে পারি সাব।'

'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি। তোকে পুলিশের হাতে দেব না।'

'রঞ্জন থাকে আলিবাবা হোটেলেই। ছাদে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। ওর বউ সুশিও ওখানে থাকে। ওর বউ আমাদের ক্লাবেরই ড্যান্সার। লেকিন কাল থেকে রঞ্জনকে আর পাবেন না সাব। কাল বিকালের প্লেনে ওর মুম্বই যাওয়ার কথা। সেখান থেকে ও চলে যাবে মরিশাস। আজই ওকে ধরতে না পারলে...'

'ঠিক আছে। এ বার ওঠ। আমি বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট পর তুই বেরোবি। তার পর সোজা ডাক্তারখানায় যাবি। আর শোন, রঞ্জন বা আসিফভাইকে কিছু জানাবি না। জানালে কিন্তু তোকে আমি ছাড়ব না। মনে থাকবে?'

'জী সাব।' ভাঙা গলায় কথাটা বলেই ছোটা খটিক উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বেসিনের কল-টা ছেড়ে, মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। ও যদি নিচু হয়ে অ্যাটাচি কেসটা না তুলত, তা হলে মারটা খেত না। ওর বদলে সায়নকেই হয়তো এখন মুখে জলের ঝাপটা দিতে হত, অথবা গুলি খেয়ে পড়ে থাকতে হত মেঝেতে। কথাটা ভেবে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল সায়ন। ছোটা খটিক মাথা আর গলা থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলছে। আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে, পিস্তল থেকে গুলিগুলো বের করে নিল সায়ন। তার পর পিস্তলটা ওকে ফেরত দিল। গুলিগুলো কমোডে ফেলে, ফ্ল্যাশ টেনে, নিশ্চিন্তে দরজা খুলে, বাইরে বেরিয়ে এল ও।

এক্সালেটর দিয়ে নীচে নামার সময় আশপাশে তাকাল সায়ন। লোকে কেনাকাটা করতে ব্যস্ত। কথাবার্তায় মশগুল। কেউ জানতেও পারল না, একটু আগে টয়লেটে কী নাটক হয়ে গেল। পরের অধ্যায়টাও সায়ন অবশ্য ভেবে রেখেছে। ছোটা খটিক যাতে এখান থেকে সহজে বেরিয়ে যেতে না পারে, এখন সেই ব্যবস্থাই ওকে করতে হবে। মল-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে নীল পোশাক পরা সিকিউরিটির একজন লোককে ডেকে বলল, 'চারতলার টয়লেটে, কালো রঙের জ্যাকেট পরা একটা লোককে, এখুনি একটা অ্যাটাচি কেস লুকিয়ে রাখতে দেখেছি। চোখে মনিগ্লাস। সাবধান, ওর কাছে পিস্তল আছে। একটু পরেই হয়তো নেমে আসবে। মনে হয়, ওই অ্যাটাচি কেস-এ বোম্ব আছে।'

কথাগুলো বলেই আর দাঁড়াল না সায়ন। ধীর পায়ে হেঁটে মেন গেটের দিকে এগোল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। হাতে আর বেশি সময় নেই। রাত আটটার মধ্যে ওকে উদ্ধার করতেই হবে রোশনিকে। শপিং মল-এর উলটো দিকে, ট্যাক্সির আশায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছোটা খটিকের কথা মন থেকে মুছে ফেলল সায়ন। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল ও। একটা পাষণ্ডের হাতে রোশনিকে ও তুলে দিয়ে এসেছে। তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি, মেয়েটাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে। রঞ্জন সম্পর্কে ওর আরও খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল। কেন যে কস্তুরীর কথা বিশ্বাস করতে গেল? এখন রোশনির যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে তার জন্য ও-ই দায়ী থাকবে। কস্তুরীকে ফোন করে ঝাড়বে কী না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হঠাৎ ওর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে সেট বের করে ও দেখল, কস্তুরী। নিশ্চয়ই জরুরি

কোনও কথা আছে। সুইচ অন করে গম্ভীর গলায় ও বলল, 'তোমাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। বলো।'

ও প্রান্তে কস্তুরী উত্তেজিত, 'সায়নদা, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।'

'কী ব্যাপারে বলো তো?'

'সেদিন আমি যে রঞ্জনের খোঁজ তোমাকে দিয়েছিলাম, সে তালুকদার নয়। সে রঞ্জন চাকলাদার। নাইট ক্লাবে মিউজিসিয়ানদের টিমে যে দু'জন রঞ্জন আছে, সেটা আমি জানতাম না। আজকেই জানতে পারলাম।'

'তাই নাকি! এ কথাটা কার কাছ থেকে জানলে?'

'ইন্দো-বাংলাদেশ কোলাবরেশনে একটা ছবি হচ্ছে, যার প্রোডিউসার একজন বাংলাদেশি। সেই ভদ্রলোক আজই কলকাতায় এসে উঠেছেন পার্ক সার্কাস মোড়ের কাছে একটা হোটেলে। সেই হোটেলটার নাম আলিবাবা। ওরা আমাকে হিরোইন করতে চান। সেই কারণেই হোটেল আলিবাবায় আমি এসেছি। কথা বলতে বলতে তখনই রঞ্জন সম্পর্কে জানতে পারলাম।'

'রঞ্জন তালুকদার সম্পর্কে কি জেনেছে বলো।'

'সেটা জানাতেই তো ফোনটা তোমাকে করলাম। মিউজিসিয়ানদের একটা গ্রুপ এই হোটেলে রিহার্সাল দিচ্ছে কাল বিকালে মরিশাস রওনা হবে বলে। ওখানেই রঞ্জন চাকলাদারের সঙ্গে আমার দেখা। তখনই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, রোশনির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ও কথা বলেছে কী না? শুনে তো ও আকাশ থেকে পড়ল। বলল, রোশনি বলে কাউকে নাকি চেনেই না। তখন ও-ই বলল, তুমি রঞ্জন তালুকদারের সঙ্গে কথা বলে দেখো। পরে ওর কাছেই নাকি জানতে পারলাম, রঞ্জন ছেলেটা নাকি খতরনাক। একে তো ড্রাগ অ্যাডিক্ট, তার ওপর উওম্যান ট্রাফিকিংয়ের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ থেকে মেয়েদের এখানে নিয়ে আসে। তার পর হেশ ট্রেডে নামায়। তুমি কি রোশনিকে ওর কাছে পৌঁছে দিয়েছ?'

'আনফর্চুনেটলি হ্যাঁ, আজ দুপুরেই দিয়ে এসেছি। হোটেল আলিবাবারই দোতলার একটা ঘরে।'

'সর্বনাশ, রোশনিকে বাঁচাতেই হবে সায়নদা। না হলে অত ভালো একটা মেয়েকে ওরা নষ্ট করে দেবে। রঞ্জন তালুকদারের সঙ্গে একটু আগে আমি কথা বলেছি। কী গাটস দেখো, ও আমাকেও টোপ দিচ্ছে। মরিশাস নিয়ে যেতে চাইছে। ওখানে গানের সঙ্গে আমাকে নাকি নাচতে হবে। ভালো টাকা দেবে বলছে।'

'তুমি কি ৎ ,র সঙ্গে যাচ্ছ?'

'মাথা খারাপ? রঞ্জন সম্পর্কে সব জানার পরেও, তুমি ভাবলে কী করে, আমি যাব? দাঁড়াও, বাস্টার্ডটাকে আমি উলটো ফাঁদে ফেলছি। তুমি যেখানেই থাকে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি চলে যাও। ওকে বলেছি, আমি একা থাকি। আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার

নাম করে, রঞ্জনকে আমি তোমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে পুলিশকে খবর দিয়ে রাখতে পারো। এখন ছাড়ছি। কেমন?'

মোবাইল সেট পকেটে রেখে সায়ন হাঁটতে লাগল লেক গার্ডেন্সের দিকে। এতক্ষণে ওর মনে পড়ল, বাড়িতে তাপসরা চার পাঁচজন বসে আছে। আরও কিছু গেস্ট আসতে পারেন। তাদের খাবার নিয়ে যাওয়া দরকার। লর্ডসের মোড়ে একটা মিষ্টির দোকান আছে, কল্পনা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। সেখানে ফুলকপির সিঙাড়া পাওয়া যায়। দোকানে ঢুকে সায়ন নিশ্চিন্তে গোটা তিরিশ সিঙাড়ার অর্ডার দিল।

pathagar.net

দরজা খুলে দিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে সায়ন বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

কোট প্যান্ট পরা ভদ্রলোককে দেখেই ও বুঝল, রোশনির বাবা। সঙ্গে মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা ও সতেরো আঠারো বছরের একটা মেয়ে। তার মানে রোশনির মাসি, মেসো, অমলা। রোশনি একদিন এই মেয়েটার কথা কাঞ্চন মারফত ওকে বলেছিল। আন্দাজে ঢিল মারল সায়ন, 'এসো, অমলা এসো।' একদম পেছনে থাকায় রোসিকে ও প্রথমে দেখতে পায়নি। ওর সঙ্গেই ঘরে ঢুকে এলেন আরেক ভদ্রলোক। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে রোসি বলল, 'এঁরা তোর বাড়িতে আসতে চাইছিল রে সানু। ঠিকানাটা জানত না। তাই আমি নিয়ে এলাম।'

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সায়ন। ও রোশনির বাবাকে লক্ষ করে যাচ্ছিল। এ দিক ও দিক তাকাচ্ছেন। রোশনিকে খুঁজছেন। ঘরের ভেতরে অনু, তাপস আর লালি বসে। কাঞ্চন একটু আগে আইসক্রিম কিনতে গেছে লর্ডসের মোড় থেকে। রোশনিকে দেখতে না পেয়ে ওর বাবা বললেন, 'সে কোথায়? তাকে দেখছি না তো?'

সায়ন বলল, 'রঞ্জনের কাছে গেছে। একটু পরেই ওকে নিয়ে আসব। চিন্তা করবেন না।' তার পর পাশ ফিরে বলল, 'অনু, যা তো, এঁদের জন্য চা কফি করে আন।'

রোসির পিছু পিছু যে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি একটু রূঢ় গলায় বললেন, 'চা-ফা পরে হবে। আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনার নামই তো সায়ন, তাই না?'

সায়ন বলল, 'হ্যাঁ, আপনি?'

'ডি ডি ইনসপেক্টর বরুণ গুহনিয়োগী। রোশনি চৌধুরির ব্যাপারে আমিই ইনভেস্টিগেশন করছি। আপনার এগেনস্টে কিডন্যাপিংয়ের চার্জ আছে।'

ভয় পেলে চলবে না। সায়ন চোখে চোখ রেখে বলল, 'চার্জ-টা কে এনেছেন, জানতে পারি?'

pathagar.net

'যে-ই এনে থাকুন, আগে বলুন, রোশনি চৌধুরিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? না বললে আমি কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করব।'

'সরি মিঃ গুহনিয়োগী। তা হলে আমি আপনার কোনও কথারও উত্তর দেব না।'

'দেবে না মানে।' মুহূর্তেই পুলিশের আসল চেহারাটা বের করে ফেললেন গুহনিয়োগী। 'লালবাজারে চলো। তোমার কাছ থেকে কীভাবে কথা আদায় করতে হয়, আমি দেখাব।'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন মিঃ গুহনিয়োগী।'

রোশনির বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি একটু চুপ করুন তো মিঃ গুহনিয়োগী। আমাকে কথা বলতে দিন। সায়ন, এই রঞ্জন ছেলেটা কি আপনার জানাশোনা?'

'আগে চিনতাম না। রোশনি আজই ওর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করাল।'

মিঃ গুহনিয়োগী বলে উঠলেন, 'কেন মিথ্যে কথা বলছ। রঞ্জনের সঙ্গে তোমার যে ভালোরকম যোগসাজশ ছিল তা আমরা জানি। এরা বর্ডার এরিয়ার ছেলে। পরে দেখবেন মিঃ চৌধুরি, মিলিয়ে নেবেন আমার কথা, এরাও উওম্যান ট্রাফিকিংয়ে যুক্ত। এই যে দু'টো মেয়েকে এখানে দেখছেন, হয়তো এরাও ভিক্টিম।'

শুনে লালি বলে উঠল, 'কী যা তা বলছেন? আমি ওর বন্ধুর স্ত্রী। মেয়েদের সম্মান দিয়ে কথা বলুন। না হলে আমি কিন্তু আপনার সম্মান রাখব না।'

রোশনির বাবা খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'উইল ইউ শাট ইয়োর মাউথ মিঃ গুহনিয়োগী। না হলে আপনার নামে আমি কিন্তু পুলিশ কমিশনারের কাছে কমপ্লেন করব। নাউ টেল মি সায়ন, রঞ্জনকে আপনি ভালো করে চেনেন না, অথচ তার কাছে রোশনিকে তুলে দিয়ে এলেন, এটা কেমন কথা হল? ছেলেটা ক্রিমিনালও তো হতে পারে, তাই না? ধরুন, আমার মেয়ের যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে তো আইনের চোখে আপনি ছাড়া পাবেন না।'

শুনেই বুকটা কেঁপে উঠল সায়নের। রোশনির বাবা ঠিকই বলেছেন। অভিজ্ঞ মানুষ, হয়তো ইতিমধ্যে রঞ্জন সম্পর্কে কিছু শুনে থাকবেন। ও বলল, 'রোশনি বলেছিল, ছেলেটাকে ও ভালোবাসে।'

'আপনার কি উচিত ছিল না, ওকে একটা ভালো পরামর্শ দেওয়া? কেন বললেন না, তোমার বাবার সঙ্গে আগে কথা না বলে, রঞ্জনের কাছে পৌঁছে দিতে পারব না?'

'বিশ্বাস করুন, আমি সেটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাষার প্রবলেমে, প্রথম দিকে ও আমাকে কি বলতে চাইছিল আমি বুঝতে পারিনি। আমার এক বন্ধু, চট্টগ্রামের ছেলে, কাঞ্চন এখানে আসার পর আমি বুঝতে পারি, ও কেন কলকাতায় এসেছে। ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আজ রঞ্জনের কাছে ওকে পৌঁছে দেওয়ার আগে কিন্তু ওকে আমি বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে।'

'হ্যাঁ, ও কথা বলেছে। এ-ও বলেছে, আপনার কোনও দোষ নেই। কিন্তু আর কয়েকটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারলেন না? তেমন হলে রঞ্জনের কাছে আমি নিজে ওকে পৌঁছে

দিতাম।'

মিঃ গুহনিয়োগী বললেন, 'তুমি কি জানো, রঞ্জনের ক্রিমিনাল রেকর্ডস আছে?'

'আগে জানতাম না। জানলে এই ভুলটা করতাম না।'

'তার মানে, তুমি জানো রঞ্জন একজন ক্রিমিনাল। দেখলেন মিঃ চৌধুরি, যা বলেছিলাম, সত্যি কী না। চলো, তোমাকে লালবাজারে যেতে হবে। তুমি ঠিক বলছ কী না, সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

সায়ন বলল, 'এখন তো আমি যেতে পারব না মিঃ গুহনিয়োগী। আমার একটা কাজ বাকি আছে। আর একটু পরেই রঞ্জন এখানে আসবে। ট্র্যাপে ফেলে ওকে একজন নিয়ে আসছে। শাস্তিটা আমিই ওকে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনি যখন এসেই গেছেন, তখন ওকে লালবাজারে নিয়ে যেতে পারেন। প্লিজ, আমাকে একঘণ্টা সময় দিন। আমি জানি, রোশনি কোথায় আছে। আটটার মধ্যে সেখানে পৌঁছোতে না পারলে, ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই ডোর বেলটা বেজে উঠল। দরজার লুকিং গ্লাসে চোখ রেখে সায়ন দেখতে পেল, বাইরে কস্তুরীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঞ্জন। হেসে হেসে কী যেন বলছে। ঘরে এত লোকজন দেখলে ও পালাতে পারে, সেটা বুঝে চাপা গলায় সায়ন বলল, 'ওরা এসে গেছে। অনু, তুই দরজাটা খুলে দে। চলুন, বাকি সবাই আমরা পাশের ঘরে যাই। মিঃ গুহনিয়োগী, এ বার আপনি যা করার করুন।'

পাশের ঘরে ঢুকে সায়ন আলোটা নিভিয়ে দিল। তখনই দরজাটা খুলে দিল অনু। কথা বলতে বলতে রঞ্জন ঘরে ঢুকছে। কান খাড়া করে সায়ন শুনল, 'তোমার ফ্ল্যাটটা তো খুব সুন্দর সাজানো গোছানো ডার্লিং। তোমার নিজের নাকি?'

কস্তুরী পাকা অভিনেত্রীর মতো বলল, 'না, আমার না। আমার এক দাদা থাকেন দুবাই। এটা তাঁর ফ্ল্যাট। এখানে আমি একাই থাকি। এই মেয়েটা আমাকে রান্নাবান্না করে দেয়। কখনও যদি লোলনি ফিল করো, এখানে চলে আসতে পারো। যাক গে, কী খাবে বলো। বিয়ার না হুইস্কি?'

'হুইস্কি। জল-টল দেওয়ার দরকার নেই। অন রক আগে দুটো মেরে নিই। তার পর তোমাকে আদর করব।'

'তা হলে তুমি বোসো। পাশের ঘর থেকে আমি সব নিয়ে আসছি।'

পর্দা সরিয়ে কস্তুরী ভিতরে আসার পর সায়ন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করে থাকতে বলল। আর তখনই শুনল ড্রয়িং রুমে মিঃ গুহনিয়োগী বলছেন, 'হুইস্কিটা লালবাজারে গিয়ে খাবি না কি এখানে?'

ঘরে আলোটা জ্বালিয়ে, সায়ন বাইরে ড্রয়িং রুমে বেরিয়ে এল। দেখল, রঞ্জনের ঠোঁটের কোণে রক্তের দাগ। কলার ধরে ওকে সোফা থেকে তুলছেন মিঃ গুহনিয়োগী। প্রথম সুযোগেই সম্ভবত হাতের সুখটা করে নিচ্ছেন। রোশনির বাবা কী যেন বলছেন

তাঁকে। শোনার জন্য অপেক্ষা করল না সায়ন। দরজার খোলা পেয়ে ও ফ্ল্যাটের বাইরে এসে দাঁড়াল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সাড়ে সাতটা বাজে। ইস, আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। এর মধ্যেই পার্ক সার্কাসে ওকে পৌঁছোতে হবে। যে করেই হোক, রোশনিকে এনে দিতে হবে ওর বাবার কাছে। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে একটা সাইকেল রিকশা দেখতে পেয়ে চট করে ও উঠে বসল। সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। লর্ডসের মোড়ে গিয়ে ট্যাক্সি ওকে ধরতেই হবে।

রাত আটটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে, হোটেলে ঢুকে সায়ন লিফটের দিকে এগোতেই রিসেপশনের লোকটা বলল, 'কার কাছে যাবেন?'

'রঞ্জন তালুকদারের কাছে।' কথাটা বলতে বলতেই লিফটের দু'নম্বর সুইচটা টিপে দিল সায়ন।

'উনি এই মাত্র বেরিয়ে গেছেন।'

'তা হলে রঞ্জন চাকলাদার আছেন?'

'উনি তো এই হোটেলে থাকেন না। প্লিজ, লিফট থেকে বেরিয়ে আসুন। এই সময়টায় কোনও বোর্ডার বিরক্ত হোন, আমরা তা চাই না।'

রিসেপশনিস্ট চেয়ার ছেড়ে ওঠার আগেই লিফটের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সেকেন্ড ফ্লোরের দরজাটা খোলার আগে সায়ন ফের চার নম্বর সুইচটা টিপে রাখল। ও আন্দাজ করল, নীচে রিসেপশনিস্ট লোকটা নিশ্চয় দেখে রাখবে, কোন ফ্লোরে ও নামছে। ওকে ঘুলিয়ে দেওয়া দরকার। তিনতলায় নেমে, সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে সায়ন দোতলায় এল। বাঁ দিকের তৃতীয় ঘরটাতেই রোশনিকে রেখে গেছিল। নিশ্চিন্ত হয়ে ও কলিং বেল টিপল। 'কউন হ্যায়' বিরক্তিভরা পুরুষালি গলা। ভেতর থেকে লক খোলার শব্দ শুনে দরজায় এক লাথি মারল সায়ন। সময় নষ্ট না করে ও ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজায় ধাক্কা খেয়ে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। পরনে শুধুমাত্র জাঙ্গিয়া। বিছানার এককোণে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রোশনি। ওর চোখমুখ দেখে মনে হয় সায়নের, এতক্ষণ কান্নাকাটি করছিল। ওকে দেখেই রোশনি দৌড়ে দরজার কাছে এসে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'সায়ন আমাকে তুমি নিয়ে চলো।'

কিট ব্যাগটা রোশনিকে কাবার্ডে রাখতে দেখেছিল সায়ন। সেটা খুলে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিয়ে ও বলল, 'চলে এসো, কুইক। আমরা বেরিয়ে যাই।'

সিঁড়ি দিয়ে ওরা নির্বিঘ্নে নেমে এল বটে, কিন্তু লাউঞ্জে এসে সায়ন দেখল, একজন বাউন্সার দরজাটা আগলে রয়েছে। ওকে দেখে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তেড়ে আসতে আসতে লোকটা বলল, 'ছোকরি লেকে ইধারসে ভাগতা হ্যায় শালে, ইতনা হিম্মত।'

ওর প্রথম ঘুসিটা মাথা নিচু করে সায়ন এড়াল। তার পর ওর ডান পাঁজর লক্ষ্য করে নিজে একটা ঘুসি চালাল। হাত ছিটকে রোশনি কাউন্টারের দিকে সরে গেছে। লোকটাকে দেখে ও মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছে। রোশনির ভীত মুখটার দিকে তাকাতেই গায়ে

অসুরের শক্তি অনুভব করল সায়ন। ফুলের মতো একটা মেয়ে, ওকে বাঁচানোর জন্য জীবন পর্যন্ত দেওয়া যায়। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বাঁ কাঁধের গোড়ায় হঠাৎ জোরালো ব্যথা অনুভব করল সায়ন। আড়চোখে দেখল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। পিছন থেকে কেউ বোধহয় চাকু মেরেছে।

সামনে বাউন্সার, পিছনে আরেকটা লোক। ডান পায়ে ভর দিয়ে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে বাঁ পায়ে লাথি চালাল সায়ন। পিছনের লোকটা 'মাই বাপ' বলে ছিটকে পড়ল। সামনে বাউন্সার লোকটা দু'গজের মধ্যে এসে গেছে। শরীরের সব শক্তি কোমরের কাছে নিয়ে এসে, সায়ন জোড়া পায়ে লাথি মারল। লোকটা টলতে টলতে গিয়ে ধাক্কা সামলাল দেওয়ালে। দরজাটার কাচ খানখান হয়ে মেঝেতে পড়ল। ধাক্কা সামলে লোকটা ফের তেড়ে আসছে। তখনই হাতের সামনে পেতলের পিলসুজ দেখতে পেল সায়ন। বাঁ হাতে দ্রুত সেটা তুলে নিয়ে বন্দুকের ভঙ্গিতে ও এগিয়ে ধরল। বর্শার ফলার মতো, পিলসুজের সামনের দিকটা লোকটার পেটে গিয়ে লাগল। পেটে হাত দিয়ে ও সোফায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখনই ঘাড় ঘুরিয়ে সায়ন দেখল, রিসেপশনের লোকটা রোশনিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শরীরের সব শক্তি কোমরের কাছে জড়ো করে, সায়ন ফের জোড়া পায়ে লাথি চালাল লোকটার বুকে। বাঁ কনুইয়ে ভর দিয়ে মেঝেতে পড়ার সময়ই ও বুঝতে পারল, কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। তখনই ও দেখল, পুলিশের একটা গাড়ি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

...কতক্ষণ পর ও জানে না, চোখের সামনে অন্ধকারটা আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করল। চোখ খুলে সায়নের মনে হল, দু'পাশের বাড়ি ঘর দোর সব উলটো দিকে ছুটে যাচ্ছে। আলোর রেখাগুলো ওর খুব চোখে লাগছে। চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড ধরে ও অনুভব করার চেষ্টা করল, কোথায় আছে। সম্ভবত কোনও গাড়িতে। কথাটা মনে হতেই ফের চোখ খুলে ও দেখল, রোশনির মুখটা ঝুঁকে আছে। রোশনিকে দেখেই ওর হোটেলের কথা মনে পড়ল। ও বলতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছ তো রোশনি?' কিন্তু বলতে পারল না। ওর মুখ দিয়ে অদ্ভুত কিছু শব্দ বেরিয়ে এল। রোশনি কাঁদছে। ওর চোখের জল টপটপ করে সায়নের গালে পড়ছে। সেই উষ্ণ ফোঁটায় সায়নের ইন্দ্রিয়গুলো যেন ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠল। সায়ন টের পেল, রোশনির কোলে মাথা রেখে ও শুয়ে আছে। চোখ খুলতে দেখে রোশনি আরও বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরল ওকে। আহ কী আরাম। এই উষ্ণতাটাই তো রোশনির কাছে ও চেয়েছিল। বাঁ হাতটা রোশনির নরম বুকে লেপটে আছে। ডান হাতটা কোনও রকমে তুলতে পারল সায়ন। আঙুল দিয়ে কান্নার দাগগুলো রোশনির গাল থেকে ও মুছে দিতে লাগল। তার পর বলল, 'রঞ্জন তোমাকে ভালোবাসত না রোশনি। ও তোমাকে ঠকিয়েছে।'

ঘাড় নেমে স্বীকার করল রোশনি। ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে রোশনি বোঝাল, আর কোনও কথা বলার দরকার নেই। কিন্তু তা শুনবে কেন সায়ন? গত সাত দিন ধরে ও যা বলতে পারেনি, তা বলার জন্য ওর মনটা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে. ও ফিসফিস করে বলল, 'তুমি বুঝতে পেরেছিলে? আগে বলোনি কেন? তা হলে তোমাকে এই বিপদে পড়তে হত না।'

'মেয়েরা কি আগে বলতে পারে?'

'আমি কিন্তু কোনওদিন তোমাকে ঠকাব না।'

কথাটা বলে নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজল সায়ন। নাহ্ রোশনিকে হারানোর ভয় আর নেই। চোখ বুজেই ও শুনতে পেল কাঞ্চন জিজ্ঞেস করছে, 'জ্ঞান ফিরেছে তা হলে?'

রোশনি বলল, 'হ্যাঁ, কাঞ্চনদা, ও ঠিক আছে।'

'ওর কিছু হলে মাসিমাকে আমি মুখ দেখাতে পারতাম না।'

'নিজেকেও কি আমি ক্ষমা করতে পারতাম?'

'উফ্, ঠিক টাইমেই আমরা হোটেলে পৌঁছেছিলাম। না হলে সায়নকে হয়তো ওরা মেরেই ফেলত।'

'ডাক্তারবাবু কী বললেন কাঞ্চনদা?'

'কাঁধে একটা উন্ড হয়েছে। ড্রেস করে একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছে। বাঁ হাতে সামান্য চিড় ধরেছে। প্লাস্টার করার দরকার নেই। ব্যান্ডেজ করে রাখলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'সায়নের ঋণ কোনওদিন আমি শোধ করতে পারব না কাঞ্চনদা। সারা জীবন ওকে ভালোবাসব। জীবনে একটা চরম শিক্ষা হয়ে গেল আজ, জানো।'

'ও সব আর মনে রাখিস না বোন। সায়নের সঙ্গেই জীবনটা নতুন ভাবে শুরু কর। হ্যাঁরে, রঞ্জনের খবর তুই কিছু শুনেছিস?'

'জানতে চাই না কাঞ্চনদা। একটা বড় ভুল করে ফেলেছিলাম। আমার জীবনটা ও নষ্ট করে দিত।'

'পুলিশ ওকে লালবাজারে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ রে, তোর বাবার সঙ্গে তোর কি কথা হল রে?'

'এই অবস্থায় কোনও কথা বলা সম্ভব? বাবাকে বলেছি, তোমার সঙ্গে ফিরে যাব না। সায়ন সুস্থ না হওয়া তক আমি লেক গার্ডেন্সেই থাকব। আমার জ্বরের সময় ও যা করেছে...'

কথাগুলো শুনতে শুনতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সায়ন।

pathagar.net

আধশোয়া হয়ে টিভি দেখছিল সায়ন। এমন সময় একটা খবরের দিকে ওর নজর গেল। ব্রেকিং নিউজ ... 'কলকাতার শপিং মল-এ নিরাপত্তা জোরদার।' চব্বিশ ঘণ্টা চ্যানেলে খবর দিচ্ছে সপ্তর্ষি বলে একজন রিপোর্টার। 'কলকাতার শপিং মলগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কাল বিকেলে সাউথ সিটির শপিং মল-এ একজন উগ্রপন্থী ধরা পড়ার পর পুলিশ সতর্ক। কাল ওই শপিং মল-এর চারতলার টয়লেটে পরিত্যক্ত একটা অ্যাটাচি কেস-এ বোমা রয়েছে, এই খবর পেয়ে সিকিউরিটি গার্ডরা যাদবপুর থানায় খবর দেয়। ছোটা খটিক বলে একজন উগ্রপন্থীকে তারা আটক করে। পুলিশ এসে ছোটা খটিকের কাছ থেকে একটা পিস্তল উদ্ধার করে। তার পর শপিং মল থেকে সব লোকজনকে বের করে দেয়। বোম্ব স্কোয়াডের কর্তারাও ছুটে আসেন। অ্যাটাচি কেস থেকে অবশ্য বোমা পাওয়া যায় নি। মুম্বই-এ উগ্রপন্থী হানার পর, কলকাতার বিশিষ্ট শপিং মলগুলোতে নিরাপত্তার বলয় আরও জোরদার করার আশ্বাস দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তার পরও এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটল, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে মল-এর ভেতর ছোটা খটিক পিস্তল নিয়ে ঢুকল কী করে? ছোটা খটিকের সঙ্গে দাউদ ইব্রাহিমের যোগাযোগ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সাউথ সিটির শপিং মল থেকে, ক্যামেরাম্যান সুশান্তর সঙ্গে সপ্তর্ষি সোম, চব্বিশ ঘণ্টা।'

টিভি-র সাউন্ড অফ করে দিয়ে মনে মনে হাসল সায়ন। বুদ্ধি করে ভাগ্যিস পিস্তলটা কাল ফেরত দিয়েছিল ছোটা খটিককে। না হলে লোকটাকে ফাঁদে ফেলা যেত না। মনে মনে ও ছোটা খটিককে ধন্যবাদ জানাল। লোকটা আগাম খবর না দিলে, ঠিক সময় রোশনিকে ও উদ্ধার করতে পারত না। সকালে কাঞ্চন বলল, কাল রাতে আলিবাবা হোটেলের ওই বাউন্সারটা নাকি ওর দিকে পিস্তল তাক করছিল। সে ট্রিগার টেপার আগেই মিঃ গুহনিয়োগী ওর পায়ে গুলি করেন। কয়েক সেকেন্ড এদিক ওদিক হলে নাকি, মারাত্মক সর্বনাশ হয়ে যেত।

pathagar.net

কাঞ্চন আরও কয়েকটা খবর দিয়েছে। এক, বাবার আর দিদাইকে সঙ্গে নিয়ে মা কাল সন্ধেবেলাতেই লেক গার্ডেন্সে পৌঁছে গিয়েছিল। দুই, দাদান এসেই মিঃ গুহনিয়োগীকে এমন ধমক দিয়েছে যে, ভদ্রলোক মুখ কালো করে বসেছিলেন। তিন, দাদানের পরিচয় পাওয়ার পরই নাকি রোশনির বাবা বলে ওঠেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দাদানের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়েছিল। রোশনির বাবা সেই সময় রিপোর্টিংয়ের জন্য কক্সবাজারে ছিলেন। আর দাদান ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে ওই ফ্রন্টে। চার, রোশনিকে মায়ের খুব পছন্দ হয়েছে। এমন পছন্দ হয়েছে যে, আজই আশীর্বাদটা সেরে ফেলতে চান। পাঁচ, বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ছয়, আর একটু পরেই রোশনির মেসো আর মাসিকে আবীরবাবুর আনার কথা। ওঁরা সায়নকে আশীর্বাদ করবেন। সাত, রোসির ওপর মা এমন রেগে গেছে যে, কাল রাতেই মা ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

টিভি বন্ধ করে রোসির কথাই ভাবছিল সায়ন। বিছানায় আধশোয়া হয়ে। রোসিকে ও কোনওদিন ক্ষমা করবে না। এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পরই ও দেখল, প্লেটে কমলালেবুর কোয়া আর আপেলের টুকরো নিয়ে ঘরে ঢুকছে রোশনি। প্লেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। কমলা রঙের একটা শাড়ি পরে এসেছে। খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। বোধহয় একটু আগেই স্নান করেছে। একরাশ এলো চুল ভেজা। হাঁ করে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রোশনি বলল, 'দেখছ কী, মা পাঠিয়ে দিল। খেয়ে নাও।'

'মা এখন কোথায় গো?'

'বাবা আর মেসোর সঙ্গে কথা বলছে।'

'কী কথা বলছে গো?'

'অত জানি না, যাও। তোমার বাঁ কাঁধের ব্যথাটা আজ ক্যামন আছে, বললে না তো?'

'খুউব ব্যথা। ডান হাতেও ব্যথা ছড়িয়ে গেছে আজ। হাত তুলতে পারছি না। একটু খাইয়ে দেবে প্লিজ।'

'মা দেখে ফেললে কিন্তু আমাকে এখানে থাকতে দেবে না। হোটেলে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

'আরে, এখানকার ভাষাটা তুমি এত সুন্দর কী করে শিখলে গো?'

'কাঞ্চনদা শিখিয়েছে।'

'তোমার গলায় এই নেকলেসটা তো আগে দেখিনি?'

'মা আজ পরিয়ে দিয়েছে।'

'মা এমনি এমনি তোমাকে দিয়ে দিল?'

'না। মা তাঁর মারকুটে ছেলেরে দেখাশুনো করার জন্য, আমারে এই প্রাইজটা দিয়েছে।'

'তোমার বাবা কোনও আপত্তি করেনি?'

'সেটা না হয় বাবারেই জিজ্ঞাস কোইরো।'

pathagar.net

উত্তর না দিয়ে রোশনিকে কাছে টানতে যাচ্ছিল, 'করছ কী? বাড়িতে অনেক লোকজন,' বলে রোশনি সরে গেল।

ভেতরের ঘরে শুয়ে শুয়েই সায়ন টের পাচ্ছিল, সত্যিই বাড়িতে অনেক লোকজন। অনুর গলা শুনতে পাচ্ছে। কমলামাসি আর বরদামেসোও হাজির। ওপর তলা থেকে তনিমাবউদিও নেমে এসেছে। সবাইকে ছাপিয়ে তনিমাবউদির গলাই শুনতে পেল সায়ন। মাকে বলছে, 'এ কী দিদি? এ তো ম্যাজিকের মতন হল। মেয়েছেলে হঠাৎ ব্যাটাছেলে হয়ে গেল। ব্যাটাছেলে হঠাৎ মেয়েছেলে। সবই হল, শুধু কপাল পুড়ল চারতলার কেকার।'

কথাগুলো শুনে সবাই মিলে হাসছে। একটু থেমে তনিমাবউদি ফের বলতে শুরু করল, 'লক্ষ্মীপুজোর দিনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বুঝলে আভাদি। পাঁচালি পড়ছে, ধোকার ডালনা রাঁধছে, এমন ব্যাটাছেলে আছে নাকি ভূভারতে? সত্যি আভাদি, তোমার হবু বউমাকে খুরেখুরে নমস্কার। আমার মতো জাঁহাবাজ মহিলাকেও ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।'

মা বলল, 'আমার হবু বউটার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ কেন তনিমা। কালপ্রিট তো আমার ছেলেটা। হাঁদা গঙ্গারাম কোথাকার। আরে আমাকে বলবি তো রোশনির কথা। গল্পটা তা হলে বসিরহাটেই শেষ করে দিতাম। আর কাঞ্চনটাও কী র'ম মিথ্যুক দেখো, অমন মিষ্টি মেয়েটাকে ভাই বলে চালিয়ে দিল। কাল রাতে তালেগোলে ওকে ধরতে পারিনি। সকালে ধরব ভেবেছিলুম। কিন্তু আমি ঘুম থেকে ওঠার আগে, সেই যে বাঙালটা হাওয়া হয়ে গেছে, এখনও তার পাত্তা নেই।'

'আশীর্বাদটা কি আজই সেরে ফেলবেন আভাদি?'

'হ্যাঁ ভাই। বেয়াইমশাইকে বললাম, উনিও রাজি হয়ে গেলেন। এই মেয়েকে কেউ ছাড়ে? ঈশ্বর যা করেন, তা মঙ্গলের জন্য, বুঝলে তনিমা। ভাবলাম এক, হল আর এক। ভেবেছিলুম, আর যাকেই ছেলের বউ করে আনি না কেন, বাঙাল মেয়েকে আনব না। আর আমার ভাগ্যেই শেষ পর্যন্ত জুটল চট্টগ্রামের মেয়ে। অমন চাঁদপানা মুখটা দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না গো। আজ বিকেলেই সবাইকে নিয়ে আমি বসিরহাটে যাচ্ছি। তুমিও চলো। ক'দিন সবাই মিলে আনন্দ করা যাবে।'

সবাই হইহই করে উঠল। মা খুব খুশি, এটাই ভালো লাগল সায়নের। হঠাৎ টিভির দিকে চোখ গেল ওর। কোনও একটা চ্যানেলে গানের রিয়ালিটি শো চলছে। একটা মেয়ে দরদ দিয়ে গাইছে। গানের কথাগুলো শুনে সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল সায়নের। 'প্রেম শুধু এক মোমবাতি, আলোর নাচনে, ঝড়ের কাঁপনে যখন তখন মাতামাতি, জীবনে রঙ যে বদলে যায় রাতারাতি।' কার গান? লিখেছেনই বা কে? গানটা শুনতে শুনতে আনন্দে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল সায়নের। গানের কথাগুলো মর্মে মর্মে ও অনুভব করতে লাগল। সত্যিই প্রেম যেন মোমবাতি। জীবনের রং প্রেম যে কত তাড়াতাড়ি বদলে দেয়, সেটা ও ছাড়া আর কে জানে?

'সানু বাবা, জেগে আছিস?'

'কেন মা?'

'দ্যাখ কে এসেছে?'

'কে মা?'

পর্দা সরিয়ে তখনই মায়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকল তিতাস। ওকে দেখে সায়ন চমকে উঠল। এ কী চেহারার অবস্থা হয়েছে তিতাসের? চোখের কোণে কালি। মুখটা শুকিয়ে গেছে। গায়ের রঙেও সেই জেল্লা নেই। ওকে দেখেই মনে হচ্ছে ভালো নেই। মা বলল, 'তিতাসকে আমি বললাম, বড় ভালো দিনেই এসেছিস মা। সানুর আজ আশীর্বাদ, চোদ্দোই ডিসেম্বর বিয়ে। ভালো একটা মেয়ে গুরুজি জুটিয়ে দিয়েছেন হাতের কাছে। অমন সুন্দরী বসিরহাটে কেউ নেই। তিতাসকে বললাম, ওই সময়টায় তুই আবার মুম্বই গিয়ে বসে থাকিস না যেন।'

তিতাসকে সামনে পেয়ে মা রাগ মিটিয়ে নিচ্ছেন। সেটা বুঝে সায়ন বলল, 'রোশনির সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েছ মা?'

'দিয়েছি বাবা। রোশনির বাবা এসেছেন। তোর দাদানের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি ও দিকে যাই। ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফেলি। অনেক জোগাড়যন্ত্র করার আছে। হাতে কিন্তু আর বিশেষ সময় নেই। লালি বলেছে, আজই আংটি বদলের অনুষ্ঠানটা সেরে ফেলতে। তা হলে তো, দু'টো হিরের আংটি কিনে আনতে হয়। দেখি, তোর দাদানকে বলে। ততক্ষণ তোরা দু'জন কথা বল বাবা।'

মা বেরিয়ে যাওয়ার পর সায়ন বলল, 'কেমন আছ তিতাস?'

প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকাল তিতাস। চোখের কোণে জল টলটল করছে। মুখটা নামিয়ে ও বলল, 'তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি সানুদা। তুমি আমাকে মাফ কোরো।'

'পুরোনো প্রসঙ্গ কেন তুলছ তিতাস?'

'আমাকে বলতে দাও সানুদা। না হলে শান্তি পাব না। তোমার কথা না শুনে ভুল আমি করেছি সানুদা। ভুলটা আজ শোধরাতে এসেছিলাম। দেখলাম, অনেক দেরি করে ফেলেছি। সত্যিই, তোমার পছন্দ আছে। আমার থেকে ঢের ঢের সুন্দরী তোমার হবু বউ। তুমিই জিতে গেলে সানুদা। আমি হেরে গেছি।' কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল তিতাস।